ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র

(শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসের জীবন কাহিনী)

কবিশেখর

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

ভূ-পর্য্যটক

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত

মূল্য ২৲ দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীশান্তিময় সরকার,
৫৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কালিঘাট, কলিকাতা ।

পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশান্তিময় সরকার
৫৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কালিঘাট পার্ক ।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি লিমিটেড
১৫ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা ।

গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

এইচ, সি, নাথ ব্রাদার্স
১১৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ।

২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত

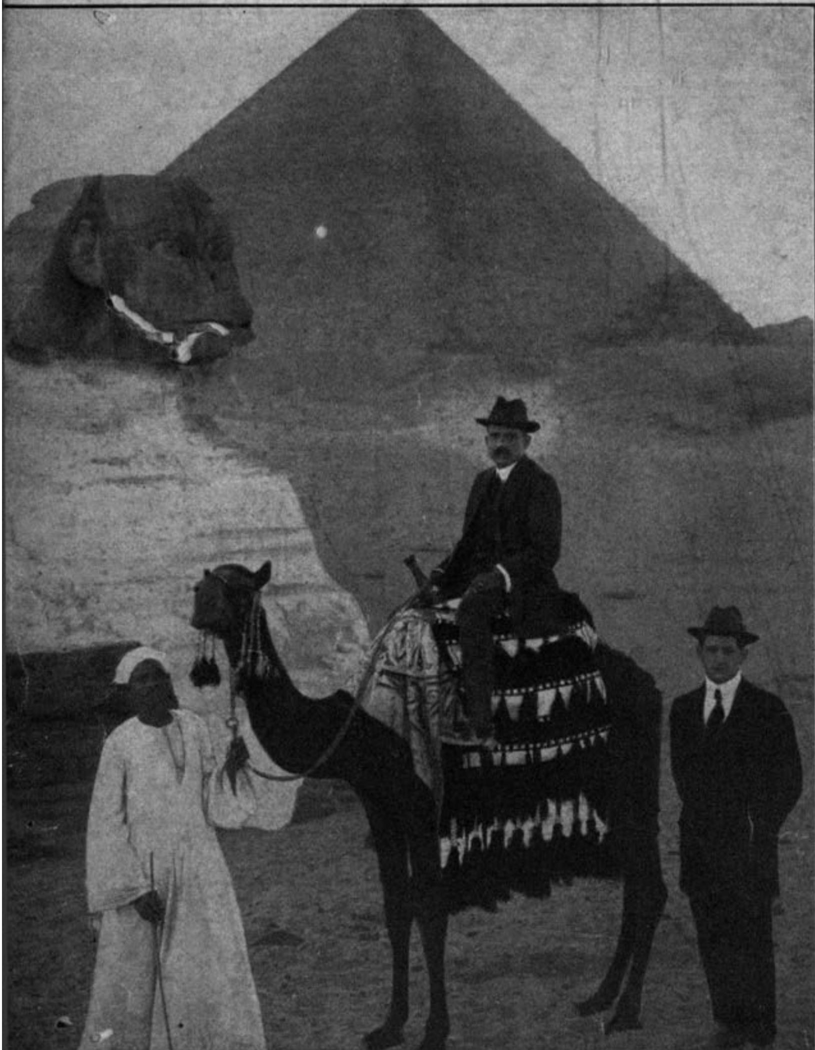
উৎসর্গ পত্র

পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ পরম ভাগবত
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
করকমলেষু।

বন্ধুবর! দীর্ঘকর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের অবসানে অবসন্ন দেহে যখন ৺পুরীধামে অবস্থান করিতাম, তখন আমার সৌভাগ্যক্রমে সস্ত্রীক আপনাকে মাসাধিক কাল আমার বাটীতে অতিথিরূপে পাইয়া জানিতে পারিয়াছি, আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের সংসার। ধনিগৃহে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ আপনাদের মধ্যে যেমনটি দেখিয়াছি, এমনটি আর কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দেখিয়াছি, জীবের দুঃখে আপনার সহানুভূতি, জনহিতকর সকল অনুষ্ঠানে সাহায্য ও আর্ত্তের দুঃখ মোচনে মুক্তহস্তে দান; দেখিয়াছি কীর্ত্তনানন্দে ভাব-বিহ্বল চিত্তে আপনার নয়নে দর-বিগলিত অশ্রুধারার প্রবল বন্যা। সেই সকল মধুর স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ আপনারই আগ্রহে লিখিত এই "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" পুস্তকখানি আপনার করকমলে অর্পণ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিলাম। ইতি

৫৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কালিঘাট, কলিকাতা।
১লা জানুয়ারী, ১৯৩৯।

প্রীতিবদ্ধ
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দে, সরকার।



পিরামিডের দেশে মরুভূমিতে গ্রন্থকার

নিবেদন

আমাদের দেশের বিশিষ্ট মনীষীদের ব্যক্তিগত জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ রহস্যময়, সেজন্য শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দেশবাসীর কৌতূহল অদম্য। যৌবনে যিনি দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে রিক্তহস্তে সাগরপারে ব্রহ্মদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি কি ভাবে তথায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং কিরূপ করিয়া সমগ্রভাবে সাহিত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের মনে নিত্য জাগরূক রহিয়াছে।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা ও অনেকের অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ব্রহ্ম-প্রবাসের প্রকৃত জীবন-কাহিনী সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মদেশে থাকিয়া তথায় শরৎচন্দ্রের সহিত আমার কিরূপ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল তাহা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায় শরৎচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই প্রথমে আমাকে তাঁহার ব্রহ্মদেশের জীবন-কাহিনী লিখিতে অনুরোধ করেন।

শরৎচন্দ্র ও আমি প্রায় সমবয়সী ছিলাম, তাঁহার জীবনচরিত আমাকে লিখিতে হইবে জানিতাম না এবং সাহিত্য-চর্চ্চার অভাবে সেজন্য প্রস্তুতও ছিলাম না।

আত্মপ্রচারের ভয়ে "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" লিখিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, রায় বাহাদুর

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার নিকট শরৎচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় জীবনকথা শুনিয়া আমাকে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে উৎসাহিত করেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই সুসাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব মহাশয় আমার বাটীতে আসিয়া শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রশ্ন করেন।

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল প্রবাহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বসুমতী অফিসে পরিচয় হইলে, তিনি আমাকে বলেন—"আপনার কাছে রস আছে সত্য, কিন্তু আপনি বৃথা গাছ ঠেঙ্গাইতেছেন, কিরূপে রস বাহির করিতে হয় তাহা আমিই জানি।"

শরৎচন্দ্রের কোন শোকসভায় মাসিক বসুমতীর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় বলেন—"যতদিন না শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসের কাহিনী বাহির হইবে ততদিন শরৎচন্দ্রের জীবনচরিত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

এই সমস্ত শুনিয়া "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" লিখিতে প্রবৃত্ত হই। শরৎচন্দ্রের সহিত বিদেশে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল বিশেষ বন্ধুত্ব ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ছোট বড় ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকে বর্ণিত শরৎচন্দ্রের মনোভাব ও আদর্শের সহিত তাঁহার লেখার সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে। কারণ, ইহা বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যৌবনকালের ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের জীবন বহু বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কেন্দ্রভূমি ছিল এবং তাঁহার সহিত আমার অচ্ছেদ্য সংস্পর্শ থাকায় স্থানে স্থানে

আত্ম-কাহিনীর বাহুল্য দোষ ঘটিয়াছে; সেজন্য সহৃদয় পাঠক, পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

এই পুস্তকের প্রথম অংশ ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যা "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর সাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায় ও মাসিক বসুমতীর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় উভয়ে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের মুদ্রণাদিব্যয় বাদে লভ্যাংশ "শরৎ-স্মৃতি ভাণ্ডারে" প্রদত্ত হইবে। ইতি—

গ্রন্থকার

পরিচায়িকা

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপরিমণ্ডলে বিশেষরূপ পরিচিত। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল ব্রহ্মদেশে কাটিয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে গিরীন্দ্রবাবু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন—সে দেশের সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তিনি ছিলেন অগ্রণী।

গিরীন্দ্রবাবুর জীবনের একটি প্রধান বৈচিত্র্য,—ইনি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন।

গিরীন্দ্রবাবুর সহিত ব্রহ্মদেশে শরৎবাবুর যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল—তাহা এই পুস্তক হইতেই বুঝা যাইতেছে। শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসের কাহিনী যে, গিরীন্দ্রবাবু লিখিবার অধিকারী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকখানিতে শরৎচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রকে যাঁহারা ভালবাসেন—তাঁহাদের সেগুলি খুবই প্রীতিকর হইবে। এই চিত্রগুলিতে শরৎচন্দ্রের চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত রচনা করিবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে অনেক উপাদান উপকরণ লাভ করিতে পারিবেন।

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাসের জীবন অজ্ঞাতবাসের অখ্যাত জীবন। এই জীবনে তিনি বহু দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বহু ভুলভ্রান্তির মধ্য

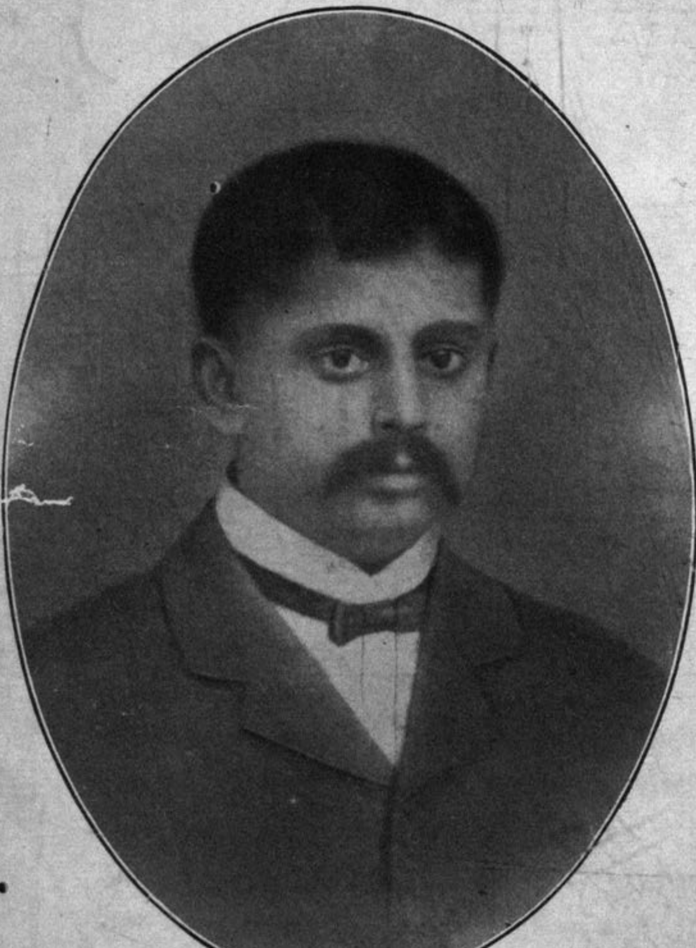
দিয়া রস স্থষ্টির শক্তি অর্জ্জন এবং স্থষ্টির উপাদান উপকরণ আহরণ করিয়াছেন। এই জীবন গভীর রহস্যে পূর্ণ। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু সেই জীবনের এমন অনেক কথাই বলিয়াছেন যাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখকের কাজে লাগিতে পারে।

গ্রন্থকার শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া অনেক স্থলে আত্মকথাই বলিয়াছেন। এই ত্রুটির দিকে আমি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ ·রিয়াছিলাম—তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন—

"আমার ভু-পর্য্যটন কাহিনী ও নিজের ঘটনাঘন জীবনের কথা-গুলি লইয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিবার জন্য শরৎদা আমাকে কয়েকবার বলিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এখন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবাস জীবন-কাহিনী লিখিবার সময় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দু'একটি আত্মকথা একই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। জীবনাবসান আসন্ন—ভবিষ্যতে আর গ্রন্থ রচনা ঘটিবে বলিয়া ভরসা করি না।"

শ্রীকালিদাস রায়

সূচীপত্র



স্বর্গীয় অঘোরনাথ্ চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র

প্রথম স্তবক

রেঙ্গুনরত্ন শরৎচন্দ্র

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সঙ্গীত-সাধনাতেও তিনি সেরূপ সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন, এ কথা রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ভিন্ন আর কেহ জানে না। কারণ, বর্ম্মা হইতে শরৎচন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একেবারে কণ্ঠরোধ করিয়া শুধু লেখনী-চালনাই করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে কথা-শিল্পী ও সুরশিল্পী ছিলেন বলিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনি সাহিত্যসম্রাট্, অপরাজেয় কথাশিল্পী, নির্য্যাতিতের ও লাঞ্ছিতের দরদী বন্ধু, মনস্তত্ত্ব-বিদ্, সমাজ-সংস্কারক, নব্য বাঙ্গালার স্বাধীনচিন্তা-প্রবর্ত্তক ও স্বদেশসেবক প্রভৃতি অনেক উপনামে ভূষিত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার "রেঙ্গুনরত্ন" এই উপনামটি বঙ্গের

তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এ কথা বোধ হয় শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই গোপন রাখিয়াছিলেন। বোধ হয়, পাছে বন্ধু-বান্ধবগণ এই উপাধির ইতিবৃত্ত শুনিয়া তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহার নীরব সাহিত্যচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটায়, তাই এই নীরবতা।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে যৌবনের প্রারম্ভে শরৎচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় রেঙ্গুন সহরে আসিয়া প্রথমে তাঁহার আত্মীয় হালিসহর-নিবাসী রেঙ্গুনের উদীয়মান উকিল স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। অঘোর বাবু বন্ধু-বৎসল, মৃদু-স্বভাব, রহস্য-কুশল ও বন্ধুবান্ধবদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ইনি যে পরিমাণে ব্যয়শীল, সে পরিমাণে—কি তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণেও সঞ্চয়শীল ছিলেন না। ইনি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই অঘোর বাবু নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করায় শরৎচন্দ্র আবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহায়-সম্বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা অর্থবল কিছুই ছিল না। সম্বল ছিল মাত্র ভাবপ্রবণ দরদী হৃদয়খানি ও সুমধুর কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর প্রথম আকৃষ্ট করে আমাকে। রেঙ্গুনপ্রবাসী

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আমিই তাঁহার প্রথম বন্ধু। শরৎচন্দ্রের আত্মীয় অঘোর বাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরিবারবর্গ নিকটে না থাকায় তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় সেবা-শুশ্রূষার ভার শরৎচন্দ্র ও আমি লইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং রাত্রি-জাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যূষে আপন মনে কত কি আবৃত্তি করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। ঐ আবৃত্তি ও গানের অধিকাংশই ছিল কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে। কয়েকদিন শরৎচন্দ্রের সাহচর্য্যে থাকিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শরৎচন্দ্র একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। কখন কখন তিনি সহজ লোকের মত আচার-ব্যবহার করিলেও অধিকাংশ সময় পাগলের মত আপনার খেয়ালে আপনি মত্ত থাকিতেন। কোন প্রকার নিয়ম বা বাঁধাবাঁধির ধার ধারিতেন না। তাঁহার আচরণে বা কথাবার্ত্তায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি একজন মহা-ভাবুক লোক, সর্ব্বদা আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। মাসাধিক কাল একত্র বাস ও একত্র

রাত্রিজাগরণের ফলে আমি শরৎচন্দ্রের মধুর স্বভাব ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাই। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে ও আমি তাঁহাকে 'শরৎদা' বলিয়া ডাকিতে থাকি।

শরৎচন্দ্র সংসারচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ কথা তিনি গোপন করিতেন না এবং প্রথম জীবনে প্রণয়-ঘটিত নৈরাশ্যের একটি আঁচ তাঁহার হৃদয়ে লাগিয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ আভাসও দিতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্রকে লইয়া রেঙ্গুন সহরে প্রথম উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীসম্প্রদায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন রেঙ্গুন সহরে পঞ্চাশ সহস্র বাঙ্গালী অধিবাসীর মধ্যে সহস্রাধিক শিক্ষিত লোক থাকা সত্ত্বেও সুসাহিত্যিক বা সুগায়ক এক জনও ছিল না। শরৎচন্দ্র তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাস করিতেন এবং তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল কি না, তাহা কেহই জানিত না। স্বর্গীয় যশোদানন্দন সেনের দ্বারা একখানি অভিনন্দনপত্র লেখা হইল বটে, কিন্তু অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিবার লোক

মোটেই পাওয়া গেল না। কবিবর নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-বাসী বন্ধু, রেঙ্গুনের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও ব্রহ্মদেশের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল্ মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন কবিবরের অভ্যর্থনার সমস্ত ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর শরৎচন্দ্রের সন্ধান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-রসিকতার সহিত কথা চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "তোমাদের কবিবরের হঠাৎ এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো কেন? তিনি এ সাগর-পারে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে এলেন কেন?" আমি বলিলাম, "যে জন্যই তিনি আসুন, শরৎদা, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সম্বর্দ্ধনা করা প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নয় কি? আর কবিবরের আদর-অভ্যর্থনা তাঁর পদমর্য্যাদানুযায়ী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া উচিত ভেবে আমি তোমার সাহায্য-প্রার্থী হ'য়েছি। তুমি যদি দয়া ক'রে একখানি গান না কর, তা' হ'লে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও আয়োজন পণ্ড হ'য়ে যাবে।"

তখন শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন সহরে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও লোকসমাজে মিশিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক বলিয়া প্রথমে বিশেষ আপত্তি করিলেন। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয় ও পীড়াপীড়ির পর এই সর্ত্তে রাজী হইলেন যে, অভ্যর্থনাহলের একপার্শ্বে পর্দ্দার ভিতর তাঁহার জন্য একটি

স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে হইবে।' তিনি ঐ স্থানে আত্মগোপন করিয়া গান গাহিবেন।

'রেঙ্গুন বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব' গৃহের অভ্যর্থনা হলে শরৎচন্দ্রের ইচ্ছামত একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে কবি-দর্শন-অভিলাষী বিপুল জনভার মধ্যে শরৎচন্দ্র তদ্‌গতচিত্তে ভাবাকুলতার সহিত মধুর কণ্ঠে এই অভ্যর্থনা সঙ্গীতটি গাহিলেন ঃ—

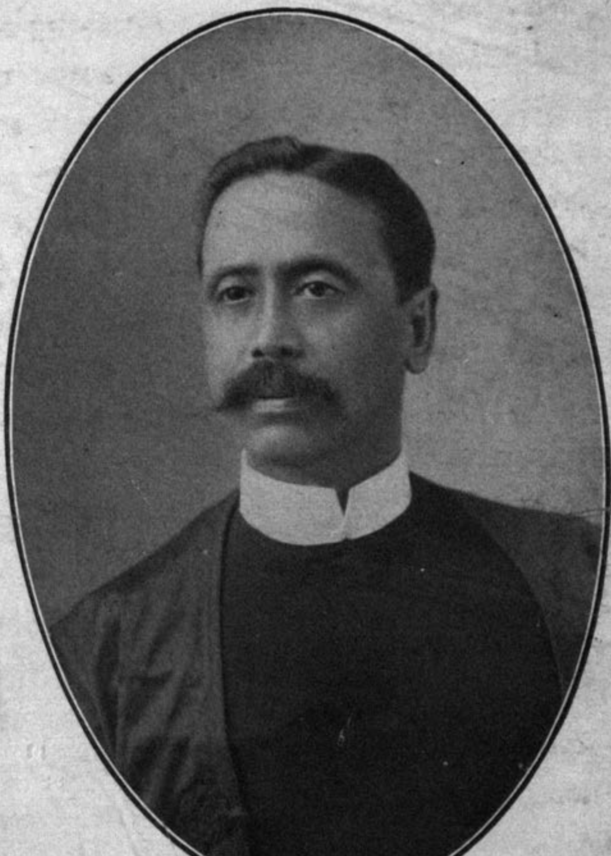
ব্রহ্ম-ভূমি সুশোভিত বঙ্গ রতনে আজি হে!
এস কবিবর এস হে!
ধন্য কর ব্রহ্মদেশ হে!
সমবেত যত স্বদেশী,
তব দর্শন-অভিলাষী
লয়ে পুণ্য প্রতিভারাশি
এস কাব্য-আকাশ-শশী হে।
এস সুন্দর, এস শোভন,
এস বঙ্গহৃদয় ভূষণ,
এস হে প্রিয়দর্শন,
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লহ হে॥

সঙ্গীত শেষ হইবামাত্রই শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গেল। গায়ক শরৎচন্দ্রকে দেখিবার এক অদম্য কৌতূহল জনতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ব্রহ্ম-প্রবাসে কে এই অজ্ঞাত সুধা-কণ্ঠ গায়ক

আজ কবি সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিলেন ! স্বয়ং কবিবর বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ধন্যবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শরৎচন্দ্র সঙ্গীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দ্দার মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাওয়া গেল না। কবিবর নবীনচন্দ্র ক্ষুণ্নমনে ফিরিবার সময় আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গেলেন, যেন এক দিন শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া হয়। আর এক দিন তিনি তাঁহার গান শুনিবেন। এমন মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত তিনি বহু দিন শুনেন নাই। সুরশিল্পী শরৎচন্দ্রের সুধাকণ্ঠ ও গানের অপূর্ব্ব শক্তি তাঁহাকে এক রাত্রিতেই প্রবাসী বাঙ্গালী-দিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিল বটে, কিন্তু এই পল্লবান্তরালের কোকিলের মত অদৃশ্য গায়কটির প্রকৃত স্বরূপটি বহু দিবস পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচর ছিল। তাহার পর কবিবর নবীনচন্দ্র বহু দিন শরৎচন্দ্রের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষে একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়া স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত শরৎচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই কিছু দিন পরে কবিবরের আগ্রহাতিশয্যে আমি

এক দিন অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া শরৎচন্দ্রকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলাম। উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া সম্মুখে ড্রয়িংরূমে কবিবরের সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতা রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ মিঃ যতীশরঞ্জন দাশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শরৎচন্দ্র হঠাৎ এরূপ জোরে দৌড় দিলেন যে, তাঁহার পায়ের একপাটি জুতা খুলিয়া পড়িয়া গেল। কাঠের সিঁড়িতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় কেহ পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, শরৎচন্দ্র একপাটি জুতা পরিয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কবিবর কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু আমি পাগল শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে বিস্মিত না হইলেও বিশেষ লজ্জিত হইলাম। শরৎচন্দ্র তখন এরূপ লাজুক ছিলেন যে, কোন গণ্যমান্য পদস্থ লোকের সম্মুখে কিছুতেই বাহির হইতে পারিতেন না।

ইংরেজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতির উদ্যোগে যুগাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) রেঙ্গুন সহরে আসিলেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচরদিগের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন



কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ; ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ভক্ত হনুমান্ মনে করিত। তাঁহার ন্যায় বৈদান্তিক পণ্ডিত ও ত্যাগী যোগী পুরুষের ব্রহ্মদেশে এই প্রথম পদার্পণ। তিনি বৌদ্ধপ্লাবিত ব্রহ্মদেশে সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া যান।

সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণানন্দের নৈষ্ঠিকী ভক্তির জীবন্ত সৌম্য মূর্ত্তিখানি দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া যে কয় দিন স্বামীজী রেঙ্গুনে ছিলেন, প্রতিদিন সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া শরৎচন্দ্র নির্জ্জনে আত্মকাহিনী জ্ঞাপন করিতেন ও তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন।

স্বামীজী কয়েক দিন বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সাধারণ সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেন না। শুধু ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সার সত্য-টুকু নিজ সাধনার দ্বারা যেরূপ উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ওজস্বিনী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ভাষায় ও ভাবে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকায় উহা সকল সম্প্রদায়ের শ্রোতার উপর মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিত। যে দিন সাধারণ সভায় বক্তৃতা

থাকিত না, সে দিন স্বামীজী নিজ নির্দ্দিষ্ট বাসায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। অনেক মাদ্রাজী ভক্ত এই সান্ধ্য-সম্মিলনীতে যোগদান করিতেন। শরৎচন্দ্র এ সময় উপস্থিত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিতে অনুরোধ করিতেন। শরৎচন্দ্র সহজে কোথাও গান গাহিবার পাত্র ছিলেন না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাধুসঙ্গের পুণ্যময় প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই একখানি রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতেন। এক দিন শরৎচন্দ্র আমার রচিত গানটি গাহিলেন :—

গান

এস সবে মিলে গাই কুতূহলে রামকৃষ্ণ-গুণগান।
রামকৃষ্ণ-নামামৃত প্রেমানন্দে আজি করিব পান॥
সত্যনিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ, পরমহংস রামকৃষ্ণ,
ভাবিলে যাঁহারে ভবের কষ্ট মুহূর্ত্তে হয় অবসান॥
কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তি, সর্ব্বধর্ম্মে যাঁর সমভক্তি,
সর্ব্বজীবে সমপ্রীতি দীনজনের ভগবান॥
সমাধিমগ্নমূরতি চারু, ধর্ম্মোপদেষ্টা জগত-গুরু,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও মম হৃদে অধিষ্ঠান॥

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্ব্বদাই রামকৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন, রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কথা তাঁহার ভাল লাগিত না; রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা ছিল

না। রামকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন, রামকৃষ্ণই তাঁহার প্রাণ। যে কেহ রামকৃষ্ণ নাম করিত বা রামকৃষ্ণের গান গাহিত, সেই তাঁহার পরম আত্মীয় হইয়া যাইত। কণ্ঠ-সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই প্রাণমাতানো রামকৃষ্ণ-সঙ্গীতগুলি শুনিয়া স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং শরৎচন্দ্রের অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করিতেন।

শরৎচন্দ্রের হিন্দু দর্শনশাস্ত্র কিছু পড়া ছিল কি না জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের Bernard Free Library হইতে অনেক ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, হার্ব্বার্ট স্পেনসার, আগষ্ট কোমত প্রভৃতির মতামত লইয়া অনেক কূট প্রশ্নের অবতারণা করিয়া স্বামীজীর সহিত তর্ক ও বাদানুবাদ করিতেন। স্বামীজী ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন কথা ও বাণী অবলম্বনে ঐ সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়া দিলে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হইয়া শ্রদ্ধাবিস্ফারিতনয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিতেন।

যেদিন রেঙ্গুন সহরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভ্যর্থনা হয়, ঐ অভ্যর্থনা সভায় বহু সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বয়ং কবিবর নবীনচন্দ্র আসিয়াছিলেন শুনিয়া স্বামীজী

কবিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি স্বামীজী ও শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া এক দিন সন্ধ্যাকালে কবিবরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কবিবর অকস্মাৎ স্বামীজীর সহিত শরৎচন্দ্রের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদের বসাইয়া স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর প্রতি কবিবরের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম এবং কবিবরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে অজ্ঞতা বশতঃ আমরা কেহই স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি নাই ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ যুগাবতার ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের জীবনকথা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও প্রচারকার্য্যের আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার পর শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কবিবর বলিলেন, "আপনার গান শোনবার আশায় আমি তৃষিত চাতকের মত লালায়িত হ'য়ে আছি।" উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আজ আমি গান শোনাতে আসিনি, আপনার পুত্র সুকণ্ঠ নির্ম্মলচন্দ্রের গান শুনতে এসেছি।" কবিবর বলিলেন, "শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নির্ম্মলচন্দ্রের তুলনা হতে পারে না।" স্বামীজী

হাসিয়া বলিলেন, "আজ এখানে একত্রে নবীনচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উদয় হ'য়েছে বটে, কিন্তু আমি শরৎ-সুধাই পান করতে চাই।" কবিবরের আদেশে প্রথমে নির্ম্মলচন্দ্র একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলেন।

ইহার পর আর বলিতে হইল না, শরৎচন্দ্র অর্গানের সম্মুখে বসিয়া আপন মনে প্রাণের আবেগে ভাব-বিভোর হইয়া গাহিলেন :—

"আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা! বাকি কিছু নাই।
ও দাও বাঁচিবার মত তার বেশী নাহি চাই॥
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি।
(তাই) দু'হাত তুলে শূন্যপানে তোমারে খুঁজি॥
ভাবি তুমিই দিয়েছ, তুমিই নিয়েছ, তুমিই দিবে তা ফিরে।
আবার তুমিই আসিবে সুধা ল'য়ে হাতে রিক্ত আমারি তরে॥
আমি সেই পথ চাহি সময় নিরখি
যেন দাঁড়ায়ে থাকিতে পারি।
(শুধু তোমারই আশায়)
শেষে অজানা সময় নিকটে আসিলে
যেন তোমারি চরণ পাই॥"

এই স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনি স্বামীজীকে ভাবে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল এবং কবিবরের হৃদয়তন্ত্রীর অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিবামাত্র নিতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই

সঙ্গীতের রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া বলিলেন, "আপনার গানের ভাব উদ্দীপনায় সেই চিরসুন্দরকে মনে করাইয়া দেয়, রেঙ্গুন সহরে এমন রত্ন লুকান ছিল জানতাম না, আমি আজ আপনাকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধি দিলাম।"

শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীতে যেরূপ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার গানের মধ্যেও সেইরূপ অসাধারণ মাধুর্য্য ছিল। গানে প্রাণ দিয়া ভাব ফুটাইয়া তুলিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, শরৎচন্দ্রের একটি মাত্র গানে কবিবর এত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এরূপভাবে সম্মানিত করিবেন। আমার বিশ্বাস, শরৎচন্দ্রের মুখে এই গানটি যিনি শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবে শরৎচন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রণেতা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সেন রেঙ্গুন সহরে অবস্থানকালে আমরা কতিপয় ভক্ত মিলিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম এবং সেই অবধি প্রতি বৎসর ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে একটি ছোট উৎসবের আয়োজন হইত। এবার সমিতির সভ্য সংখ্যা অধিক হওয়ায় বিরাট আকারে উৎসব করিবার আয়োজন হইয়াছিল। আমি বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করায়, তিনি মাদ্রাজ মঠ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে রেঙ্গুনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এমনই মহিমা যে দেখিতে দেখিতে সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হইয়া গেল এবং উৎসবের জন্য অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজে সংগ্রহ হইয়া গেল, কোন কিছুর অভাব হইল না।

রেঙ্গুন গবর্ণমেন্ট হাউসের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (বর্ত্তমানে যেখানে হাইকোর্ট বিল্ডিং নির্ম্মিত হইয়াছে) ঐখানে একটি

সুন্দর গৃহ ছিল, ঐ গৃহে স্বামীজীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্মুখের খোলা মাঠের উপর বৃহৎ চাঁদোয়া টাঙাইয়া উৎসব-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ঠাকুর সাজাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে আনীত সুন্দর লতাপাতা ও ফুল দিয়া একটি নিকুঞ্জবন প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে কারুকার্য্যনির্ম্মিত সিংহাসনোপরি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব ও তাঁহার উভয় পার্শ্বে স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার ফটো সংস্থাপিত হইল। উৎসবের পূর্ব্ব রাত্রিতে উৎসবের প্রধান অঙ্গ কাঙ্গালী ভোজনের জন্য চাউল, ডাইল প্রভৃতি সংগৃহীত হইতেছে, এমন সময় শরৎচন্দ্র আসিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—“ভিখারীগুলোর উপর আমার আদৌ শ্রদ্ধা নেই। পকেটে হাত দিতে না দিতেই মাছির মত চারিদিকে ছেঁকে ধরে। এদেশে হিন্দু-ভিখারীর সংখ্যা খুবই কম, মুসলমান ভিখারীদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তারা ভিক্ষার জন্য ১০।১৫ টাকা জাহাজ ভাড়া দিয়ে এ দেশে আসে। প্রতি শুক্রবারে ওরা দানশীল মুসলমান-দের বাড়ী থেকে এত পয়সা ভিক্ষা পায় যে, অনেকেরই পোষ্ট অফিস্ সেভিং ব্যাঙ্কে হিসাবের খাতা আছে ও প্রত্যেকের নামে চার পাঁচ শত টাকা জমা আছে।”

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন—“ভিখারী ও দুঃখী দরিদ্রদের দরিদ্র-নারায়ণ বা বুভুক্ষুনারায়ণ বলে ডাক্‌বে, এ নামগুলি স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ প্রবর্ত্তন করে

গিয়েছেন, আর দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভাব এ'নো না। সবাই তাঁর সন্তান ভেবে সকলকে সমান ভালবাসা দিয়ে সেবা ক'রো। এদের সেবা কর'বার সুযোগ পেলেই নিজেদের ধন্য মনে ক'রবে। ভিখারীদের ঘৃণা ক'রো না, আমরা ওদের চেয়ে কম ভিখারী নই। ওরা কত অল্পে সন্তুষ্ট।"

শরৎচন্দ্রের পরামর্শ মত রায় সাহেব নিবারণ বাবুর সহকর্ম্মী বর্ম্মিজ এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার ফোথংকে বলায় তিনি এক হাজার বর্ম্মিজ ভিক্ষুক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে রাজী হইলেন এবং নিজে কিছু চাঁদাও দিলেন। তিনি শিবপুর হইতে বি, ই পাশ করিয়াছিলেন। বহুদিন কলিকাতায় থাকায় এ সকল কার্য্যে ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সমাগম হইবে বলিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহাদের পল্লী হইতে একটি ভাল সংকীর্ত্তনের দল আনিবেন বলিলেন। এ স্থলে, শরৎচন্দ্র যে পল্লীতে বাস করিতেন, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন সে স্থানগুলির নাম 'বোটাটং' ও 'পোজোন ডং'। রেঙ্গুন সহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডক্ ইয়ার্ড, ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে তাহাতে ফিটার, বাইশ্‌ম্যান্ ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত

কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিল একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক ৩।৪ টাকা রোজগার করে। ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত। ইহাদের জন্য এখানে সারি সারি অনেক কাঠের ব্যারাক বাড়ী এখনও আছে। শরৎচন্দ্র স্বল্প ভাড়ায় ঐরূপ একটি ছোট বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমি ঐ পল্লীর নাম 'মিস্ত্রী পল্লী'র পরিবর্ত্তে 'শরৎ-পল্লী' রাখিয়াছিলাম। এ পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরীর দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতেন, সেবা শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত ও 'বামুন দাদা' বলিয়া ডাকিত। এই বামুনদাদার প্রতি তাহাদের প্রভূত বিশ্বাস ছিল, অনেকের টাকা কড়ির আদান প্রদান এই বামুনদাদার মারফতেই হইত। ইহাদের একটা কীর্ত্তনের দল ছিল, বামুনদাদার পরিচালনায় ছুটীর দিন ইহারা খোল,

করতাল সংযোগে নাম সংকীর্ত্তন করিত। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে উৎসবে এই দলকে নিমন্ত্রণ করা হইল।

সেদিন রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের দিন। স্বামীজীর আদেশ অনুসারে সকলেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানান্তে ঠাকুর ঘরের কাজ করিতে ব্যস্ত হইলেন। স্বামীজী স্বয়ং নিবারণ বাবু ও আমাকে সঙ্গে লইয়া ৺রামদাস ভট্টাচার্য্য রায় বাহাদুরের 'টামোর' বাগান হইতে 'নাগেশ্বর চাঁপা' ফুল সংগ্রহ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই ফুল ভগবান রামকৃষ্ণদেব খুব ভালবাসিতেন শুনিয়া ফুল সংগ্রহের জন্য আমরা মহারাজের সহিত তিন চারি মাইল যাইতে প্রস্তুত হইলাম। যাত্রাপথে শরৎচন্দ্র আসিয়া আমাদের সহিত জুটিলেন এবং স্বামীজী একটি বিশেষ ফুলের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া রাস্তায় কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি এত পূজা করেন কেন?"

স্বামীজী—"পূজা করে বড় আনন্দ পাই।"

শরৎচন্দ্র—"পূজা করাই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদুপাসনা?"

স্বামীজী—"সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ধ্যান—মধ্য, স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্য পূজা অধমাধম।"

শরৎচন্দ্র—"তবে লোকে এত আড়ম্বর ক'রে পূজা করে কেন?"

স্বামীজী—“পূজা জিনিষটা বাহিরের মোটেই নয়—অন্তরের। সাধারণ লোকে ভগবানের তুষ্টির জন্য ভয়ে বা কামনা পূরণের আশায় মানসিক ক'রে পূজা অর্চ্চনা ক'রে, এ সকল বড়ই তুচ্ছ। ভগবানের উপর ভালবাসা না এ'লে, তাঁহার অদর্শনে বিরহ অশ্রু না বেরুলে তাঁর পূজা হয় না। বিষয়ী লোকদের পূজা, জপ, তপ—যখনকার তখন, তারপর আর মনে থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তরা শ্বাস প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ করেন ও পূজায় ভাব সংযুক্ত আছে ব'লে ফুল, পাতা, ফল এই সব দিয়ে নিষ্কামভাবে তাঁর পূজা করে প্রেমানন্দে বলেন—

“পূজা উপাসনা সকলি গো ফাঁকি,
শুধু এই উপলক্ষে তোমারে মা ডাকি।”

তারপর কিছুদূর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আসিয়া আমরা রামবাবুর বাগানে পৌছিয়া দেখিলাম, খুব প্রকাণ্ড একটি গাছে রাশি রাশি 'নাগেশ্বর' চাঁপা ফুটিয়া বাগানটি সৌরভে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। ফুলগুলি দেখিতে প্রায় সাদা গোলাপের মত। বাগানের বর্ম্মিজ মালী গাছে উঠিয়া ডাল শুদ্ধ কতকগুলি ফুল পাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহাতে স্বামীজীর মনে সন্তোষ না হওয়ায়, তিনি একটি লম্বা বাঁশের আকর্ষি লইয়া স্বহস্তে ক'য়েকটি ফুল পাড়িয়া লইলেন। স্বামীজীর মনে অপার আনন্দ। বহুদিন

পরে বর্ম্মা-মুল্লুকে আসিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার প্রিয় পুষ্পগুলি স্বহস্তে চয়ন করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিবেন ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা! বর্ম্মিজ্ মালীটিকে কিছু বক্‌শিস্ দিবার সময় সে বলিল, এই ফুলের বর্ম্মা নাম 'গাঙ্গ'। জনশ্রুতি আছে, এই ফুল ভগবান বুদ্ধদেবের বিশেষ প্রিয় ছিল। স্বর্গের সমস্ত সুষমা যেন সুরভিমণ্ডিত হইয়া এই পুষ্প মধ্যে নিহিত আছে, এ ফুল সকল দেবতারই যে প্রিয় হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উৎসব-মণ্ডপে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী দেখিলেন, লাট-প্রাসাদের মালী এক ঝুড়ি বাছা বাছা সুন্দর গোলাপ ফুল আনিয়াছে, দেখিয়াই তিনি আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া উঠিলেন। লাট কুঠির প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুল তখন প্রত্যহ ক'য়েক ঝুড়ি হাঁসপাতালে পাঠান হইত। রায় সাহেব স্বামীজীর পূজার জন্যও কয়দিন এক ঝুড়ি করিয়া ফুল এখানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজী স্বহস্তে বিবিধ পুষ্প ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুন্দর ভাবে ঠাকুর সাজাইলেন। শরৎ-পল্লী হইতে একটি কীর্ত্তনের দল আসিয়া আমাদের সহিত নামকীর্ত্তনে যোগদান করিল। শরৎচন্দ্র গাহিলেন—

তেমনি করে আবার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের বান।
তাতে ভেসে যাবে, ডুবে যাবে, জীবের দারুণ অভিমান॥

সেদিন যেমন জীবের লাগি 'কথামৃত' ক'রলে দান।
প্রেমপিয়াসী, বিশ্ববাসী, প্রেমের সুধা ক'রছে পান ॥
যাতে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হোল শিখাও সেই প্রাণের টান।
তেমনি প্রাণ মাতানো 'মা' 'মা' রবে
আকুল ক'রো সবার প্রাণ ॥
(আমার) হয় নি জনম এলে যখন নররূপী ভগবান।
(সেই) অপূর্ণ সাধ পুরাইতে হৃদে তোমায় দিব স্থান ॥
তাতে সরস হ'বে হৃদয়-মরু ছুটবে হৃদে প্রেমের বান!
প্রাণ ভরে সবাই মিলে গাইব 'জয় রামকৃষ্ণ' গান ॥

ঐ পল্লীর লোকগুলির সহিত পূর্ব্বে আমাদের আলাপ পরিচয় ছিল না। স্বামীজী ও রায় সাহেব প্রত্যেকেই তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বানে আপ্যায়িত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় সহস্রাধিক ভিখারী উৎসব মণ্ডপে সমবেত হইল। ইহারা সকলেই ব্রহ্মদেশীয় ভিখারী, কাণা খোঁড়া ও ব্যাধিগ্রস্তের দল। বর্ম্মিজ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফো থং স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় মত পেশাদার মুসলমান ভিখারী ব্যতীত প্রকৃত দীন, দুঃখী ও পঙ্গু লোক সকল আসিয়াছে দেখিয়া শরৎচন্দ্র প্রফুল্লমুখে তাহাদের তদারক করিতে লাগিলেন। ভাত, ডাল, তরকারী, পায়স ও জিলাপী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র মহোল্লাসে কোমর বাঁধিয়া

তাহাদের পরিবেষণে যোগ দিলেন। তাহারা প্রায় এক সহস্র লোক এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইল।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের ভোগ ও আরতি হইল। এরূপ আরতি পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ঐ আরতির সহিত খোল, করতাল, কাঁসর, ঘড়ি ও বর্ম্মিজ গৎ প্রভৃতি তালে তালে বাজিতে লাগিল। সকলের সমবেত "জয় রামকৃষ্ণ" নাদে উৎসব মণ্ডপ ভরিয়া গেল। অপরাহ্নে শরৎচন্দ্র ও আমরা শতাধিক ঠাকুরের ভক্ত স্বামীজীর সহিত খিচুড়ী প্রসাদ পাইলাম। উৎসবান্তে যাইবার সময় শরৎ-পল্লীর লোকগুলি "জয় ভগবান রামকৃষ্ণদেবকী জয়!" "জয় স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকী জয়!" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া চলিয়া গেল।

মফঃস্বল হইতে বর্ম্মা থারাবড়ি জেলার একজিকিউটীভ্ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি, পেগুর মিঃ পি, ভি, নাইডু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আসিয়া কয়েক দিন আমাদের অতিথি হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রকে একটি ভাল চাকরী করিয়া দিবার জন্য একদিন আমার বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ মুখার্জ্জিকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু বড়লোকের খোসামোদ করিতে শরৎ-চন্দ্র সম্মত হইলেন না।

উৎসব শেষ হইবার পর আমরা প্রত্যহ স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুনের প্রধান প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলি

দেখাইতে লাগিলাম। আজ পূর্ণিমা রাত্রিতে সহরের প্রান্ত-ভাগে "সোয়েডাগন্ প্যাগোডা" দেখিতে যাত্রা করিলাম, সঙ্গে মিঃ মুখার্জ্জি, মিঃ নাইডু, রায় সাহেব মুখার্জ্জি, জন্ ডিকেন্সন কোম্পানীর অতুল বাবু ও সতীশ বাবু, শরৎচন্দ্র ও আমি ছিলাম। "সোয়েডাগন প্যাগোডা" বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মন্দির। এরূপ বৃহৎ গগন-স্পর্শী, সুদৃশ্য সুবর্ণ মন্দির সিংহল, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি সমগ্র প্রাচ্যদেশে কোথাও নাই। এই মন্দিরের বেদীর নীচে ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থির সহিত তাঁহার মস্তকের চুল প্রভৃতি কয়েকটি পুণ্য স্মৃতি সংরক্ষিত থাকায় ইহা বৌদ্ধদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া প্রায় শতাধিক পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হয়। তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহদাকার অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ সিংহাকৃতি মূর্ত্তি বিরাজিত। সিঁড়ীর উভয় পার্শ্বে ব্রহ্ম-মহিলাদিগের সারি সারি ফুল ও মোমবাতির দোকান। ব্রহ্মদেশের সকল মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন মন্দিরে পুরোহিত, পাণ্ডা, নৈবেদ্য, ভোগ বা পূজা-রীর উৎপাত নাই। দেবদর্শনে কোন দর্শনী দিতে হয় না। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই ইচ্ছামত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধ-মূর্ত্তি-সমন্বিত বেদীতে মোমবাতি

জ্বালিয়া দিতে ও ফুল উৎসর্গ করিতে পারে। আমরাও তাহাই করিলাম। প্রধান মন্দিরের চূড়াটি রাস্তার সমতল হইতে ৩৭০ ফুট উচ্চ, উহা ইষ্টক নির্ম্মিত হইলেও সমস্ত মন্দির গাত্রটি পাত্‌লা সোণার পাত দিয়া মোড়া। প্রতিবার সংস্কার করিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই বিরাট মন্দিরের চাতালের উপর প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক একত্র বসিতে পারে। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যেও রত্নখচিত বেদীর উপর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত। এই সকল মন্দিরের সম্মুখস্থ আবরণগুলি অতীত দিনের দারু-শিল্পের সুদুর্ল্লভ নিদর্শন।

স্বামীজী মন্দিরটির সমস্ত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পারিপার্শ্বিক মনোহর দৃশ্য দেখিয়া ও উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সেই গগনস্পর্শী প্যাগোডার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং একটি ধ্যান-মগ্ন বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে পদ্মাসনে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক সৌম্য-মূর্ত্তি অনেক তীর্থযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। আমরা অনিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম যেন একটি স্বর্গীয় ভাবাবেশে তাঁহার মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। ইতিমধ্যে কয়েকজন সুবেশে ভূষিতা সুন্দরী ব্রহ্ম-রমণী একে একে আসিয়া ধ্যান-মগ্ন স্বামীজীর পায়ের উপর

কয়েক গুচ্ছ ফুল রাখিয়া গেল। ধ্যান-ভঙ্গের পর ফুল কোথা হইতে আসিল স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় এই প্যাগোডার ট্রাষ্টি অশীতিপর বৃদ্ধ মিঃ মং প্রু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও স্বামীজীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিয়া বলিলেন,—"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকরা ইতিপূর্ব্বে আপনার ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শন ভারতীয় সন্ন্যাসী দেখে নাই, ভগবান বুদ্ধদেব যে আপনাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও উহারা জানে না। আপনি বিদেশী হইয়াও ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি এত ভক্তিসম্পন্ন দেখিয়া উহারা ভক্তের হাত দিয়া ভগবানকে ফুল দিবার আশায় ঐ ফুলগুলি আপনাকে উপহার দিয়া গিয়াছে।"

স্বামীজী ঐ মহিলাদের সরলতা ও ভক্তির অতীব প্রশংসা করিয়া বৃদ্ধ ট্রাষ্টির সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাপকতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। বৃদ্ধ মং প্রু স্বামীজীর সহিত আলাপে বিশেষ প্রীত হইয়া আমাদের সকলকে মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ঘণ্টাটি দেখাইলেন। ঘণ্টাটি ঝোলান আছে। উহা উচ্চতায় চৌদ্দ ফুট, উহার মধ্যে ছয়টি লোক পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে। উহার ওজন ৯৪,৬৮২ পাউণ্ড।

তাহার পর তিনি আমাদিগকে মন্দির সংলগ্ন একটি

সুরক্ষিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। সেখানে লোহার সিন্ধুক খুলিয়া রত্ন খচিত কয়েকটি বুদ্ধ মূর্ত্তি ও ময়ূর প্রভৃতি দেখাইয়া কহিলেন,—"এই মূর্ত্তিগুলি ব্রহ্মদেশের স্বাধীন নৃপতি মিন্‌ডুন্ মিনের রাজত্বকালে জগদ্‌বিখ্যাত মোগক্ রুবি মাইনে প্রাপ্ত রুবির দ্বারা নির্ম্মিত। এই মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় তিন লক্ষ টাকা মূল্যের ছোট ডিম্বের আকার যে একটি রুবি রাত্রে জ্বলিতে দেখা যায়, ঐ দুর্ল্লভ রত্নটির সহিত তিনি এগুলিও এই মন্দিরে দান করিয়াছেন।" এই রত্নমূর্ত্তিগুলির দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। এরূপ সাধুসঙ্গ না হইলে জীবনে কখনও এগুলি দেখিবার সুযোগ হইত না।

আমরা মন্দির হইতে বাহির হইতেছি, ঠিক এমন সময় শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে এক আইরিশ্ ফুঙ্গী (বৌদ্ধ পুরোহিত) উপস্থিত হওয়ায় শরৎচন্দ্র তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া স্বামীজীর সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। ইনি আয়ারল্যাণ্ডবাসী জনৈক শিক্ষিত খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহার ও যুক্তি প্রভৃতি সমস্ত অভ্রান্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক হিসাবে সমগ্র ব্রহ্মদেশে ইঁহার খুব নাম যশ আছে। একে ইংরেজ জাতির উপর বর্ম্মিজদিগের প্রভূত ভক্তি, তাহার উপর এই মুণ্ডিত-মস্তক শ্বেতাঙ্গ আইরিশ-

ম্যান নগ্নপদে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন পরিধান করায় এদেশের শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। ইনি ভারত ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধগয়া, কাশী, সারনাথ, নালান্দা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি এই প্যাগোডার নিকটবর্ত্তী একটি ফুঙ্গীচঙ্গে (বৌদ্ধ মঠ) বাস করেন। শরৎচন্দ্র জানাইলেন, অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়া ইনি যোগ প্রভাবে মানব মনের চিন্তাধারা পাঠ করিতে পারেন। ইনি কেন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন সেই সকল কথা বলিয়া স্বামীজীকে একদিন তাঁহার মঠে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরদিন স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হলে তাঁহার যে বক্তৃতা হইবে তাহা শুনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন।

পরদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় স্কুলে প্যাগোডা রোডস্থ ভিক্টোরিয়া হলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা হইল। সভাপতি রেঙ্গুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্শী ব্যারিষ্টার মিঃ কাওয়াসজী। বক্তৃতার বিষয় "আত্মা কি" ? সভা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় শরৎচন্দ্র আইরিশ্ ফুঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। স্বামীজী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া ব্রহ্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি, কিরূপে জীবন-বিকাশের স্তরে স্তরে

উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্ব উপলব্ধি হইতে পারে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতাটি এতই হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, আইরিশ্ ফুঙ্গী সভা ভঙ্গ হইবামাত্রই স্বামীজীর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"I have heard all about you from my Philosopher friend Sarat Chandra, but your learned lecture has charmed me this evening." বালক-স্বভাব স্বামীজী আইরিশ্ ফুঙ্গীকে দেখিয়া মহানন্দে নিজের গলার মালাটি খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন এবং পরদিন সকালে তাঁহার আশ্রমে যাইবেন বলিলেন।

স্বামীজীকে বিশেষ ক্লান্ত দেখিয়া আমি একখানি গাড়ী করিয়া তাঁহাকে রয়েল লেকে বেড়াইতে লইয়া গেলাম। স্বামীজী গাড়ীতে আইরিশ ফুঙ্গী ও শরৎচন্দ্রকে তুলিয়া লইলেন। হ্রদে পৌঁছিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া হ্রদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। বহু দ্বীপ সমন্বিত এই হ্রদটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। আমি পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু রেঙ্গুন রয়েল লেকের ন্যায় সুদৃশ্য ও সুরক্ষিত লেক কোথাও দেখি নাই। ফিরিবার পথে আইরিশ ফুঙ্গীকে তাঁহার মঠের নিকটে নামাইয়া দিয়া আসিলাম।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া

আইরিশ ফুঙ্গীর মঠে উপস্থিত হইলাম। শরৎচন্দ্রের নিরীশ্বরবাদিতার দিকে খুব ঝোঁক ছিল, এই দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীর মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ হইলে কাহার হার-জিত হয় তাহা দেখিবার ইচ্ছা-খুবই প্রবল।

বৌদ্ধ মঠে সমাগত দুই মহাত্মার শুভ সম্মিলনে উভয়েই ধর্ম্মভাবের বিনিময়ে বিশেষ প্রীত হইলেন। ইঁহারা বাহ্যভাবে পরস্পর বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন শিক্ষা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হইলেও উভয়েই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী, প্রভেদের মধ্যে স্বামীজী সাকারবাদী-শক্তির উপাসক—নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্ত; আর আইরিশ ফুঙ্গী নিরীশ্বরবাদী—শূন্য উপাসক—স্বধর্ম্মচ্যুত বৌদ্ধ। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় যে সমস্ত কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল তাহার ভাবটি দিলাম।

আইরিশ ফুঙ্গী—"আমি জগতের সকল ধর্ম্মের অসারতা ও বৌদ্ধ-সার্ব্বভৌমিকতা দেখিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই ধর্ম্ম জগতের প্রায় অর্দ্ধেক অধি-বাসীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।"

স্বামীজী—"আমরা জগতে প্রচলিত সকল ধর্ম্মকেই ভক্তি করি, সকল ধর্ম্মই সমান ও সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক।"

আইরিশ ফুঙ্গী—"এই মতের প্রবর্ত্তক কে?"

স্বামীজী—"যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব।"

আইরিশ ফুঙ্গী—"তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি ?"

স্বামীজী—"সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়।" শ্রীবুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মোহম্মদ প্রভৃতি অবতারগণ সকলেই স্ব স্ব প্রবর্ত্তিত পন্থাকেই একমাত্র মুক্তিমার্গ বলে ঘোষণা ক'রেছেন, ইঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্থক্য এই যে তিনি নিজে কোন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নি, জগতে প্রচলিত সকল ধর্ম্মের সার সত্যটুকু নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে 'যত মত তত পথ' দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অনন্তরূপ ও অনন্ত ভাবের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত কেউই বোঝাতে পারেন নি। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে না পারলে অমৃতের অধিকারী হওয়া যায় না এই বিশ্বাসে ওই ত্যাগী শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কোনদিন টাকা পয়সা স্পর্শ করেন নি, তিনি সহধর্ম্মিণীকে আনন্দময়ীর রূপ জ্ঞানে পূজা করেছিলেন। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের ইতিহাস জগতে আর কোথাও নাই।"

আইরিশ ফুঙ্গী—"বুদ্ধদেব কেবলমাত্র নির্ব্বাণের কথা বলেছেন—বাসনার ক্ষয় হ'লেই নির্ব্বাণ প্রাপ্তি। ঈশ্বর-বাদ তিনি স্বীকার করেন নি।"

স্বামীজী—"ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে নাস্তিক্যবাদ থাক্‌তে পারে না। যাঁরা বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মবাদী বা আত্মবাদী না

ব'লে নিরীশ্বরবাদী বলেন তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত। বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ দার্শনিক ঈশ্বরবাদী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আর্য্য ধর্ম্ম; তাঁর সাধনায় সিদ্ধি ভগবান লাভেরই জন্য, আমরা তাঁকে অবতার জ্ঞানে পূজা করি।"

তাহার পর স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির ও হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নয়। এই জগৎ-রহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসা হিন্দুর বেদে আছে, বৌদ্ধগণ বেদ মানিতেন এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বেদ মতের পর বৌদ্ধ মত, বৌদ্ধ মতের পর বেদ-মত নয়।"

আইরিশ ফুঙ্গী হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"The thing in itself is unknown and unknowable—ঈশ্বর বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানের অতীত অবাঙ্-মনসোগোচর।" স্বামীজী বলিলেন—"প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'ঈশ্বর একমাত্র শুদ্ধ মনের গোচর, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, তিনি ধ্যানে এক বিচারে বহু'।" কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আইরিশ ফুঙ্গীকে বলিলেন—"সব পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়, আপনার নিজ-ধর্ম্মেই মুক্তিলাভ হ'ত। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে ভুল করেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে বলে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'।"

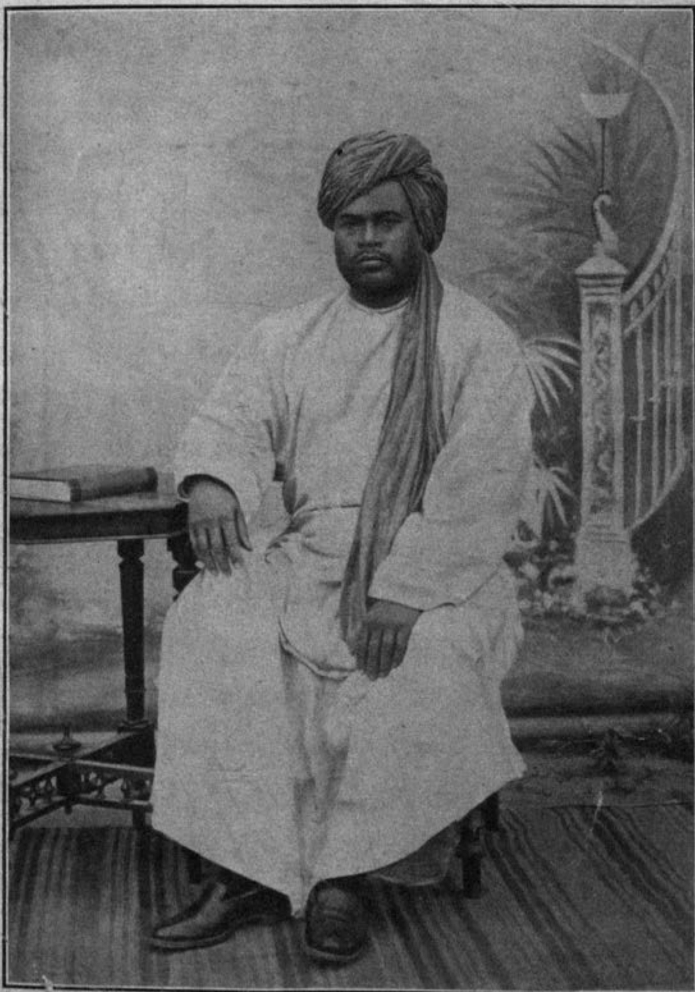
আইরিশ ফুঙ্গী আর কথার জবাব না দেওয়ায় শরৎচন্দ্র যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার হার হইয়াছে, তখন তাঁহার মনটি নিরাশায় ভরিয়া গেল। নিরীশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি যেরূপ আনন্দের সহিত স্বামীজীকে লইয়া গিয়াছিলেন, তদনুরূপ বিষাদে তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল।

তৃতীয় স্তবক

সাধুসঙ্গে শরৎচন্দ্র

অনেকে শরৎচন্দ্রকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যে একেবারে নাস্তিক ছিলেন, বা তাঁহার প্রাণ একেবারে ভক্তিহীন ছিল, ভাল করিয়া তাঁহার সহিত মেলামেশা না করিলে একথা বিশ্বাস হইত না। শরৎচন্দ্র বলিতেন, "ছেলেবেলায় আমার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস ছিল, বড় হয়ে সেটা হারিয়ে গিয়েছে, এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" মনে হয় সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের কষাঘাতই তাঁহার মনকে সংশয়ে আচ্ছন্ন করিয়া নিরীশ্বরবাদী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যদি কেউ সৃষ্টিকর্ত্তা থাকত, তাহ'লে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক নগ্নপদে তৃষিত-কণ্ঠে ভগবান্ ভগবান্ বলে মঠে, মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জ্জায়, প্যাগোডায় ও তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ না কেউ তার সন্ধান পেত; এরা সকলেই ভ্রান্ত। ঈশ্বর আছেন এ কথাটি অনুমান মাত্র, শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা। এর কোন প্রমাণ নেই।"

শরৎচন্দ্র অনেক প্রচারক ও পণ্ডিতের সহিত বাক্‌যুদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোন মতেই কেহ তাঁহার হৃদয়



স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

হইতে নিরীশ্বরভাব দূর করিতে পারেন নাই। এত দিন তর্কই করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার কোন সংকল্প তাঁহার মনে উদয় হয় নাই বা তাঁহার ভাগ্যে কোন দিন কোন আদর্শ চরিত্র মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয় নাই। এক্ষণে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর ও কাম-কাঞ্চন ত্যাগের জীবন্ত মূর্ত্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটায় তত্ত্বকথা শুনিবার আগ্রহ বাড়িয়াছিল।

শরৎচন্দ্র ডারুইন, টিণ্ডল, মিল্, হাক্সালে প্রভৃতির গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া নিজেকে স্বামীজীর নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিলেন—"যাহারা নাস্তিক তাহারাই বেশী আস্তিক, নাস্তিকরাই সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরকে খুঁজছে! যাদের মন দিবা রাত্র ঈশ্বরান্বেষণে ব্যস্ত তারা কি নাস্তিক হ'তে পারে? ঈশ্বর নির্ণয় করতে হ'লে নিবিষ্টমনে বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশল দর্শন ক'রতে হয়। কার্য্য-কারণ পরম্পরার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞান অতি সহজেই হয়। কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হ'তে পারে না। যখন জগৎ র'য়েছে তখন এর সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই আছে, এতে ভুল নেই।"

শরৎচন্দ্র—"যদি স্বভাবকে জগতের কারণ বলি?"

স্বামীজী—"স্বভাবের উৎপত্তির কারণকে তবে ঈশ্বর বল্‌তে পার।"

শরৎচন্দ্র—"স্বভাবের কারণ যদি ঈশ্বর হন্ তা হ'লে তাঁর কারণ কে ?"

স্বামীজী—"ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বভাবের কারণ এবং ইচ্ছাশক্তির কারণ স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্ম জ্ঞান ছাড়া ভগবানের আদি কারণ নির্ণয় করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি স্বয়ম্ভু, অনাদি, অদ্বিতীয়। তাঁকে জান্তে হ'লে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে শুদ্ধ মনে সাধন সাগরে ডুব দিতে হয়, উপর উপর ভাসলে হ'বে না।"

শরৎচন্দ্র—"যুক্তি ও পাণ্ডিত্য খানিকদূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু তারপর সব অন্ধকার।"

স্বামীজী—"কে বল্লে অন্ধকার ? তাঁকে ব্যাকুল হয়ে খোঁজ, নিশ্চয়ই দেখা পাবে। সংশয় গ্রন্থির পরপারেই অপরূপ জ্যোতিঃ ও অপার আনন্দ-সাগর। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে অনেকে তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন ; জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। বিষয়ী লোকরা সব কথা শুনে যায়, কিন্তু বিশ্বাস করে না।"

শরৎচন্দ্র—"এত অবিশ্বাস আসে কেন বলুন ত ?"

স্বামীজী—"এই অবিশ্বাসই হ'ল বাধা, শুধু বাধা নয় বিষম ব্যাধি। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুলো এগুতে দেয় না। সাধনা ও সৎকর্ম্মের দ্বারা সংস্কারগুলো ক্ষয় ক'রে ফেলতে হ'বে। যার বিশ্বাস এ'সে গেল সে

ভাগ্যবান, তার আর কোন অভাব রইল না। বিশ্বাস দুর্ল্লভ ধন। আমাদের রোগ হ'চ্ছে বাসনা—প্রতিকার হচ্ছে বিবেক। এই বিবেকরূপী ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন, তাঁকে ভুললেই সব পণ্ড।"

শরৎচন্দ্র—"আপনি বহুদিন ত আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা ক'রছেন। কিছু পেলেন কি?"

স্বামীজী—শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু আমাদের নন, সারা জগতের কল্যাণের জন্য এ'সেছিলেন। ভগবান তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বাণীটির সার্থকতার জন্য অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের সংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ ও পাপিতাপীদের উদ্ধারের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে, খৃষ্টরূপে, মহম্মদরূপে, বুদ্ধরূপে, শঙ্কররূপে ও গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হ'য়ে অনেক লীলা করে গিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতার বাণী তিনি জীবনে প্রতিফলিত করেছেন, তাঁর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের অশ্রুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, লোক শিক্ষার্থ দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা, "যত মত তত পথ।" ঘোষণা, ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর এ'নেছে। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত "কথামৃত বাণী" সারা বিশ্ববাসীর তৃষিত প্রাণে শান্তি বারি সেচন করছে। তিনি বলেছেন—"জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, এ সব তিনি আছেন ব'লে সব আছে, তাঁকে বাদ দিলে কিছুই

থাকে না। একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু একককে মুছে ফেল্‌লে শূন্যের কোন মূল্য থাকে না। জন্ম, মৃত্যু, এসব ভেল্কির মত ; এই আছে এই নেই। শুধু আহার, নিদ্রা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের সেবাতেই জীবন ক্ষয় ক'রলে হবে না। ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্র—"তাঁকে আমরা দেখতে পাই না কেন ?"

স্বামীজী—"ঠাকুর ব'লতেন্—সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই ; সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই। তিনি আরও বলেছেন—পানায় ঢাকা পুকুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌ছ পুকুরে জল নেই। যদি জল দেখবে, তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে ঈশ্বর দেখা যায় না, যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও মায়াকে সরিয়ে ফেল।"

শরৎচন্দ্র—এ মায়া জিনিষটি কি ?

স্বামীজী—ব্রহ্মের যে শক্তি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি হ'য়েছে সেটির নাম মায়া ! মায়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, আমাদের মায়াবৃত বিষয়-মুখী মন, স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশ এই সবেতেই মগ্ন থাকে, আর এই সব অসার অনিত্য ধনকে সার নিত্য ব'লে মনে হয়। ভগবানের দয়া না হ'লে ও মায়ার হাত থেকে কারু নিস্তার নেই। কিন্তু তাঁর কৃপা হয় কার উপর ? তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ভাব্‌ছেন, কিন্তু জীবের প্রাণ কি তাঁর কৃপা পাবার জন্য লালায়িত হ'য়েছে ? তাঁর কৃপা

পাবার উপায় হ'চ্ছে চোখের জল,—তাঁর একান্ত শরণাগত হ'য়ে কেঁদে কেঁদে কৃপা ভিক্ষা চাইতে হয়। তাঁর দয়া তখন হয়—যখন তিনি বুঝেন, হ্যাঁ, এ ঠিক্ ঠিক্ আমায় ভালবাসে, আমাকেই চায়—কামিনী কাঞ্চনে এর মন নাই। এদিকে বিষয়ে ষোল আনা টান্ র'য়েছে, ওদিকে মুখে শুধু কৃপা কর, দেখা দাও, বললে কি তাঁর আসন টলে ? এ কপট ভণ্ডামি যে দিন চলে যাবে, প্রাণ সরল হবে—মন শুদ্ধ হবে সেই দিনই তাঁর দয়া হ'বে।

শরৎচন্দ্র—ঈশ্বর যদি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা ভাবেন, তবে তাদের এত দুঃখ কেন ?

স্বামীজী—তিনি শুধু মঙ্গলময় নন্, তিনি সর্ব্বমঙ্গল-ময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্। ভগবান যখন যাহা কিছু করেন সবই জীবের মঙ্গলের জন্য। আমাদের বাপ মাও ছেলের জন্য মঙ্গল কামনা করেন বটে, কিন্তু তাঁরা সর্ব্বশক্তিমান নন্। ঈশ্বরে একত্রে এ দুটি গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি দুঃখ কষ্ট দেন, তবে নিশ্চয়ই জান্‌বে এ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর দয়া নিহিত আছে। যাকে আমরা দুঃখ বলি, বাস্তবিক তা দুঃখ নয়—দীক্ষা! ক্ষণিক সুখের লোভে আমরা ভগবানকে ভুলে যাই, তাই তিনি কৃপা করে দুঃখ-রূপ দীক্ষা দিয়ে তাঁকে মনে পড়িয়ে দেন। তাঁর দয়া দুই ভাবে অনুভব করতে হয়—অনুকূলে দয়া ও প্রতিকূলে দয়া। যখন তিনি জীবের আকাঙ্ক্ষিত ধন, জন, পুত্র,

পরিবার, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দিয়ে খেলাঘর সাজিয়ে দেন তখন সেটি তাঁর অনুকূল দয়া, আর যখন সেগুলি একে একে কেড়ে নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে তাঁর দিকে টেনে নেন্ তখন হচ্ছে তাঁর প্রতিকূল দয়া।

শরৎচন্দ্র—অদৃষ্ট, দৈব ও পুরুষকার বিষয়গুলি কি ভাল বুঝ্‌তে পারি না।

স্বামীজী—এ সংসারে কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ চণ্ডাল, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান, কেহ হিংস্র, কেহ দয়ালু, কেহ দেবসেবা করে সুখ্যাতি অর্জ্জন ক'রছে, কেহ বিষ্ঠা পরিষ্কার করে ঘৃণিত হ'চ্ছে, এই বৈষম্যের কারণ কি অনুসন্ধান ক'রলেই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট জানা যায়। দৈব ও পুরুষকার, এই দুইয়েরই প্রভাব আমাদের জীবন পরিচালনা করে। দৈবের ফল পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে মানুষ বর্ত্তমান জীবন পেয়ে থাকে। বর্ত্তমান জীবনের কতক অংশ হয়তো বর্ত্তমানেই পায়, কিন্তু পূরো পায় না। সেইটে দৈবরূপে পরজীবনে তার সুখ দুঃখের কাঁটা পরিচালনা করে। পুরুষকারটিও দৈবশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাঁর কৃপা ছাড়া 'পুরুষকার' কথাটি অর্থহীন। দৈবের সাধনায় পুরুষকার আবশ্যক, আবার পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম সাধনায় দৈব বা ভগবৎ কৃপা আবশ্যক।

শরৎচন্দ্র—ভাগ্য বা অদৃষ্টের খণ্ডন হয় কি ?

স্বামীজী—সংসারী লোক অহং জ্ঞানেই মত্ত। কিন্তু যখন দুঃখে, শোকে, পীড়ায়, দারিদ্র্যে ও হতাশায় জরজর হয়ে পড়ে, যখন নিজের চেষ্টা, নিজের উদ্যম, নিজের যত্ন ও পরিশ্রম কোনরূপেই ফলদায়ক হয় না তখনই সে ভাবে অদৃষ্টের কথা, আর বলে—'অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়'।

শরৎচন্দ্র—যদি আমার কর্ম্মফল জনিত অদৃষ্টে যা আছে, তাহাই অনিবার্য্য তবে ঈশ্বর আরাধনা বা ধর্ম্মকর্ম্মে প্রয়োজন কি ?

স্বামীজী—অদৃষ্টবাদে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস কিন্তু 'অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়' এ কথায় আমার আস্থা নাই। কর্ম্মফলরূপ অদৃষ্ট প্রকোষ্ঠে ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ যাহা কিছু সঞ্চিত হ'য়েছে, তা একেবারে অটল অচল অখণ্ড বা অপরিবর্ত্তনীয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। এক পরমাত্মা ভিন্ন এই বিশ্বসংসারে অদাহ্য, অশোষ্য, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য বা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আর কিছু থাক্‌তে পারে না। যেখানে রোগ, সেইখানেই ঔষধ ; যেখানে অন্ধকার, সেইখানেই আলো ; যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই পরিত্রাণ ; যেখানে ধর্ম্মগ্লানি, সেইখানেই ধর্ম্ম স্থাপন—ইহাই সংসারের চিরন্তন নিয়ম। সকল বিষয়েই যদি এক নিয়ম, তবে অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিপরীত হ'বে কেন ? যদি দুঃখের ভার লাঘব হবার উপায় না থাকে ত'াহলে

লোকে এত পুণ্য সঞ্চয় করে কেন ? এত পরোপকার, এত দান, এত কঠোর তপস্যা, এত তীর্থ দর্শন, এত শাস্ত্র চর্চ্চা, ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? যদি দুরদৃষ্ট খণ্ডন বা পাপ মোচনের কোন উপায় না থাকে তবে যুগে যুগে অবতারের প্রয়োজন কি ছিল ? যীশুখৃষ্টের পরিত্রাতা Saviour কিম্বা মোহাম্মদের 'রশুল' Prophet অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কপাল-মোচন' নামের সার্থকতা কোথায় ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব'লেছেন—"তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত কর্‌বো"; যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন —"চোখের জলে পূর্ব্ব জন্মের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়"; যুগঋষি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ভগবানের আর একটি নাম 'কপাল-মোচন'। তাঁর কৃপা হ'লে এক মুহূর্ত্তে মানুষের কপাল (অদৃষ্ট-লিখন) মুছে যেতে পারে। ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে এই বলে প্রার্থনা ক'রলে "হে দয়াময় ! আমি অসহায় দুর্ব্বল, ইহ জন্মে বা জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে সকল পাপ সঞ্চয় ক'রেছি, তুমি দয়া ক'রে সেগুলি ক্ষমা কর, আমার সমস্ত কর্ম্মফল ক্ষয় করে দাও, প্রভু !" অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতে পারলে নিশ্চয় তাঁর দয়া হ'বে। ছেলে কাঁদলেই মায়ের আসন টলে।

শরৎচন্দ্র—সকলেই কি কাঁদতে পারে ?

স্বামীজী—বেশী বুদ্ধিমান হ'য়েই ত গোল বাধিয়েছ। পাটোয়ারী বুদ্ধিটুকু সরিয়ে ফেল, পথ সহজ হবে। হেসে কেউ ভগবান লাভ করেনি, যারা তাঁকে পেয়েছে কাঁদতে কাঁদতেই পেয়েছে।

স্বামীজীর সহিত শরৎচন্দ্রের ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল। এই সময় শরৎচন্দ্র বহু দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া রেঙ্গুন সহরে অবস্থান করিতেন; অস্থায়ী চাকরী সামান্য আয়, মনে সুখ শান্তি আশা ভরসা কিছুই নাই, অভাব ও দৈন্যের মধ্যে না গৃহী না সন্ন্যাসী-ভাবে জীবন যাপন করা তাঁহার বিড়ম্বনা বোধ হইতেছিল। এই সময় স্বামীজীর মুখ নিঃসৃত তত্ত্বকথা ও উপদেশগুলি তাঁহার তাপিত প্রাণে মৃত-সঞ্জীবনী ঢালিয়া দিল ও এক বিস্ময়কর বৈরাগ্যের ভাব আনিয়া দিয়াছিল। শরৎচন্দ্র এক নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধান পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এরূপ উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের গ্লানি সহ্য করিয়া লাভ কি? বুঝি মানবের অনন্ত পিপাসা এই ক্ষুদ্র সংসার নদীতে মিটে না; বুঝি উহার জন্য লোক চক্ষুর অন্তরালে কোথাও শান্তি সমুদ্র লুক্কায়িত আছে। স্বামীজীর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিত জীবন কি সুন্দর! কি মধুময়! কি অনাবিল ও শান্তিপূর্ণ? কোন উদ্বেগ নাই, অশান্তি নাই, বাসনা নাই, সংকীর্ণতা নাই, শান্তি যেন মূর্ত্তিমতি হইয়া ওঁর হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিতেছে। এই দুর্ল্লভ সাধু

সঙ্গের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শরৎচন্দ্রের সন্ন্যাসী হইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এ কয়দিনে তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ভস্মাবৃত জটাজুটধারী সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহিত এই আদর্শ-চরিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদিগের কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শরৎচন্দ্র স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, গেরুয়া না পরেও সন্ন্যাসী হওয়া যায় কি ?"

স্বামীজী—"ধর্ম্ম হ'চ্ছে মনের। গেরুয়া না প'রেও মুক্ত হওয়া যায়। মানুষ মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। আগে চাই মন, পরে বাহিরের সাহায্য। মন ভাল হ'লে গেরুয়ায় যেমন বাহিরের কিছু সাহায্য ক'রে, মন খারাপ হ'লে তেমনি গেরুয়ার দ্বারা ভণ্ডামির সহায়তা হয়। গেরুয়া, তিলক ফোঁটা কাটা, তীর্থ যাত্রা, হজ, কীর্ত্তন, জপ, তপ, কিছুই ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্মের উপকরণ মাত্র। এগুলি মানুষের মনকে ভগবৎ-কৃপা-ভিখারী হ'বার উপযুক্ত করে।"

শরৎচন্দ্র—তবে মুক্তি কিসে হয় ?

স্বামীজী—জীবাত্মা পরমাত্মার জন্য আত্মহারা না হ'লে মুক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র—আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী হ'বার নিয়ম কি ?

স্বামীজী—মঠের সন্ন্যাসী হ'তে গেলে প্রথম তিন

বৎসর শিক্ষানবীশ থাক্‌তে হয়, তারপর তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। এই ছয় বৎসর পরে মঠাধ্যক্ষ তোমায় সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা ক'রলে তবে সন্ন্যাস দেবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সংযমী ও আদর্শ ভক্ত হ'তে হবে।

শরৎচন্দ্র—ঐ ছয় বৎসর কি শিক্ষা ক'রতে হবে ?

স্বামীজী—মিশনের মূলমন্ত্র—Renunciation and Service—সংসারাসক্তি ত্যাগ, সর্ব্বভূতে ভগবান দর্শন ও জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করা।

শরৎচন্দ্র—সেবা কাজটি ঘরের মেয়েদের কাছেই ভাল শিক্ষা হয়, হিন্দুর মেয়ে আপন স্বামী পুত্রের যে ভাবে সেবা করে তার চেয়ে বড় আদর্শ কিছু হ'তে পারে কি ?

স্বামীজী—সতীর পতি সেবার মধ্যেও একটু স্বার্থ গন্ধ থাকে, কিন্তু মঠের ছেলেরা বিপন্ন রোগীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে "পীড়িত নারায়ণ" ভেবে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে।

শরৎচন্দ্র—মঠের বড় বেয়াড়া নিয়ম, ছয় বৎসর এ্যাপ্রেন্‌টিস্। ছ'বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়।

স্বামীজী—ডাক্তার হ'লে অপরের রোগের চিকিৎসা হবে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী হ'তে পারলে ভবরোগ থেকে নিস্কৃতি পাবে।

শরৎচন্দ্র—প্রতি বারে কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ সাধু সমাগম হয়, ওঁরা সকলেই কি ভবরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন ?

স্বামীজী—ওঁদের মধ্যে পেটের জন্য, নাম যশের জন্য, ঔষধাদি দিয়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, রাজদণ্ড এড়াবার জন্য অনেকে সাধু সেজে থাকেন, কিন্তু ভগবান লাভের জন্য সর্ব্বত্যাগী সাধু খুবই কম। বহু জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে কাম-কাঞ্চনে আসক্তিহীন না হ'লে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর বিদায়ের দিন আসিল, তিনি আজিকার জাহাজে মান্দ্রাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। মান্দ্রাজ হইতে স্বামীজীর সহিত যে ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন, তিনি স্বামীজীর জিনিষপত্র গোছ গাছ করিয়া ফেলিলেন। বিদায়াভিনন্দনের জন্য মাদ্রাজী ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হইলেন। সকলেই নীরবে স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইতেছেন। এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সকলেরই হৃদয় পরিপূর্ণ। সে নীরবতা ভঙ্গ করিতে কাহারও প্রাণ চাহিতেছে না। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়াতে দেখা গেল তাঁহার চক্ষু জলভারনত।

পক্ষাধিক কাল প্রত্যহ সান্ধ্য-সম্মিলনে স্বামীজীর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই মনে হইত যেন

সত্য যুগের গুরু ও শিষ্যবৃন্দের অপূর্ব্ব প্রেম ও শিক্ষার এক মধুর সম্মেলন।

স্বামীজীর সহবাসে এ সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য-অনল প্রজ্বলিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই। সাধুসঙ্গ-লব্ধ ক্ষণিক বৈরাগ্য-জাল স্বল্পদিনেই ছিন্ন হইয়া তাঁহার ঔদাস্য-শিথিল মন সাধারণ জীবনের আসক্তি-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অনুজ স্বামী বেদানন্দ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলে বিনা চেষ্টায় কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতি বৎসর আমার বাটিতে ও রায় সাহেব নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে ঠাকুরের যে তিথি-পূজা ও কল্পতরু উৎসব হইত তাহাতে শরৎচন্দ্র নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া ভজন ও কীর্ত্তন গান করিতেন। এ সময়ে ঠাকুর দেবতার গান ছাড়া তাঁহার মুখে কখন অন্য গান শুনি নাই। আমি শরৎচন্দ্রের গানের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীত শুধু কাণে বাজিত না, আমার প্রাণে গিয়া ঝঙ্কার তুলিত।

স্বামীজীর সহিত শরৎচন্দ্রের উল্লিখিত আলাপ আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া স্বামীজীর সহিত শরৎ-চন্দ্রের আলোচনা আমি এক স্থানে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এতদিন পরে শরৎচন্দ্রের জীবন-চরিত

লিখিবার আকস্মিক সুযোগ ঘটায় পুরাতন কাগজ পত্রের অন্তরাল হইতে উহার উদ্ধার সাধন করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

স্বামীজীর বহু উপদেশ আমার সংগ্রহ-শালায় আছে।

চতুর্থ স্তবক

শিকারী শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র একদিন তাঁহার কোন বন্ধুর বিদায় উপলক্ষে রেঙ্গুন লুইস্ ষ্ট্রীট্ জাহাজ ঘাটে আসিয়াছিলেন। আমিও ঐ জাহাজে একটি বিপন্ন বিধবা স্ত্রীলোক ও তাঁহার ক্রোড়-স্থিত রুগ্ন শিশু-সন্তানকে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম। তখন রেঙ্গুন সহরটিকে সংক্রামক রোগ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোয়ারেণ্টাইন আইন অনুযায়ী সহরের নবাগত ও প্রত্যাগত প্রত্যেক যাত্রীকে ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া জাহাজে উঠিতে ও নামিতে হইত। পোর্ট হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার ফয় সাহেব বারজন পুলিশ কনষ্টেবল্, একটি সার্জ্জেণ্ট ও একটি লেডী ডাক্তারের সাহায্যে এই কাজ করিতেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধুটির ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়া গেলে তিনি জাহাজে উঠিয়া গেলেন, কিন্তু লেডী ডাক্তারের আসিতে অযথা বিলম্ব হওয়ায় আমার সঙ্গী স্ত্রীলোকটি জাহাজে উঠিতে পারিলেন না, অথচ জাহাজের কুলীরা ইতিমধ্যে তাঁহার মাল-পত্র জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিল। জাহাজ ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই, একটি সিঁড়ি তোলা হইয়াছে ও অপরটি তোলা হইতেছে, এমন সময় লেডী ডাক্তার আসিয়া

বিধবার ক্রোড়স্থিত শিশুটির মুখে বসন্ত রোগের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে পাশ করিলেন না, অধিকন্তু আমার বিরুদ্ধে ডাক্তার ফয়ের নিকট রিপোর্ট করিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্ত শিশুকে জাহাজে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া ডাক্তার সাহেব আমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। রোগ সারিয়া গিয়াছে মুখে সামান্য দু একটি মাত্র দাগ আছে বলায়, তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ডাক্তার ফয়ের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে জাহাজের শেষ হুইসিল বাজিয়া গেল। দরিদ্র বিধবার শেষ সম্বল কয়েকখানি গহনাপত্র যে ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে সেই ট্রাঙ্কটি জাহাজে উঠিয়া গিয়াছে শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ডাক্তার ফয়কে বলায় তিনি আমার দিকে অগ্নিচক্ষু করিয়া উত্তেজিত ভাবে সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন —"এই বাবুটিকে একটু সাহায্য কর যাহাতে দু এক মিনিটের মধ্যে এঁর মালপত্রগুলি জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে পারেন।"

শরৎচন্দ্র আমাকে সাহায্য করিবার জন্য কুলীগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের উপর গেলেন। কিন্তু আমাদের ট্রাঙ্কটি খুঁজিয়া না পাওয়ায় ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহার কোলে রুগ্ন শিশুটিকে দিয়া ঐ বিধবাকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিলাম এবং অতিকষ্টে শুধু ট্রাঙ্কটি খুঁজিয়া পাইলাম, বিছানাপত্র ও খাবারের ঝুড়ি

জাহাজেই রহিয়া গেল, জাহাজ ছাড়িয়া দিল। কোয়ারেণ্টাইন আইনের আমলে জাহাজে উঠা নামা এক ভীষণ ব্যাপার! পোর্ট হেলথ অফিসারের এখানে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার কাহারও সাধ্য ছিল না।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও স্ত্রীলোকটি কে, ভাই?" আমি বলিলাম—"সে এক গভীর দুঃখের করুণ কাহিনী! উনি মৌবিন জেলার এক পোষ্ট মাষ্টারের স্ত্রী, বেচারীর মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল, ওই একটি মাত্র সন্তান। হঠাৎ পোষ্ট মাষ্টার ও ছেলেটি দু'জনেরই বসন্ত রোগ হয়। পোষ্ট মাষ্টার আজ চার দিন হ'ল মারা গিয়েছেন। সেদেশে আর কোন বাঙ্গালী না থাকায় বর্ম্মা ডাকপিয়নরা মড়াটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়, আর ডাকঘরের উপর পোষ্ট মাষ্টারের কোয়ার্টারে সংক্রামক রোগ হ'য়েছে ব'লে বিধবা ও ছেলেটিকে সেই দিনই বাড়ী ছেড়ে দিতে হ'য়েছে। নিরাশ্রয় অনাথা রুগ্ন শিশুটিকে নিয়ে দুদিন পথে ব'সেছিল। কাল ডাকপিয়ন একখানি চিঠি দিয়ে গেল, খুলে দেখি তার মধ্যে একখানি টেলিগ্রাম, তাহাতে লেখা আছে—From Mrinalini Debi To Pramila Debi, Care of Mr. C. K. Sirkar, Asst. Engineer, P.W.D., Pegu. Husband died of Small-pox this morning,

dead body thrown in the river, son suffering, driven out from Govt. Quarter, shelterless. এই টেলিগ্রামখানির নীচে বাঙ্গালায় মিসেস্ সরকার আমাকে লিখেছেন, "আপনি দয়া ক'রে যদ্যপি নিরাশ্রয় অনাথা বিধবাটিকে সেখান থেকে আনিয়ে পেগুতে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দেন তবে দুটি জীবন রক্ষা হবে। উনি মফঃস্বলে আছেন, নচেৎ আপনাকে কষ্ট দিতাম না।"

কলিকাতা হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার ও আর্কিটেক্ট মিঃ সি, কে, সরকার তখন বর্ম্মায় গবর্ণমেণ্ট সার্ভিসে ছিলেন। ইঁহারা স্বামী স্ত্রী বহুবার রেঙ্গুনে আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসা যাওয়া করিতেন বলিয়া আমাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মিঃ সরকারের চালচলন একটু সাহেবীয়ানা ধরণের হইলেও মিসেস সরকার প্রকৃতই হিন্দু গৃহের আদর্শ গৃহিণী ও দয়াবতী রমণী ছিলেন। মিঃ সরকার যখন মৌলমিনের কক্‌রিক সবডিভিসনে ছিলেন, তখন এই পোষ্ট মাষ্টার পরিবারের সহিত ইঁহাদের আলাপ পরিচয় হয়।

শরৎচন্দ্র আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি করলে?"

আমি বলিলাম—"আমার ভাগনে কাল রাত্রে গিয়ে ওঁদের নিয়ে এসেছে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"এখন ওদের কোথায় রাখবে ?"

আমি বলিলাম—"আজই পাঁচটার ট্রেণে পেণ্ডুতে মিঃ সরকারের বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"মিঃ সরকার ত মফঃস্বলে টুরে আছেন।"

আমি বলিলাম—"তা হ'ক, সে আমার নিজের বাড়ীর মত।"

শরৎচন্দ্র তখন প্রশ্ন করিলেন—"ক'দিন সেখানে থাক্‌বে ?"

বলিলাম—"তু' তিন দিন বা মিঃ সরকার ফিরে আসা পর্য্যন্ত।"

শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে জানাইলাম যে, সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছেন এবং নানাপ্রকার শিকারের প্রলোভনও কম নহে। আমি সেখানে প্রায়ই শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্য গমন করিয়া থাকি। পুষ্করিণীতে বহু মাছ আছে, আশেপাশের জঙ্গলে ছোট ছোট হরিণ মিলে। ইহা ছাড়া প্রচুর পাখী পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন যে, তিনি শিকারের বড় ভক্ত। সেজন্য তাঁহাকে যদি আমি সঙ্গে লইয়া যাই ত তিনি আনন্দ লাভ করিবেন। আমারও বন্ধুগণ সঙ্গে শিকার করিবার আগ্রহ কম নহে। স্থির হইল, উভয়ে তথায় যাইব।

এই সময় শরৎচন্দ্র বেকার অবস্থায় বসিয়াছিলেন, কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না। তিনি প্রস্তুত হইয়া আমাদের সহিত পাঁচটার ট্রেণে পেগু যাত্রা করিলেন।

পোষ্ট মাষ্টারের ছেলেটির একটি অপূর্ব্ব নাম ছিল—'শিং ভাঙ্গা'। ট্রেণে রুগ্ন শিং ভাঙ্গা কাঁদিলে শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময়ে তাহাকে কোলে লইয়াছিলেন। দেখিলাম শিশু-সাথী হইয়া শিশুদের সহিত খেলা করিবার ও হাস্য-রসের খোরাক যোগাইবার কৌশল শরৎচন্দ্রের বিলক্ষণ জানা আছে।

পেগু রেঙ্গুন হইতে ৪৫ মাইল, ট্রেণে তিন ঘণ্টার পথ। আমরা রাত্রি ৮টার সময় মিঃ সরকারের বাঙ্গলোয় পৌঁছিলাম। মিসেস সরকার শিং ভাঙ্গার মায়ের বিধবা বেশ ও মলিন শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, চোখের জলে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর তিনি সস্নেহে শিং ভাঙ্গাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহাকে নিজের কাছেই রাখিবেন। মিসেস সরকার নিঃসন্তানা ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই শোকার্ত্ত প্রাণী দুইটিকে তিনি একান্ত আপনার করিয়া লইলেন।

মিঃ সরকার বাড়ী না থাকিলেও মিসেস সরকারের আদর যত্নে আমাদের দুইদিন খুব সুখেই কাটিয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময়ে মিঃ সরকার বাড়ী ফিরিলেন এবং শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপ পরিচয়ে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। মিঃ সরকারের আতিথ্যের উপর বিশেষ অত্যাচার হইবে ভাবিয়া শরৎচন্দ্র একটু সঙ্কুচিত হওয়ায় আমি তাঁহাকে অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া রেঙ্গুনে গেলাম এবং পর সপ্তাহে আবার পেগুতে ফিরিয়া আসিলাম। এই কয়দিন প্রত্যহ সকালে আমি শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া পেগুর দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখাইলাম। পেগু নদীর পরপারে এক মাইল দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি শায়িত বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি অবস্থিত। এই মূর্ত্তিটি পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি, প্রায় ১২০ ফুট লম্বা। এই বিরাট মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে লোকে এই মূর্ত্তিটি দেখিবার জন্য পেগুতে আসিয়া থাকে।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—Burma is famous for Pagodas, Pohn-gyees, and Pariah-dogs. শরৎচন্দ্র কখন ইতিপূর্ব্বে বর্ম্মার পল্লীগ্রামে আসেন নাই। এখানে অসংখ্য প্যাগোডা, ফুঙ্গী ও পল্লী কুকুর দেখিয়া প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পেগুর সুবৃহৎ সোয়েমড প্যাগোডার চূড়া দূরে নীল আকাশ ভেদ করিয়া সূর্য্য কিরণে ঝলমল করিতেছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত

বড় ফয়া এদেশে আর কয়টি আছে ?" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, অসংখ্য ফয়ার মধ্যে যে চারটি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববৃহৎ, তাহার মধ্যে প্রথমটি রেঙ্গুন সহরে—নাম সোয়েডাগন, দ্বিতীয়টি এই পেগুতে—নাম সোয়েমড, তৃতীয়টি প্রোম সহরে—নাম সোয়েসান্‌ড, চতুর্থটি মাণ্ডালে সহরে—নাম মহামত মুনি ফয়া। আপার বর্ম্মার আভা ও অমরাপুর অঞ্চলে এমন উত্তুঙ্গ পাহাড় বা সুগভীর জঙ্গল নাই যাহার মধ্যে একটি না একটি ফয়া আছে। আপার বর্ম্মার এক পাগান সহরেই ৯৯৯৯ নয় হাজার নয় শত নিরানব্বুইটি ফয়া আছে।

শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—"অনেক ফয়া সংস্কার অভাবে পড়ে যাচ্ছে, তবুও এত নতুন ফয়ার আবশ্যক কি ?"

আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, "রেঙ্গুন, পেগু, প্রোম ও মাণ্ডালের চারটি বড় ফয়া ছাড়া অন্যগুলির ইহারা সংস্কার করে না। পিতৃ পিতামহের তৈরী মন্দির সংস্কার করা অপেক্ষা নিজে একটি ফয়া স্থাপন করা বেশী পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করে। মন্দির স্থাপনার ন্যায় পুণ্যকীর্ত্তি বর্ম্মাদেশে আর কিছুই নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদিগকে ইহারা 'ফয়া তাগা' বলে। ইহজগতে ফয়া তাগা মহা পুণ্যাত্মা ও ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মান পায় ও মরণান্তে সে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হয়।

নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় মাছ ধরার মত আমোদ আর কিছুতেই নাই, কিন্তু একটি সঙ্গী না পাইলে মাছ ধরিবার সুবিধা হয় না। শরৎচন্দ্রকে সাথী পাইয়া আমি রসুল বক্সের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে গেলাম। শরৎচন্দ্রের এ বিষয়ে ঝোঁক যতটা ছিল, দক্ষতা ততটা ছিল না। বড় মাছ ধরিতে হইলে বহুক্ষণ ফাৎনার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তাহা তাঁহার মোটেই ছিল না দেখিয়া আমি তাঁহার হাতে একটি ছোট ছিপ দিয়া পুঁটী মাছ ধরিতে বলিলাম। তিনি প্রতি টোপে কোন বার একটি কোন বার এক সঙ্গে দুইটি করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি পুঁটী মাছ ধরিয়া একটি টিনের মধ্যে জমা করিলেন। আমার হুইলের ছিপে একটি খুব বড় মাছ খাইয়া পুকুরের মাঝ অবধি সূতা টানিয়া লইয়া গেল। আমি মাছটি দক্ষতার সহিত খেলাইতে খেলাইতে যখন পুকুরের কিনারার দিকে টানিয়া আনিতেছিলাম, তখন শরৎচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া উৎসাহের সহিত বলিতেছিলেন—"ভ্যালারে মোর ভাইসাহেব, ভ্যালারে মোর ভাইসাহেব।" এমন সময় হঠাৎ মাছটা খুলিয়া যাওয়ায় তিনি "ঘোচালে ব্যাটা আহাম্মক" বলিয়া হতাশায় বসিয়া পড়িলেন। বড় মাছ খেলাইতে খেলাইতে ছুটিয়া গেলে মনে কিরূপ নৈরাশ্য আসে তাহা মাছ ধরা নেশা যাঁহার নাই তাঁহার পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন।

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া থাকিয়া শরৎদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভ্যালারে মোর ভাই সাহেব ও ঘোচালে ব্যাটা আহাম্মক' গল্পটা কি, শরৎদা ?"

শরৎচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তুমি এ গল্পটা জান না ? কলকাতার লাল দীঘিতে এক বৃদ্ধ মিঞা সাহেব প্রত্যহ মাছ ধরত, অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাছ ধরা দেখত। মিঞা সাহেব মাছকে খেলিয়ে খেলিয়ে যখন ডাঙ্গায় তুলত তখন সকলেই প্রশংসা করে বলত 'ভ্যালারে মোর ভাই সাহেব,' আর কোনবার দৈবাৎ মাছ সূতা ছিঁড়ে পালালে সকলে ভর্ৎসনা ক'রে ব'লত—ঘোচালে ব্যাটা আহাম্মক ! গিরীন ভাই, সংসারের ব্যাপারও ঠিক তাই। যখন লোকের চাকরী বাকরী থাকে, রোজগারপত্র ক'রে, সে দশজনের একজন, তখন সকলে বলে 'ভাই সাহেব', আর যখন চাকরী থাকে না, রোজগার থাকে না, বা কারবারে লোকসান দিয়ে ঘরে বসে থাকে তখন বলে 'বেকুব' 'আহাম্মক'।"

তারপর শরৎচন্দ্র বলিলেন—"চল আজ আর কিছু হ'বে না, তোমার হাত-পালানো মাছটা এতক্ষণ গিয়ে তার জ্ঞাতিগোত্র কুটুম্ব সকলকে বলে দিয়েছে যে একটা নিষ্ঠুর লোক তোড়জোড় করে আমাদের ধরবার জন্য ফাঁদ পেতে বসে আছে, আমি অনেক কষ্টে পালিয়ে এ'সেছি।"

ঐ পথে যে সমস্ত লোক চলাচল করিতেছিল তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন বর্ম্মিনী আসিয়া শরৎচন্দ্রকে বর্ম্মা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মাছ বিক্রী ক'রবেন ?" শরৎচন্দ্র তখন বর্ম্মা ভাষা জানিতেন না। এই সুন্দরী বর্ম্মিনী দুইজনকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরা কে হে ?" আমি বলিলাম,—"এই পাড়ার মেয়ে, বেড়াতে বেরিয়েছে।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে উহারা কি চাহে ?"

আমি বুঝাইয়া দিলাম, উহারা মাছ কিনিতে চাহে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমরা কি জেলে, যে মাছ বিক্রী ক'রব ?"

আমি বলিলাম—"তুমি বোধ হয় জান না, বর্ম্মিজরা আমাদের বঁড়শী দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে মাছ ধরা মোটেই পছন্দ করে না। এদেশে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এরা জীবন্ত মাছ কখন মেরে খায় না। সমস্ত বর্ম্মা দেশে পথে, ঘাটে, বাজারে কোথাও জীবন্ত মাছ বিক্রী হয় না। কই, মাগুর মাছ পর্য্যন্ত বিদেশী জেলেরা মেরে বাজারে আনে। এরা ভারী দয়ালু জাত। মেয়েরা মাছ কিনে পুকুরে ছেড়ে দেয়, মেলাতে গিয়ে ব্যাধের কাছ থেকে পাখী কিনে উড়িয়ে দেয়।"

শরৎচন্দ্র বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"বাঃ বেশ ত! আমি গোটাকতক মাছ ওদের অমনি দিয়ে দিচ্ছি।"

আমি বলিলাম—"অমনি দিলে ওরা নেবে না।"

তাহার পর পয়সায় তুটা হিসাবে দর স্থির হইল। কুড়িটি মাছ বিক্রয় করিয়া শরৎচন্দ্র দশটি পয়সা হাতে লইয়া বলিলেন—"এক প্যাকেট সিগারেট হ'বে এ॰ ।"

তারপর হাসিয়া বলিলেন, "আমি বর্ম্মা ভাষা জান্‌লে ওদের সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা ক'রতাম।"

আমি বলিলাম—"ঠাট্টা তামাসা ক'রলে ওরা 'ফনানে ছা' ক'রে দেবে।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফনানে ছা কি?"

আমি বলিলাম—"জুতা পেটা করে দেবে।"

এদেশে অবরোধ প্রথা না থাকায় স্ত্রীলোকরা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে। মেয়েরা শতকরা নব্বই জন লিখিতে পড়িতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার সমস্তই মেয়েদের হাতে। ইহারা অত্যন্ত সরল ও আমোদপ্রিয় জাতি; কিন্তু কোন সামান্য কারণে অপমানিত হইলে তৎক্ষণাৎ পায়ের জুতা খুলিয়া মারিতে উদ্যত হয়। পথে ঘাটে অনেক ইংরেজকেও ইহারা জুতা পেটা করিতেছে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মেয়েদের এত সাহস দেখি নাই।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"মেয়েগুলি দেখতে বেশ সুশ্রী, খোঁপায় ফুল গুঁজে মুখে 'তানাখা' মেখে বেশ হাসি মুখে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু মেজাজটি অমন মিলিটারী কেন?"

আমি বলিলাম—"এরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"শুনেছি আগে মগের মুল্লুকে বাঙ্গা[illegible] বাবুরা কেউ এলে আর দেশে ফিরে যেত না, এরা যাদু মন্ত্রে ভেড়া [illegible] নিয়ে বা[illegible]"

আমি বলিলাম—"সে মান্ধাতা আমলের কথা, আজকালকার নয়।"

পরদিন বৈকালে রসুল বক্সের পুকুরের ধারে গিয়া দেখিলাম, পুকুরের ভাল বাঁধান ঘাটটিতে একজন উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ ভদ্রলোক মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি বিলাতী ছিপ, একটি বন্দুক, একজন বয়, একটি সুটকেশ, ওয়াটার প্রুফ কোট, টীফিন বক্স, হুইস্কির বোতল প্রভৃতি বহু সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে। সাহেব ফাৎনার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। আমরা সেই ঘাটের অন্য পার্শ্বে বসিলাম। আজ শরৎচন্দ্র হুইলের ছিপ লইয়া বসিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ পরেই একটি বড় মাছ ধরিয়া ফেলিলেন। সাহেবটি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ও শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টের প্রশংসা করিয়া আমাদের সহিত সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলায় শরৎচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব, আপনি এমন সুন্দর বাঙ্গালা কথা শিখলেন কি করে ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি অনেক দিন কলকাতায় ছিলাম। আপনি খুব lucky, বসিবামাত্রেই অত বড় মাছটা ধরে ফেললেন। আর আমি সকালের ট্রেণে রেঙ্গুন থেকে এসে একটি ছোট মাছও ধরতে পারিনি। যদি আমি বাড়ীতে মাছ নিয়ে না যাই মেম সাহেব আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেবে না।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"কেন, ব্যাপার কি ?"

সাহেব বলিলেন—"এত দূরে টাকা খরচ করে আসতে মেম সাহেব মানা করেছিল, আমি বলে এসেছি আজ নিশ্চয়ই একটা মাছ ধরে আন্‌ব।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটি নিয়ে যান।"

সাহেব বলিলেন—"কুড়ি পাউণ্ড ওজনের অত বড় মাছ নিয়ে আমি কি ক'রব ? আমি শুধু নিজে ধরেছি ব'লে মেমসাহেবকে মাছটি একবার দেখিয়ে আপনাদের ফেরত দেব। রেঙ্গুন ষ্টেশনে আমার গাড়ী আসবে, চলুন একসঙ্গে যাই।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমরা ত রেঙ্গুনে যাব না, পেগুতে থাকি।"

সাহেব বলিলেন—"মিষ্টার সরকারকে আমি জানি,

উনিত রেঙ্গুনের লোক, ফেয়ার ষ্ট্রীটে ওঁর ইঞ্জিনিয়ারীং ও কনট্রাক্টরের আফিস আছে।”

শরৎচন্দ্র বলিলেন—“সে কথা ঠিক, কিন্তু উপস্থিত আমরা পেগুর উকিল মিঃ চাটার্জ্জির বাড়ীতে আছি, দু’ তিন দিন পরে ফিরব। আচ্ছা সাহেব, আপনার এত মাছ ধরবার ঝোঁক হল কিসে?”

সাহেব বলিলেন—“Angling is my hobby, মাছ ধরা আমার নেশা। মেমসাহেব বলেন আমি পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই জেলে ছিলাম!”

তাহার পর শরৎচন্দ্রের উদারতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিয়া তিনি মাছটি লইয়া গেলেন এবং যাইবার সময় আমাদের দুইখানি কার্ড দিয়া গেলেন। কার্ডে নাম দেখিলাম Charles A. Cones, Secretary Burma Chamber of Commerce, Rangoon.

পরে এই কোনস্ সাহেবের সহিত রেঙ্গুনে আমি ও শরৎচন্দ্র প্রায়ই মাছ ধরিতে যাইতাম। এই সূত্রে তাঁহার মেম সাহেবের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হওয়ায় তিনি বহুবার চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদিগকে স্বহস্তে প্রস্তুত কেক, পুডিং প্রভৃতি বিশেষ আদর যত্নের সহিত খাওয়াইয়াছিলেন। মিসেস্ কোনস্ বড় মাছ ধরা হইয়াছে দেখিলে বড়ই খুসী হইতেন এবং ছোট একটি টুকরা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্টাংশ আমাদের দিতেন।

বর্ত্তমান কলিকাতা হাইকোর্টের জজ জষ্টিস অমরেন্দ্র-নাথ সেন যখন রেঙ্গুনে থাকিতেন, তখন তাঁহার খুব মাছ ধরিবার বাতিক ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে আমার সহিত মাছ ধরিতে যাইতেন। একবার মিঃ সেনের ভগিনীপতি মিঃ জে, আর, দাশ ব্যারিষ্টার তাঁহার মক্কেল আবদুলবারি চৌধুরী সাহেবকে তাঁহার পুকুরে মাছ ধরিতে দিবার জন্য একখানি চিঠি দেন, ঐ চিঠিখানি পড়িয়া আবদুলবারি সাহেব আমার হাতে তাঁহার পুষ্করিণীর রক্ষককে একখানি পত্রে লিখিয়া দেন, "পত্রবাহক সরকার বাবু ও সেন সাহেবের পোলাকে আমার পুকুরে মাছ মারিতে দিবেন, "বাইচ ন মারিবেক।" শরৎচন্দ্র আমার সঙ্গে ছিলেন এবং "বাইচ ন মারিবেক" এই চট্টল ভাষাটার অর্থ জানিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিলেন এবং ছিপে ছোট মাছ উঠিলেই, "বাইচ ন মারিবেক" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

মাছ ধরিবার সখ মিটিলে একদিন শরৎচন্দ্র মিঃ চাটার্জ্জির বন্দুক লইয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে আমার সহিত শিকারে বাহির হইলেন। পথ প্রায় জনশূন্য। দিনের বেলাতেই উদাস ভাব মনে আসে। দুইদিকে সারি সারি ঘন সেগুন বন ছাড়াইয়া একবারে খুব ঘন-কাঁটা ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। হামাগুড়ি দিয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকিতে আমাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। হরিণ-শিশুর আশায় কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া আছি,

এমন সময় পায়ের কাছে ফোঁ-ওঁ-স শব্দ শুনিয়া একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড গোখুর সাপ দুটি পাথরের ফাঁক হইতে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ কালকে সম্মুখে দেখিবামাত্র মাথা ঘুরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বন্দুকের বাঁট দিয়া উহার মাথার উপর জোরে একটি আঘাত করিয়া সাপ! সাপ! শরৎদা, পালাও বলিয়া জোরে দৌড় দিলাম। শরৎচন্দ্রও কৈ কৈ কি সাপ হে? বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণপণে দৌড় দিলেন। ঝোপের কাঁটা লাগিয়া তাঁহার শরীরের অনেক স্থান রক্তাক্ত হইয়া গেল। বাহিরে নিরাপদ স্থানে আসিয়া বলিলেন—"সাপটি কি জাতের ভাল করে দেখলে হ'ত?"

আমি বলিলাম—"না দেখেই তোমার ধাত ছেড়ে গিয়েছে, দেখলে কি তোমায় খুঁজে পাওয়া যেত?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"না হে! শুনেছি এ দেশে খুব বড় বড় কিং কোবরা ও শঙ্খচূড় সাপ আছে।"

আমার দেহ তখনও কম্পিত হইতেছিল। শরৎচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি বনে জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি, কিন্তু এত বড় প্রকাণ্ড সাপ দেখিনি। আজ গুরুদেব রক্ষা করেছেন।"

শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা তুমি তো বিশ বৎসর এদেশে আছ, বর্ম্মিজদের মধ্যে সাপুড়ে বা বেদে দেখেছ কি?

আমি বলিলাম "না, এ'দেশে সাপুড়ে সব বিদেশী—পাঞ্জাবী। যদিও বর্ম্মিজরা অনেকেই ঔষধ জানে, হাতে ক'রে সাপ ধরতে পারে।"

হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, তলোয়ারের ন্যায় বৃহৎ শাণিত দা হস্তে একটি বর্ম্মিজ রাখাল বালক আমাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই একখানি বৃহৎ দা হস্তে না লইয়া বাটির বাহির হয় না, ইহা অন্ধের যষ্ঠির মত ইহাদের সঙ্গের সাথী। বালকটি শরৎচন্দ্রের পায়ে রক্তের দাগের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, "আমাদের এখনই সাপে তাড়া করেছিল।"

—"কোন্‌খানে ?"

—"সম্মুখে এই জঙ্গলের মধ্যে।"

—"যদি আমি ঐ সাপটিকে এখনই ধরিয়া আনিতে পারি কত বক্‌সিস্‌ দিবেন ?"

শরৎচন্দ্র বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত চাও ?" সে পাঁচ টাকা বলায় শরৎচন্দ্র আগ্রহাতিশয্যে তাহাই দিতে রাজী হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সে জঙ্গল হইতে সেই প্রকাণ্ড গোখুরা সাপটিকে ধরিয়া আনিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিলাম সাপটি কুণ্ডলী পাকাইয়া তাহার সমস্ত হাতটি জড়াইয়া আছে, লেজের দিকে খানিকটা

ঝুলিতেছে, মুখটি মুষ্টিবদ্ধ। শরৎচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"উঃ, এত বড় সাপ কেমন ক'রে হাত দিয়ে ধরলে বল ত.?"

আমি বলিলাম—"যেমন করেই ধরুক, এখন তুমি পাঁচটি টাকা বের কর।" শরৎচন্দ্রের সাধ ছিল খুব, কিন্তু সামর্থ্য কিছুই ছিল না। পাঁচটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইবার সময় তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন নাই যে, বালকটি সত্য সত্যই জীয়ন্ত গোখুরা সাপ ধরিয়া আনিতে পারিবে। আমরা স্থানীয় উকিল চাটার্জ্জি সাহেবের বাড়ীর লোক, বেশী টাকা সঙ্গে লইয়া শিকারে বাহির হই নাই বলিয়া দুইটি টাকা দণ্ড দিয়া কোনরূপে তাহাকে সন্তুষ্ট করিলাম। সে তাহার বাঁ হাতে কব্জির মধ্যে একটি সেলাইয়ের দাগ দেখাইয়া বলিল—উহার মধ্যে গাছের শিকড় আছে, ঐ দ্রব্য গুণেই সে সাপ ধরিতে পারে।

পর সপ্তাহে শনিবারে আমি রেঙ্গুন হইতে পেগু ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মিঃ চাটার্জ্জি, মিঃ সরকার, মিঃ ঘোষাল ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই ট্রেন হইতেই মিষ্টার এম, কে, মিত্র, ডেপুটী এক্‌জামিনার সপরিবারে পেগু ষ্টেশনে নামিলেন দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে, তিনি একজিকিউটীভ্ ইঞ্জিনিয়ারের অপিসের

হিসাব পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন ও স্থানীয় ইনস্পেকসন্ বাঙ্গলায় উঠিবেন। আমার সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু পেগুর কোন বন্ধুদের সহিত পরিচয় না থাকায় আমি উপস্থিত সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলাম। মিঃ মিত্র নিরভিমান ও অত্যন্ত সদালাপী লোক ছিলেন। তিনি মিঃ চাটার্জ্জির সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সপরিবারে তাঁহারই বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

এই নবাগত অতিথিদের উপলক্ষ করিয়া মিঃ চাটার্জ্জির বাড়ীতে সেই রাত্রে একটি ভোজের আয়োজন হইল। সন্ধ্যার পর এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, ঝড় বৃষ্টি থামিলে বন্ধুবান্ধবরা একে একে সকলে আসিয়া সান্ধ্য-মজলিসে যোগদান করিলেন। মিঃ সরকারের বন্ধুবান্ধবগণকে আপ্যায়িত করিয়া উচ্চ স্তরের হাস্যরস পরিবেষণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তাঁহার গল্প শেষ হইবার পর রাত্রির অন্ধকারে ঝিঁঝিঁর ডাক, ব্যাঙের কলরব ও বৃষ্টির টুপুর-টাপুর শব্দের মধ্যে সুরশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ঠে কয়েকটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। ভাবুক শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক গানটি শ্রোতাদের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল।

সঙ্গীতপ্রিয় মিঃ মিত্র শরৎচন্দ্রের গানে যারপর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রেঙ্গুনের বাটীতে যাইবার জন্য

নিমন্ত্রণ করিলেন। এই গান উপলক্ষ করিয়া পেগুতেই উভয়ের বন্ধুত্ব হয়। পরে মিঃ মিত্র শরৎচন্দ্রকে বেকার জানিয়া তাঁহার নিজের অপিসে একটি অস্থায়ী চাকরী করিয়া দেন।

শরৎচন্দ্র পেগুতে মিঃ চাটার্জ্জির বাড়ীতে অবস্থান-কালে পেগু একজিকিউটীভ্ ইঞ্জিনিয়ার অপিসে অস্থায়ী-ভাবে দুই তিন মাস চাকরী করেন। এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে রেঙ্গুনে যাতায়াত করিতেন। একটা উদাস-ভাব চিরদিনই তাঁহার সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। একবার রেঙ্গুনে আসিবার সময় ষ্টেশনে পাশাপাশি দুইখানি ট্রেন দেখিয়া তিনি ভুলক্রমে বিপরীতগামী ট্রেনখানিতে উঠিয়া পড়েন। তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে দেখেন এটি নেওলবিন ষ্টেশন। অনেক রাত্রে আবার পেগুতেই ফিরিয়া আসিলেন। সে রাত্রের দুর্ভোগের কথা শুনিয়া সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি বলিলেন—"একটি বইয়ের প্লট তৈরী করতে এই ফ্যাসাদ ঘটেছে।" এই সময়ে শরৎচন্দ্র হোয়াইট্ এওয়ে লেড্‌ল কোম্পানীর সেলে ৩৸৶০ আনায় একটি রিষ্ট ওয়াচ কিনিয়াছিলেন, দুইবার মেরামতের পর তৃতীয় বার খারাপ হইলে তিনি এক গ্লাস কেরোসিন তেলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে উহা পুনরায় ঠিক হইয়া যায়। সেই অবধি কাহারও ঘড়ির রোগ হইলে তিনি এই ঔষধটির ব্যবস্থা দিতেন।

পেগুর মধ্যে মিঃ প্যাখাম ভাল শিকারী ছিলেন। ইনি জাতিতে মাদ্রাজী খৃষ্টান, পেগু আদালতে দোভাষীর কার্য্য করিতেন। মিঃ প্যাখাম খুব সদালাপী ও হাস্যরসিক ছিলেন, কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে হাসিতে হাসিতে দম আট্‌কাইয়া যাইত। আমি শরৎচন্দ্রকে আমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে মধ্যে শিকার করিতে যাইতেন।

একদিন পেগু মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী মিঃ রেন্‌কাউণ্টার, মিঃ প্যাখাম, মিঃ চাটার্জ্জি, শরৎচন্দ্র, আমি ও আরও কয়েকজন বন্ধু একত্র মিলিয়া দূরে শিকার করিতে যাইব স্থির করিয়া বাটীর বাহির হইলাম। পথিমধ্যে কে কোন দিকে যাইবে এই লইয়া গণ্ড-গোলের সৃষ্টি হইল। বহু তর্ক বিতর্কের পর দুই দল বিভিন্ন দিকে যাওয়া স্থির করিলেন। শরৎচন্দ্র শিকারে বাহির হইবার পুর্ব্ব হইতেই খুব আস্ফালন করিতেছিলেন, না জানি আজ তিনি কয়টা বাঘ মারিয়া আনিবেন।

মিঃ প্যাখাম শরৎচন্দ্রকে আপনার দলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"I will take Mr. Chatterjee along with me, he is a good company for wit and humour. We are not going to-wards the jungle for deer shooting, we are going to the village for dear shooting."

মিঃ প্যাখামের একটু হুইস্কি টানিবার অভ্যাস ছিল, দৈবক্রমে মাত্রা একটু বেশী হইয়া গেলে মুদ্রাদোষ দেখা দিত, তখন দুঃখ করিয়া বলিতেন—"I wish I was a Hindoo, my fore-fathers were Hindoos. My name is not Pakham but Bhaggam." আমার হিন্দু হবার বড় সাধ হয়, আমার পূর্ব্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন, আমার হিন্দু নাম ছিল—"ভাগ্যম্", অপভ্রংশ হ'য়ে 'প্যাখাম্' দাঁড়িয়েছে।"

শরৎচন্দ্র একা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দূরে চঞ্চল-নেত্র হরিণ শিশুর নির্ভয় পদচারণ, আর দূরবর্ত্তী সেগুন বনে দলবদ্ধ বিহঙ্গের মধুর কাকলী! এই সমস্ত মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। আমরা হরিণের আশায় কিছুক্ষণ একটি ঝোপের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বন্দুকের 'গুড়ুম' শব্দ শুনিয়া সকলে ছুটিয়া গিয়া আগ্রহের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম শরৎচন্দ্র একটি গোদা চিল শিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আহা বেচারা! জঙ্গলের একটি টেলিগ্রাফ পোষ্টের উপর বসিয়াছিল। ঝোপের মধ্যে বহুক্ষণ বন্দুক হাতে করিয়া জড়ভরতের মত একা বসিয়া থাকা শরৎচন্দ্রের পক্ষে অসহ্য হওয়ায় আকাশে একদল বক উড়িয়া যাইতেছে

দেখিয়া তিনি সেইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে 'মিশ্' করিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই নিরীহ জীবহত্যার দোষটি তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া সকলে লজ্জা দিতে শরৎচন্দ্র চিলটির ডানা ধরিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"দেখ, এর গায়ে কোথাও গুলির চিহ্ন নাই, বন্দুকের ভয়ে বেটার 'হার্ট ফেল' করেছে!"

ফিরিবার পথে দূরে একটি হরিণ শিশু দেখিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে কিছুদূর দৌড়িয়া দেখিলেন যে, সেটি বেমালুম গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, আসিয়া আমাদের বলিলেন—"ওটা হরিণের বাচ্চা নয়, শেয়াল।"

আমরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম! সে সময় শরৎচন্দ্র জানিতেন না যে বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে সারা বর্ম্মা দেশের জন্য একটি শৃগাল সৃষ্টি করেন নাই। রেঙ্গুন সহরের চিড়িয়াখানার মধ্যে আশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তুরূপে একটি শৃগাল অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

পড়ন্ত রৌদ্রে হাঁটাপথে দুক্রোশ রাস্তা চলিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে, সকলেই বিশেষ ক্লান্ত। পল্লীর দিকে একখানি গরুর গাড়ী যাইতেছে দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাহাকে আমাদের গন্তব্য স্থান বলিয়া ভাড়া জিজ্ঞাসা করিলে সে এক টাকা ভাড়া চাহিল, তিনি তাহাকে আট আনা দিতে

রাজী হইয়া আধা বর্ম্মা ও আধা বাঙ্গালা ভাষায় বলিলেন—"ঙ্গামু পেমে, তোয়াবিত তোয়া, মোতোয়াবিত কেইসা মেসিবু, হেঁটে তোয়ামে।"

শরৎচন্দ্রের বর্ম্মা ভাষায় অদ্ভুত বুৎপত্তি দেখিয়া আমরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেঘ ও এক পশলা বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আমরা একটি 'জিয়াতে' (পান্থশালা) আশ্রয় লইলাম। মিঃ প্যাখাম ফ্লাস্কের কর্ক খুলিয়া এক পেগ্ হুইস্কি গলাধকরণ করিয়া বলিলেন—"When the whole Earth is getting wet, How can I keep myself dry?" "সারা দুনিয়াটা যখন ভিজিতে চায় তখন প্রাণটাকে কি শুকনা খট্‌খটে রাখা চলে?"

হুইস্কি পান করিয়া মিঃ প্যাখামের মানসিক অবসাদ কাটিয়া গেল, তিনি সারা রাস্তা স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে নানা রসরঙ্গে কাটাইয়া দিলেন। বাড়ী ফিরিয়া সকলে আজ শরৎচন্দ্রের শিকারে দুর্ভোগ কাহিনীর আলোচনা করিতে লাগিলাম।

এই সময় মিঃ চাটার্জ্জি পেগুতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা চলিয়া যান। তাঁহার ওকালতী কাজ-কর্ম্ম চালাইবার জন্য তিনি মিঃ এম, কে, মিত্রের ভ্রাতা পেগুর বর্ত্তমান উকিল মিঃ নৃপেন্দ্রকুমার মিত্রকে প্রতি-

নিধি রাখিয়া যান। শরৎচন্দ্র প্রায় এক বৎসর কাল এই নৃপেন বাবুর কাছে ছিলেন।

এ সময়ে বর্ম্মায় বাঙ্গালীদের উকিল হইবার বিশেষ সুযোগ ছিল। যে কেহ কলিকাতায় ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এদেশের ভাষা শিখিয়া অ্যাড্ভোকেটসিপ পরীক্ষা দিতে পারিত। আমার অনেক অল্প শিক্ষিত বন্ধু এই সুযোগে বর্ম্মায় ওকালতী পাশ করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র আইনজীবী হইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। নৃপেনবাবু নিজ ব্যয়ে তাঁহার জন্য এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু ব্রহ্মভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। মিঃ এম, কে মিত্রের এক সহোদর ভ্রাতা ধানের ব্যবসা করিবার জন্য পেগুতে আসেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার সহকারিরূপে কিছুদিন কাজ করেন ও নেওলাধনে মিঃ কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে থাকেন। ধানের কাজে শরৎচন্দ্রের মন বসিল না বলিয়া তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসেন।



স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল

পঞ্চম স্তবক

মিঃ গোখেল-দর্শনাভিলাষী শরৎচন্দ্র

খেয়ালী শরৎচন্দ্রের মনে যখন যে খেয়াল চাপিত তখনই সেইটি করিবার বিশেষ আগ্রহ হইত। তিনি সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইলেন যে, মিঃ গোখেল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়া রেঙ্গুনে আসিতেছেন এবং ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, আমি তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছি। তখন মিঃ গোখেলের 'সারভেন্ট্ অফ্ ইণ্ডিয়া' সোসাইটি'র সভ্য হইয়া তাহাতে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় তিনি মিঃ গোখেল কবে আসিবেন, কোথায় থাকিবেন, কতদিন থাকিবেন, এই সকল সন্ধান লইবার জন্য প্রত্যহ আমার নিকট আসিতেন।

রেঙ্গুনের বিভিন্ন সভা-সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ গোখেলকে বিভিন্ন অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে এই সংবাদ পাইয়া মিঃ গোখেল আমাকে নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম-খানি করিয়াছিলেন—

To

G. N. Sirkar

52, Phayre Street, Rangoon.

Many thanks, kindly arrange among yourselves. Please have not more than one function.

Gokhale

13-1-13

শরৎচন্দ্র এই টেলিগ্রামখানি দেখিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের কর্ত্তব্য যে এই সঙ্গে ভারত-হিতৈষী মহানুভব রামসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকেও একখানি অভিনন্দনপত্র দেওয়া।" আমি শরৎচন্দ্রের পরামর্শানুযায়ী কলিকাতায় ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে একখানি টেলিগ্রাম করাতে তিনি উত্তর দিলেন :—

Most grateful but think circumstauces make proposal inadvisable—Ramsay Macdonald.

13. 1. 13.

ইহার পর স্থির হইল যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একত্রে কেবল মিঃ গোখেলকেই অভিনন্দন পত্র দেওয়া

হইবে এবং সমগ্র নগরবাসীর পক্ষ হইতে অন্য একদিন একটি উদ্যান ভোজে কমিশনের সকল সভ্যের সহিত ব্রহ্মদেশের লাটসাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। যথা সময়ে মিঃ গোখেল আসিয়া মিঃ পি, সি, সেনের বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং মিঃ গোখেলের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী মিঃ অমূল্যকুমার বসু এম্‌-এ আমার অতিথি হইলেন। শরৎচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে আমি ও অমূল্যবাবু একদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে লইয়া মিঃ গোখেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিঃ সেনের বাটিতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু লাজুক শরৎচন্দ্র কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়া অমূল্যবাবুর সহিত মিঃ গোখেলের কক্ষে ঢুকিয়া অভিবাদন করিলেন এবং "I have come to see and pay my respect to you." বলিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"বাবা! ও সব লোকের সঙ্গে কি কথা বলা যায়!" অমূল্যবাবু শরৎচন্দ্রের খেয়াল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ভিক্টোরীয়া হলে বিপুল জনতার মধ্যে মিঃ গোখেলকে একটি ব্রহ্ম-দেশীয় কারুকার্য্যক্ষোদিত সুন্দর রৌপ্যাধারে একখানি ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।

বর্ত্তমান মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ টি, এস, রাজন অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। মিঃ

গোখেলকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার ভার আমার উপর ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মিঃ সত্যভূষণ গুপ্ত মধুর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। রেঙ্গুন সহরে সাধারণ সভায় এই সর্ব্বপ্রথম "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত হয়। শরৎচন্দ্রকে কোথাও গান করাইতে হইলে অনেক খোসামোদ করিতে হইত। সে জন্য মিঃ সেনের জামাতা মিঃ গুপ্ত রেঙ্গুনে আসিবার পর হইতে সভা সমিতিতে গান করিবার জন্য আর শরৎচন্দ্রকে ডাকিবার আবশ্যক হইত না। মিঃ গুপ্ত একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত স্বদেশী সঙ্গীতগুলি মিঃ গুপ্তের সুধা কণ্ঠে শুনিতে ভাল বাসিতেন।

মিঃ গোখেল ও কমিশনের অন্যতম সভ্য মিঃ চোবলের সম্মানার্থ আমি আমাদের বেঙ্গল সোসিয়াল ক্লাব গৃহে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করিয়াছিলাম। এই ভোজ সভায় আসিয়া শরৎচন্দ্র এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। নগরবাসীর পক্ষ হইতে যে উদ্যান ভোজে মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড ও লাট সাহেব আসিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও যোগদান করেন নাই।

ষষ্ঠ স্তবক

লাটপ্রাসাদে ও পাগলা গারদে শরৎচন্দ্র

আমি বহু দিবস যাবৎ রেঙ্গুন গবর্ণমেণ্ট হাউসের ও লিউনাটিক এসাইলামের কনট্রাক্টার ছিলাম। শরৎচন্দ্র আমাকে অনেকবার এই দুইটি স্থান দেখাইবার জন্য অনুরোধ করায় আমি বলিয়াছিলাম—"শরৎদা, যখন লাট সাহেব সহরে থাকিবেন না তখন একদিন তোমায় লাট সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে যাব, কিন্তু পাগলা গারদে তোমায় নিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।"

একদিন গবর্ণমেণ্ট হাউসের বড় মালী সেখানকার কিছু ভাল গোলাপ ফুল লইয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া দুঃখ জানাইয়া বলিল যে, তাহার বহুদিনের স্থায়ী চাকরীর জবাব হইবে।

—"কেন, তোমার কি অপরাধ?"

—"কাল আমি যখন বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তখন হঠাৎ এডিকং সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া পিছন দিয়া চলিয়া যাইবার সময় আমি দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে সেলাম করি নাই বলিয়া তিনি পি, ডবলিউ, ডি বড় ইঞ্জিনীয়ারকে আমায় বরখাস্ত করিবার জন্য চিঠি দিয়াছেন।"

শুনিলাম, লোকটির পনের বৎসরের চাকরী। তাহার মাসিক বেতন ৬০৲ টাকা। তাহার অধীনে ৪০ জন মালী আছে। সন্তোষজনকভাবে কাজ করার জন্য তাহার কাছে বড় বড় উপরওয়ালা সাহেবের প্রশংসাপত্র আছে।

লোকটিকে আশ্বাস দিলাম, লাটকুঠিতে পর দিবস সে যেন প্রশংসাপত্রগুলি আমায় দেখায়।

পরদিন সকালে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রবেশ করিলাম। আমার বন্ধু রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি প্রায় ২০ বৎসর এই গবর্ণমেণ্ট হাউসের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার থাকায় লাট প্রাসাদের কনট্রাক্টার হিসাবে আমার সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধি ছিল। লাটকুঠির কেয়ারটেকার, জমীদার, মালী প্রভৃতি সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত।

শরৎচন্দ্র ফটক পার হইয়াই মনের উল্লাসে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে কতক্ষণ ছুটাছুটি করিলেন, কাচ নির্ম্মিত গৃহমধ্যে সযত্নে রক্ষিত পুষ্পলতা গুল্মাদি পরীক্ষা করিলেন, চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান, জলাশয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎচন্দ্র বলিলেন এরূপ উৎকৃষ্ট রাজ ভবন, বহুমূল্য আসবাব পত্র ও সাজ সরঞ্জাম তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। বলরুমে প্রবেশ করিয়া মনের আনন্দে বিলাতী ঢঙ্গে একটু নাচিয়া লইলেন, উপরে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া বলিলেন—"এখন তুমিই ত এখানকার লাট হে! দেখ ভাই, কিছুদিন পূর্ব্বে এক জ্যোতিষী গণনা করে আমায় বলেছে যে, ভবিষ্য জীবনে আমার ধন, মান, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজদ্বারে আমার খুব সম্মান হবে। আজ ত দেখছি তোমার আশীর্ব্বাদে লাটের বিছানায় শোয়া পর্য্যন্ত হয়ে গেল।"

আমি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার জ্যোতিষী আর কি কি বলেছে, শরৎ দা ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আর বলেছে আমার দুটি বিয়ে হ'বে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি প্রজাপতিও আমার গায়ে উড়ে ব'সল না !"

ক্রমে বেলা হইতে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় নীচে ডাইনিং হলে নামিয়া আসিলাম, কেয়ারটেকার কফি, বিস্কুট, রুটি ও কলা খাইতে দিল। এই সময়ে সোনাকর মালী তাহার সার্টিফিকেটগুলি দেখাইয়া শরৎচন্দ্রকে তাহার দুঃখের কথা জানাইল। শরৎচন্দ্র লাট দপ্তরে প্রাইভেট সেক্রেটারীর টেবলে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া তাহাকে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন এবং তাহার সহিত ওই সার্টিফিকেটগুলি সংযুক্ত করিয়া দিয়া দরখাস্ত-খানি খোদ লেডী সাহেবের হাতে দিতে পরামর্শ দিলেন।

লাট-প্রাসাদ হইতে ফিরিবার সময় সোনাকর একটি

সুদৃশ্য গোলাপ ফুলের সুন্দর তোড়া শরৎচন্দ্রকে উপহার দিল। শরৎচন্দ্র বলিলেন—"বাঃ! লোকটা কি সুন্দর ফুলের তোড়া বাঁধতে পারে, এই গুণেই এর লাটের বাড়ীতে চাকরী হ'য়েছে। মালী, এটি কি আমার দরখাস্ত লিখবার বকশিস্?"

মালী—"না বাবু, আপনাকে কি আমি চিনি না?"

—"তুমি আমাকে কি ক'রে চিনলে, বাপু?"

—"যে আপনার গান শুনেছে একবার, সেকি আপনাকে ভুলতে পারে?"

—"তুমি কোথায় আমার গান শুনেছ?"

—"গিরীন বাবুর বাড়ীতে উৎসবের সময় কতবার আপনার গান শুনেছি।"

—"ওঃ! তুমিও দেখছি পরমহংস-ভজার দলের লোক, তোমার ভয় নেই বাপু, চাকরী যাবে না।"

বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের লিখিত ঐ দরখাস্তের ফলেই সোনাকরের চাকরী বজায় ছিল। সে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একদিন শরৎচন্দ্র, রায় সাহেব মুখার্জ্জি ও আমার পরিচিত কয়েকটি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া লাট কুঠির বাগানে ভোজ দিয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে কিছু দূরে ক্যানটনমেণ্ট ষ্টেশনের উপরেই পাগলা-গারদ অবস্থিত। ইহার ভিতর কয়েকটি ওয়ার্ডে আমার কাজ হইতেছিল তাহা দেখিয়া

যাইবার জন্য আসিলাম। প্রথম হইতেই আত্মভোলা শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ঢুকিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম ; কিন্তু শরৎচন্দ্রের পাগলদের দেখিবার বহু দিনের সাধ ছিল বলিয়া কিছুতেই তিনি সঙ্গ ছাড়িলেন না। এই সময় ফটকের বাহিরে রাস্তার উপর সস্ত্রীক জেল সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব মোটর হইতে নামিলেন। শরৎচন্দ্রের হস্তস্থিত ফুলের তোড়াটির দিকে মেম সাহেব সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"A splendid boquet of choicest roses!" ইহা শুনিয়া শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি ফুলের তোড়াটি মেম সাহেবের হস্তে দিতে গিয়া বলিলেন—"You may have it, Madam." মেম সাহেবের মনে লোভ বিস্তর হইয়াছিল, কিন্তু অপরিচিতের নিকট হইতে ইহা লইবেন কিনা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"He is our contractor's man." তখন তিনি শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে তোড়াটি লইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে—জীবলোকে আসিয়া পৌঁছিলাম, সেখানে বিভিন্ন সেলের মধ্যে বিভিন্ন রসের উৎস দেখিলাম! পাগলরা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বদ্ধ দুয়ারে বার বার বৃথা আঘাত করিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিতেছে, কেহ শূন্য হতাশ নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া আছে, কেহ গলায় ফাঁসির গ্রন্থি জড়াইয়া

টানাটানি করিতেছে, কেহ মাটিতে শুইয়া ঠিক যেন লম্বা পাড়ি দিয়া সাঁতার কাটিতেছে।

শরৎচন্দ্র পাগলদের দেখিয়া নিজেও পাগলের মত অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন। একটি পাগল তাঁহাকে মুখভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ করিলে শরৎচন্দ্রও তাহাকে তদ্রূপ মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ করিলেন। অন্য একজন তাঁহাকে দেখিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে থাকিলে শরৎচন্দ্রও ঠিক যন্ত্রচালিত গ্রামোফন রেকর্ডের ন্যায় হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া তাহার সহিত বহুক্ষণ হাসিলেন। একটি হৃষ্টপুষ্ট বিকৃতমস্তিষ্ক লোক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতেছে দেখিয়া শরৎচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ভীষণ চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। অন্তরের দুঃখ ও উদ্বেগ কিছুতেই সামলাইতে না পারিয়া 'ভগবান কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়!' বলিয়া পাগলের মত হাউ হাউ করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া ওয়ার্ডার, দারোয়ান প্রভৃতি তামাসা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুটি কি পাগল?" আমি তাহাদের এই প্রশ্নে বিশেষ লজ্জিত হইয়া বহু চেষ্টার পর শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম।

ফিরিবার পথে ট্রেনে শরৎচন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া

ছিলেন, বেশী কথাবার্ত্তা বলেন নাই, যা দু' একটি কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মিল নাই, ঐক্য নাই, সামঞ্জস্য নাই, ঠিক বিকৃতমস্তিষ্কের ভাব!

এই দিনের ঘটনা আমার স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় তাঁহাকে দেখিলে বুঝিবার উপায় ছিল না। এই ঘটনার পর হইতে রেঙ্গুনে আমি তাঁহাকে 'পাগল' আখ্যা দিয়াছিলাম।

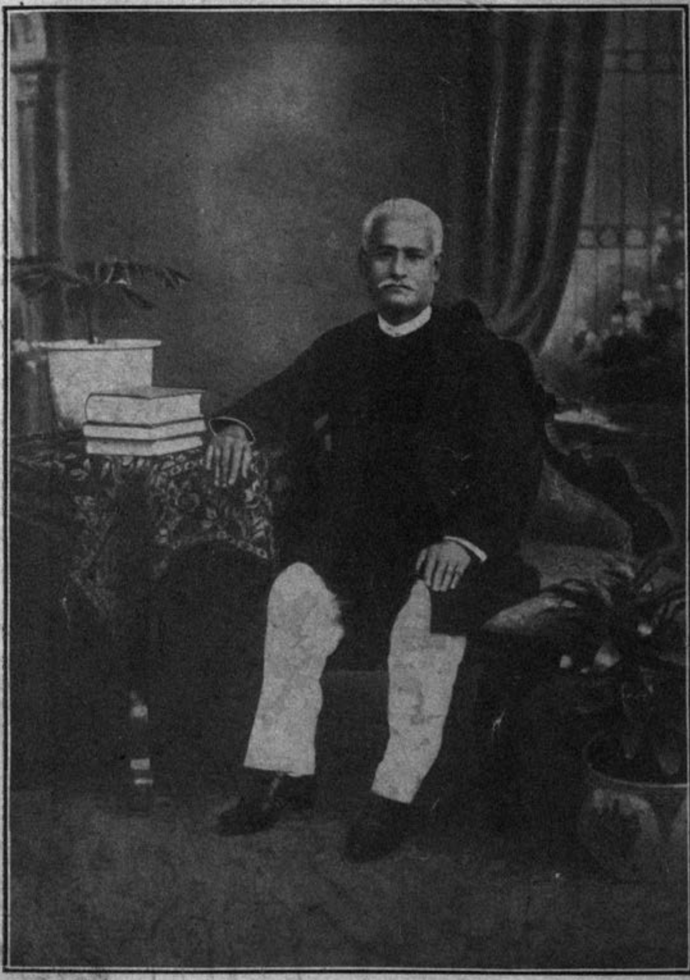
পরে এই 'পাগল' বন্ধুটি কিরূপে সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন ও এত অল্প দিনের মধ্যে প্রভূত সম্মান ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।

সপ্তম স্তবক

ব্যর্থ প্রণয়ী শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের প্রণয় ভাগ্য মোটেই ভাল ছিল না। তাঁহার প্রথম জীবনের প্রণয়ঘটিত নৈরাশ্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার আর একটি ব্যর্থ প্রণয়ের অপূর্ব্ব কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনার মধ্য হইতে।

রেঙ্গুন সহরে বাঙ্গালী সমাজের নেতা ও জননায়ক কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় দানবীর ও অতিথিপরায়ণ মানুষ শুধু ব্রহ্মদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষেও বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় শুধু নিজ পরিবারবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য অর্থব্যয় ও ভবিষ্যৎ সঞ্চয় না করিয়া জীবনব্যাপী সমস্ত উপার্জ্জন মুক্তহস্তে পরোপকারে ব্যয় করিতেন। ব্রহ্মদেশে নবাগত ব্যক্তি-দিগের জন্য তাঁহার বাটির দ্বার সরাইখানার ন্যায় সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। প্রাচীন ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি কুঞ্জবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সংস্পর্শে যিনি



স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

একবার আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন যাপন দেখিয়া ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করিতেন। বহু নিরাশ্রয় লোক তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। তিনি রেঙ্গুন সহরে বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর চাকরীর সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। এই স্বনামধন্য উদারচরিত মহাপুরু-ষের স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীও স্বামীর ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্না নারী ছিলেন। প্রভূত ধন, মান, যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই দয়াবতী রমণীর কোন প্রকার আভিজাত্য ছিল না। একত্রে এত দয়া, মায়া ও স্নেহ মমতা সচরাচর দেখা যায় না। বাল্যকাল হইতে ইঁহাদের সংস্পর্শে আসায় আমি কুঞ্জবাবুর স্ত্রীকে দিদি বলিতাম, তিনিও আমাকে সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন ও প্রতি বৎসর ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সময় ফোঁটা ও নূতন বস্ত্র দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখখানি দেখিলে মনে হইত যেন মূর্ত্তিমতী দয়া। আজীবন আমি তাঁহাকে জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম।

একদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইয়া তাঁহাদের বাটী হইতে ফিরিতেছি, এমন সময় বাটীর সম্মুখে একখানা ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে দুইজন যুবক ও একজন ভদ্রমহিলা অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের জিনিষপত্র

দেখিয়া বুঝিলাম তাঁহারা কলিকাতা হইতে আসিতেছেন এবং এই বাড়িতে অতিথি হইবেন।

কুঞ্জবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, আমি মহিলাটিকে উপরের সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া দিদিকে ডাকিয়া দিলাম। তিনি এই পরমা সুন্দরী যুবতীটিকে সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ ভাবিয়া যথোচিত আদর যত্ন করিলেন। নীচে সাহেব-বেশী সুন্দর যুবক দুইজনের সহিত আলাপ পরিচয় করায় একজন বলিলেন—"আমরা স্বামী-স্ত্রীতে দেশ ভ্রমণে এসেছি, আর আমার এই গ্রাজুয়েট বন্ধুটি চাকরীর অন্বেষণে বাহির হ'য়েছেন।"

চেহারা, চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তায় ইহাকে শিক্ষিত ভদ্র সন্তান বলিয়াই বোধ হইল।

এ বাড়ীর রীতি অনুযায়ী অতিথি যুবকদ্বয় রাত্রে নীচের ঘরে এবং গায়ত্রী উপরে মেয়েদের সঙ্গে শয়ন করিল।

দিদি প্রথম দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে গায়ত্রী খুব শান্ত ও সরল প্রকৃতির মেয়ে। তরুণ যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্যে সে অপরূপ সুন্দরী হইলেও তাহার বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না, প্রায়ই অন্যমনস্কভাবে থাকিত ও সময়ে সময়ে একাকী নিভৃতে বসিয়া কাঁদিত, কার্য্য উপলক্ষে তাহার স্বামী সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে যাইতে অস্বীকার করিত। তাহার পাণ্ডুর মলিন মুখখানি, অসংযত নূতন বেশভূষা, সিঁথিতে নূতন সিন্দুরের

চিহ্ন দিদির চক্ষু কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। নারী হৃদয়ের ব্যথা ও বেদনা, নারী চরিত্রের দুর্ব্বোধ রহস্য নারীরাই ভাল বুঝেন। গায়ত্রীর বিষণ্ণ বদন ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন দেখিয়া বিনা চেষ্টায় দিদি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার জীবন কোন অজ্ঞাত রহস্যজালে জড়িত। গত কয় দিনের দুর্ভাবনায় তাহার সুন্দর মুখখানিতে মালিন্যের ছায়া পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি একদিন গায়ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন—"আমি তোমার মায়ের বয়সী, মার কাছে মেয়ের কোন কিছু গোপন রাখা উচিত নয়, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার মনের কষ্টের কারণ আমাকে বলতে পার।" গায়ত্রীর বুকের ভিতর অসহ্য বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, সে প্রবল অশ্রু বেগ দমন করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং এই আশ্রিত-বৎসলা মহীয়সী গৃহকর্ত্রী ভিন্ন এই আসন্ন বিপদে তাহাকে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই ভাবিয়া তাহার পথিভ্রষ্ট জীবনের মর্ম্মান্তিক দুঃখ কাহিনী অকপটে বলিয়া ফেলিল।

সে সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যে মাতৃহারা; কৈশোর ও যৌবনের মধ্যস্থলে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ সৌভাগ্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই সে স্বামিহীনা হয়। বিধবা অবস্থায় পিতৃগৃহেই সে ছিল। পিতা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া তাহার সমবয়সী বিমাতাকে গৃহে

আনায় তাহার দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। বিমাতা সপত্নী-কন্যাকে সচরাচর যে দৃষ্টিতে দেখে তাহার অদৃষ্টে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিমাতার চক্ষুঃশূল হইয়া নানা নির্য্যাতন ভোগে যখন জীবনভার দুর্ব্বিষহ বোধ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই প্রতিবেশী যুবকের দুর্ভেদ্য কুহকে ভুলিয়া সে বাটির বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঐ হ্যাটকোট পরা গৌরবর্ণ যুবকটি তাহার স্বামী নয়—প্রতিবেশী।

দিদি গায়ত্রীর এই কথাগুলি শুনিয়া বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। বহু নিরাশ্রয় নরনারী তাঁহার বাটিতে আশ্রয় পাইয়াছে, কত শত দুঃখীর বোঝা তিনি ঘাড়ে করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের শত শত পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার তাঁহাদের বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়ীযুগল ও তাহাদের রহস্যময় ঘটনা জীবনে এই প্রথম শুনিলেন। কুঞ্জবাবু একথা শুনিলে কি মনে করিবেন, এই কথা পাঁচজনের কাণাকাণি হইলে সমাজে তাঁহাদের কত অখ্যাতি হইবে, এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি নবাগত অতিথিদের আর একদিনও বাড়ীতে স্থান দেওয়া সমীচীন বিবেচনা করিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জবাবুর ভৃত্য আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, দিদির মুখে এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম।

কুঞ্জবাবুর নিকট অতিথি নারায়ণ। তিনি নিজমুখে কিছু বলিতে পারিবেন না। দিদি ও আমি একত্রে পরামর্শ করিয়া কুঞ্জবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে যুবকদ্বয়কে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম। তাঁহারা মাত্র কয়েক দিন আসিয়াছেন, রেঙ্গুন সহরের কোনদিকে সস্তায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইবে একটু নির্দ্দেশ দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন বলায় আমি সাহেব বেশী যুবকের হস্তে শরৎচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিয়া দিলাম—"শরৎদা, পত্রবাহক ভদ্রলোকটি কুঞ্জ-বাবুর বাড়ীর নবাগত অতিথি, এঁরা স্বামী-স্ত্রী ও একটি বন্ধু, তিনজনে সংকুলান হয় এমন একটি ছোট বাড়ী তোমাদের অঞ্চলে এঁদের ভাড়া করে দিতে পারবে কি? কাল সকালে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো, বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।

ইতি তোমার গিরীন।"

অবলা-অত্যাচারিতা ও পতিতা স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রকৃতই শরৎচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার দুর্ব্বলতা বা জীবনের বৈচিত্র্য ছিল ঐখানে যে তিনি সম্ভবতঃ ঐ সকল নারীজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য বহুদিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

গায়ত্রী-ঘটিত এই ব্যাপারটি শরৎচন্দ্রের গবেষণায় একটি নূতন খোরাক হইবে ভাবিয়া আমি তাঁহাকে আমার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলাম।

শরৎচন্দ্র আসিলে এই ঘটনাটি বলিয়া তাঁহাকে বলিলাম—"শরৎদা, এই কেসটি তদ্বির করতে তোমার চেয়ে বড় কৌঁসুলি রেঙ্গুনে আর কেউ নেই জেনে তোমার হাতে কেসটা দিলাম।"

এই কৌতূহলপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া শরৎচন্দ্রের ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল, তিনি হাসিতে হাসিতে তখনই কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে গিয়া উহাদের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিলেন এবং নিজ পল্লীর সন্নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া উহাতে লইয়া গেলেন। শরৎচন্দ্রের ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মানুষকে চিনিবার অসামান্য ক্ষমতা, তিনি এই যুবকদ্বয়কে দেখিয়াই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন এবং পরিহাসচ্ছলে উভয়ের মিঃ হাজব্যাণ্ড ও মিঃ ফ্রেণ্ড নাম দিলেন। হাজব্যাণ্ড একটি মাকাল ফল, ধনিগৃহের চরিত্র-হীন যুবক, আর ফ্রেণ্ড বেচারী অত্যন্ত নিরীহ, ধর্ম্মভীরু ও সুশিক্ষিত লোক। সে অবস্থা বিপর্য্যয়ে চাকরী অন্বেষণে রেঙ্গুনে আসিতেছিল, জাহাজে হাজব্যাণ্ড তাহাকে সাথী করিয়া লইয়াছে।

দিদির স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসায় গায়ত্রীর এই কয়দিন একরূপ নির্ভয়ে কাটিতেছিল, এখন এখান হইতে চলিয়া

গেলে ঐ দুর্বৃত্তের সহবাসে থাকিতে হইবে এই দুশ্চিন্তায় তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সে সারা রাত্রি ঘুমায় নাই, নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছে, জীবনের এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অপরিণামদর্শিতার জন্য একটি ভুল করিয়া সে লোক দৃষ্টিতে কতদূর ঘৃণিত ও কলঙ্কিত হইয়াছে ভাবিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, দিদির পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—"মা, আপনি অনেকের আশ্রয়দাত্রী, আমাকে একটু আশ্রয় দিন।" দিদির স্নেহপ্রবণ হৃদয়বেগে উছলিয়া চোখে জল বাহির হইল, গায়ত্রীকে কোলে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ মা, তোমায় যদ্যপি কোন ভদ্র পরিবারের সঙ্গে দেশে পাঠিয়ে দি তোমার বাবা নেবেন কি?"

গায়ত্রী বলিল, "আমি নিষ্কলঙ্ক জানলে তিনি হয়ত পায়ে ঠেলবেন না।"

দিদি বলিলেন, "তবে সেই ভাল, তোমার বাপের ঠিকানা দাও, তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর মত কি জানি।"

গায়ত্রী বলিল, "মা, আমার এখন ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীরের অবস্থা! দেশে ফিরলে বাঘিনী সৎমা খেয়ে ফেলবেন আর এখানে দুর্বৃত্তের হাতে সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।"

দিদি বলিলেন, "তুমি কি রেঙ্গুনে ইচ্ছা ক'রে এসেছ ?"

গায়ত্রী বলিল, "না, লক্ষ্ণৌতে আমার মেসো-মহাশয়ের বাড়ী নিয়ে যাবার ছল ক'রে একেবারে জাহাজে তুলেছে। জাহাজেই ওর অসদিচ্ছা বুঝতে পেরেছি, আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে লেডিজ কেবিনে ছিলাম, আর এক'দিন আপনাদের আশ্রয়ে কেটে গিয়েছে, দুষ্ট দুরভিসন্ধি পূরণের সুযোগ পায়নি। আমার বাবার চিঠি আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকতে পারি কি ?"

দিদি বলিলেন, "তোমার প্রতিবেশী যুবকটি তোমাকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের বাড়ীতে উঠেছেন, এখন এ কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হ'লে তিনি যে হীন কলঙ্কের সৃষ্টি ক'রবেন সেটা আমাদের মান সম্ভ্রমের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর, এমন কি সমাজে আমাদের মুখ দেখাবার জো থাকবে না।"

কয়েক দিন অনবরত চিন্তায় গায়ত্রীর শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, তাহাতে এই নৈরাশ্যসূচক কথা শুনিয়া তাহার বিষাদময় জীবনের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইবে চিন্তা করিয়া তাহার বুক ধড়ফড় করিতেছিল, এমন সময় ঠাকুর ঘর হইতে সন্ধ্যাকালীন ধূপ ধুনার গন্ধে তাহার চমক ভাঙ্গিল। গায়ত্রী শৈশবে ধর্ম্মশীলা জননীর পবিত্র ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিল এবং কুলাচার

অনুযায়ী ইতিপূর্ব্বে সদ্‌গুরুর নিকট মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিল। তাহার চিত্তপটে আদ্যা-শক্তির অভয়া মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় সে বিদায়ের পূর্ব্বে একবার ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া মুদিত নেত্রে কিছুক্ষণ মার ধ্যান করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া জানাইল—"মা শরণাগতপালিনী, ভয়ার্ত্তের তুমিই একমাত্র গতি, এই অকূল সমুদ্রে আমায় রক্ষা ক'রো।" মাতৃমূর্ত্তির ধ্যান করিতেই তাহার সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠিল, তাহার স্বতঃই মনে হইল মা আছেন ভয় কি ?

এ সকল কথা আমি দিদির মুখেই শুনিয়াছিলাম। যুবকদিগের বিদায়ের সময় আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।

নীচে দুই বন্ধুতে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গায়ত্রী লাল সাড়ী, সিন্দূর অলঙ্কার প্রভৃতি সধবার ছদ্ম-বেশ পরিত্যাগ করিয়া বিধবার বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া গাড়ীতে বসিল। হাজব্যাণ্ড নবসাজে সজ্জিত গায়ত্রীকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

যাহাকে আশ্রয় দেওয়া যায় তাহাকে নিজ আত্মীয় স্বজনের মত রক্ষা করা উচিত, দিদি ইহা বিশেষরূপে জানিতেন; কিন্তু সমাজে খাটো হইবার ভয়ে তিনি এ অবস্থায় গায়ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে সমবেদনা

জানাইয়া বলিলেন—"কোন ভয় নেই মা, কোন কিছু কষ্ট হ'লে আমায় খবর দিও, মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমায় রক্ষা করবেন।"

তাহাদের গাড়ী সহরের প্রান্ত ভাগে লোয়ার পোজন্‌-ডংএ আসিয়া পৌঁছিল। শরৎচন্দ্র উহাদের নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে নামাইয়া বাসোপযোগী সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এ পল্লীর চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ কুলী-ব্যারাক ও কারিগরদের ঘর। বাঙ্গালী, বার্ম্মিজ, চীনা, মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা দেশীয় কত রকম-বেরকমের ফিটার, ভাইসম্যান প্রভৃতি একত্রে এখানে পাশাপাশি বাস করে। এই বিচিত্র পল্লীটিকে এক কথায়ই Indo Burma Chinese Trading Corporation নাম দিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গলির ভিতর একটি পুরাতন কাঠের বাড়ীতে শরৎচন্দ্র বাস করিতেন। এই পল্লীর বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা বহুকাল হইতে এখানে বাস করে। উহাদের সকলেরই বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলেও এখানে আপোষের মধ্যে বিবাহাদির আদান প্রদান করিয়া সপরিবারে বসবাস করে। চট্টগ্রাম-বাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ এই সকল বিবাহে পৌরোহিত্য করিত। শরৎচন্দ্র এই সকল মিস্ত্রীদের ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিতেন না, অধিকন্তু তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত বলিয়া মিস্ত্রীগৃহিণীরা সকলেই শরৎ-চন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং কেহ দুঃখ কষ্টে পড়িলে বা চরিত্রহীন মদ্যপ স্বামীর হস্তে নির্য্যাতিতা হইলে অকপটে তাঁহার কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইতে লজ্জা-বোধ করিত না। এই সূত্রে দরদী শরৎচন্দ্রের অনেক নির্য্যাতিতা ও পতিতা নারীর করুণ কাহিনী শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানেই শরৎচন্দ্রের প্রবাস-জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। নারী আন্দোলনের ভাবনায়ক এইখানে বসিয়াই বিভিন্ন স্তরের বহু নারী-চরিত্রের দুর্ব্বোধ রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার বহু চমকপ্রদ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে কলের ধোঁয়া সমস্ত আকাশকে দিবারাত্র আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সুবৃহৎ নর্দ্দামার আবর্জ্জনাভরা জলস্রোত হইতে অনবরত ভীষণ দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই পঙ্কিল আবহাওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যেই গায়ত্রীর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সমস্তদিন একটা দারুণ অবসাদ পাথরের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া থাকিত। কোন কিছুতে তাহার মন লাগিত না, যন্ত্রের মত কোনমতে সে রান্নাবান্নার কাজ সারিয়া লইত, কিন্তু পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত তাহার মনটি

কেবলই এই কারাগারের লৌহ শলাকায় মাথা কুটিয়া মরিত।

সালঙ্কারা ও সুবেশে ভূষিতা গায়ত্রীকে হঠাৎ বিধবার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া ফ্রেণ্ড অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, তাহার পর শরৎচন্দ্রের মুখে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া হাজব্যাণ্ডের প্রতি তাহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাহার মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে এক্ষণে গায়ত্রীকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গায়ত্রী এই নির্ভীক তেজস্বী যুবককে ভগবানপ্রেরিত রক্ষক ভাবিয়া যথেষ্ট সম্মান করিত। ফ্রেণ্ডও গায়ত্রীর গুণমুগ্ধ হইয়া এই একান্ত নির্ভরশীলা রমণীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিত না। ইহাদের কাঠের বাড়ীতে মাত্র দুইখানি ঘর ও একটি ছোট রান্নাঘর ছিল, অতিকষ্টে তিন জনের স্থান সঙ্কুলান হইত। হাজব্যাণ্ড ও ফ্রেণ্ড উভয়ে একখানি ঘরে শুইত, অপরখানিতে গায়ত্রী দরজা বন্ধ করিয়া থাকিত। হাজব্যাণ্ডের মনে কলুষ-কামনার বহ্নি সর্ব্বদাই জ্বলিত। সে নীচ দুরভিসন্ধি পূরণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু গায়ত্রীকে সর্ব্বদা বিমর্ষ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিত না। সুযোগ বুঝিয়া যখনই গায়ত্রীর সম্মুখীন হইত অমনই কোথা হইতে একটা দুর্ব্বলতা ও

ভীরুতা আসিয়া তাহাকে নিরস্ত করিত। গায়ত্রী হাজ-ব্যাণ্ডের সান্নিধ্য একটি কঠিন শাস্তি বলিয়া মনে করিত। এই নরপিশাচ দুর্ব্বার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কখন কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ভাবিয়া যখনই সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িত, তখনই কাতর কণ্ঠে মাকে ডাকিত।

একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর হাজব্যাণ্ড ও ফ্রেণ্ড বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় শরৎচন্দ্র আসিয়া ফ্রেণ্ডকে তাঁহার বাসায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফ্রেণ্ড ফিরিয়া আসিয়া সোৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, দরজা অর্গলবদ্ধ, ভিতর হইতে ভীষণ কলহের শব্দ শোনা যাইতেছে, দুশ্চরিত্র হাজব্যাণ্ড গায়ত্রীকে নির্জ্জনে একা পাইয়া তাহাকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করিবার ভয় দেখাইতেছে। গায়ত্রীও হীন কলঙ্কিত জীবন যাপন অপেক্ষা এখনই আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিবে বলিয়া নির্ভীকভাবে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ব্যাপারটি ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইতেছে বুঝিয়া ফ্রেণ্ড ছুটিয়া শরৎচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল। শরৎচন্দ্র আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে চাহিলে, হাজব্যাণ্ড উত্তেজনার বশে তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মারিতে উদ্যত হইল। শরৎচন্দ্র সেই রাত্রে একখানি গাড়ী করিয়া আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে তাঁহার অপমানের

প্রতিশোধ লইতে ও দুর্বৃত্ত হাজব্যাণ্ডের হাত হইতে অসহায়া গায়ত্রীকে উদ্ধার করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। দুষ্টের দমন ও বন্ধুর সাহায্য করা অবশ্য-কর্ত্তব্য জানি, কিন্তু এ সমস্ত কাজে সাহস অপেক্ষা গায়ের জোর ও বুদ্ধিরই বেশী দরকার। কি উপায়ে পাষণ্ড-দলন কার্য্যে অগ্রসর হইব ভাবিতেছি, হঠাৎ আমার অফিস টেবলের উপর একখানি ডাকের চিঠি পড়িয়া আছে দেখিলাম। চিঠিখানির শিরোনামায়—"শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়ার অফ মিষ্টার কে, বি, ব্যানার্জ্জি, য়্যাড্‌ভোকেট রেঙ্গুন" লেখা আছে। বুঝিলাম হাজব্যাণ্ড ওরফে আমাদের নন্দদুলালের এই পত্রখানি ডাকে কুঞ্জবাবুর অফিসে আসিয়াছিল, তিনিই ঐ খানি আমার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। দৈব কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে চিঠিখানি পাইয়া শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠিখানি নন্দদুলালের মা ভবানীপুর হইতে লিখিয়াছেন। লেখা আছে ঃ—"বাবা দুলাল, তুমি নিরাপদে রেঙ্গুনে পৌঁছেছ শুনে আনন্দ হ'ল। তুমি কবে আসবে? তুমি যেদিন ভোরবেলায় রওনা হ'য়েছ, সেই রাত্রি থেকেই আমাদের প্রতিবেশী নবীন মুখুয্যের বিধবা মেয়ে গায়ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার বুড়ী পিসী শোকে অধীর হ'য়ে পড়েছে। আমার বড় ভয় হ'য়েছে পাছে তোমার নামে কিছু বদনাম রটে।

তোমার আর বেশী দিন একেলা বিদেশে থেকে কাজ নেই, পত্র পাঠ চলে এ'স।

ইতি তোমার দুঃখিনী মা।”

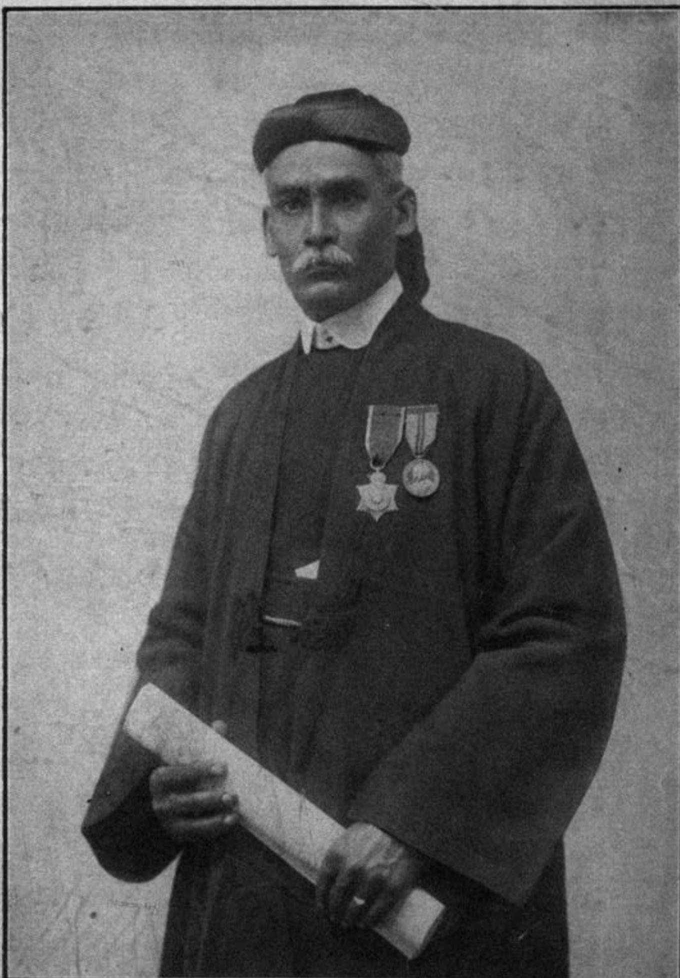
হাজব্যাণ্ডের কীর্ত্তি আমাদের জানাই ছিল, এক্ষণে এই পত্রখানিতে সমস্তই স্পষ্ট হইয়া গেল। একা শরৎচন্দ্রের সহিত যাইব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় নিরুপায়ের উপায় ভগবান, নিরাশ্রয়া গায়ত্রীকে রক্ষা করিবার এক সহজ উপায় করিয়া দিলেন। রেঙ্গুন সেবক ও সংকার সমিতির কোন কার্য্যোপলক্ষে আমার বিশিষ্ট বন্ধু রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হাজব্যাণ্ড-গায়ত্রী ঘটিত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়া সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সাহসী ও শক্তিশালী বন্ধুটি ও আমার একটি বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী দরওয়ানকে সঙ্গে লইয়া আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে শরৎপল্লীর দিকে যাত্রা করিলাম। শরৎ-চন্দ্রের মুখে পূর্ব্বে যে পল্লীর বহু বিচিত্র গল্প শুনিয়া-ছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সভয়ে তাহার মধ্যে অগ্রসর হইলাম। সহসা সম্মুখে অশনিপাত হইলে যেমন বিস্ময়ে জড়ীভূত হয়, শরৎচন্দ্রকে এতরাত্রে লোকজন সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া হাজব্যাণ্ড সেরূপ চমকিয়া উঠিল এবং নিবারণ বাবুর বলিষ্ঠ গঠন ও

রুদ্র মুখ দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তখন শরৎচন্দ্র বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"এই নাও, বাবা নন্দতুলাল, তোমার মায়ের চিঠি। বুড় নবীন মুখুর্য্যের সর্ব্বনাশ করে তার বিধবা মেয়েটিকে বের করে এ'নেছ! এখন হাতে কয়েদীর বালা আর গলায় জুতার মালা পরিয়ে তবে তোমায় ছাড়ব। কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে উঠেছিলে এত বড় আস্পর্দ্ধা।"

হাজব্যাণ্ড প্রথমে চিঠির কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতভম্ভ হইয়া গেল, থতমত খাইয়া কোন জবাব দিতে পারিল না; কতকক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া শরৎচন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া আরক্তমুখে কর্কশকণ্ঠে কহিল—"Who the devil you are to interfere in my affair?"

শরৎচন্দ্রের শরীরে বল বেশী না থাকিলেও কণ্ঠে বিলক্ষণ জোর ছিল। তিনি দম্ভের সহিত বলিলেন—"We have come to teach you a lesson, Damn Scoundrel!"

বারুদে অগ্নিসংযোগের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রগতিতে দাম্ভিক হাজব্যাণ্ড প্রচণ্ড বেগে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুখে ২।৩টি ঘুসী লাগাইয়া দিতেই নিবারণ বাবু ক্রোধকম্পিত স্বরে, "বটে এতদূর স্পর্দ্ধা? পাজী বদ্‌মাইস্! আজ তোকে খুন করে ফেলব" বলিয়া



রায়সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুহূর্ত্তের প্রবল উত্তেজনায় এমন জোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন যে, সে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ গোঙাইবার পর তাহার গলার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, চক্ষু বাহির হইয়া আসিল, সে সংজ্ঞাহীন অবশ হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীর নিস্তব্ধ ও মুখ মড়ার মত ফ্যাঁকাসে দেখিয়া শরৎচন্দ্র ভয়ে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। এই সময় অকস্মাৎ 'কি সর্ব্বনাশ!' বলিয়া চীৎকার করিয়া গায়ত্রী পাগলের মত ছুটিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল—তাহার বস্ত্র অসংযত, মাথার চুল উচ্ছৃঙ্খল, চোখে মুখে ভীতির রেখা পরিস্ফুট, সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল বলিয়া সে দরজার কপাট ধরিয়া কোন মতে নিজেকে একটু সামলাইয়া প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"মা, তোমার কোন ভয় নেই, আমরা নরপিশাচ হতভাগা পাষণ্ডকে যথেষ্ট সাজা দিয়েছি; ও মরবে না, ঠিক বেঁচে উঠবে, যদি মরে যায়, সে দায়িত্ব আমরা ঘাড়ে নেব, যদি বেঁচে উঠে, কালকের জাহাজেই ওকে চালান দেব। আমার দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে শীঘ্রই তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রব, কোন ভয় নেই মা, তুমি ঘরের ভিতর যাও"। আমার জীবনে এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য এই প্রথম। অসহায়া

বিধবাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এরূপ খুনোখুনি ব্যাপার সংঘটিত হইবে স্বপ্নের অগোচর। এই রোমান্টিক, জঘন্য, গুরুতর ব্যাপারে কাহাকেও যে ডাকিব তাহার উপায় ছিল না। এ সব কথা কাহারও জানিবার নহে, কাহাকেও জানাইবার নহে। ডাক্তার পাওয়া গেল না, এত গভীর রাত্রে সহরের শেষ প্রান্তে জঘন্য পল্লীতে কোন ডাক্তার আসিতেও চাহিল না।

আমি একটু ফার্ষ্ট এড্ চিকিৎসা জানিতাম। তাহারই সাহায্যে মাথায় বরফ দিতে ও নাকে স্মেলিং সল্ট ধরিতে অনেক কষ্টে ভোর রাত্রে হাজব্যাণ্ডের সংজ্ঞা হইল। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে উদ্‌ভ্রান্ত নেত্রে সে একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। আমরা সকলে সারারাত্র তাহার সেবা করিতেছি, মুখে কিছু বলিতে পারিল না, তাহার বুকের ভিতরটা রাগে, অপমানে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় অপমান ও লাঞ্ছনা সে জীবনে সহ্য করে নাই। যৌবনের অদম্য আবেগে সে একটি গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার অভীষ্ট পূরণ না হইতেই পরিণাম যে এত শোচনীয় দাঁড়াইবে সে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

সকালে বিছানায় উঠিয়া বসিলে শরৎচন্দ্র যত্নের সহিত হাজ্‌ব্যাণ্ডকে চা রুটি খাইতে দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— "আজ এখনই দু তিন ঘণ্টা পরে কলকাতার জাহাজ

ছাড়বে, সেই জাহাজে তোমাকে যেতে হ'বে, আমরা গিয়ে তুলে দেব। তোমার কুকীর্ত্তি কুঞ্জবাবু শুনেছেন, গায়ত্রীর বাপের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান হ'য়েছে, উত্তর এলেই তোমার হাতে হাতকড়ি পড়বে।"

নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হাজ্‌ব্যাণ্ড এই সংবাদে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটা অবসন্ন বিমূঢ়তায় তাহার গলার স্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"যাবার আগে একবার গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রতে দেবেন কি?" নিবারণবাবু বলিলেন—"তুমি শুধু পাপিষ্ঠ নও, অতি নির্লজ্জ! এখনও গায়ত্রীর কথা? ফের গায়ত্রীর নাম মুখে আনলে —কঠিন শাস্তি পাবে। যদি ভাল চাও শীঘ্র নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও, জাহাজ ছাড়বার সময় হ'য়ে এল।"

সারারাত্র অনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, এ নাটকের এ অঙ্কের অভিনয় যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল, ইহা বিবেচনা করিয়া শরৎচন্দ্র দরওয়ানের সাহায্যে হাজব্যাণ্ডের বিছানাপত্র বাঁধিয়া একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন। ফ্রেণ্ড, নিবারণবাবু, আমি ও শরৎচন্দ্র সকলেই তাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য যাত্রা করিলাম, গায়ত্রী একাকিনী গৃহে রহিল।

অপমান-ক্ষুব্ধ হাজ্‌ব্যাণ্ড ক্ষুণ্নমনে ফাঁসী কাষ্ঠের

আসামীর ন্যায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে আমাদের অনুসরণ করিল।

শিকার হাত ছাড়া হওয়ার নৈরাশ্য, দুঃখ ও অপমানে এক রাত্রেই হাজ্‌ব্যাণ্ডের চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখখানি শুষ্ক ও মলিন হইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাহার আক্রোশের অবধি ছিলনা, তাহার এই প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে বিষম প্রতিবন্ধক —শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তাহার বাড়া ভাতে ছাই দিয়াছে, গায়ত্রীকে সমুদ্র পারে আনিয়াও তাহার অভীষ্ট পূরণ হইল না, এজন্য দায়ী নিষ্ঠুর শরৎচন্দ্র!

জাহাজে উঠিবার সময় সে স্বাভাবিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রকে শাসাইয়া বলিল—"যদি কলকাতায় কখনও তোমাকে পাই, দেখে নেব।"

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। নর-পশুর হস্ত হইতে গায়ত্রীকে উদ্ধার করিয়া শরৎচন্দ্র আনন্দের আতিশয্যে আমাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

এখন ভীষণ সমস্যার বিষয়, গায়ত্রীর উপায় কি হইবে, সে থাকিবে কোথায়? তাহার মত নিরাশ্রয়া অভাগিনীকে এই বিদেশে কে রক্ষা করিবে? ফ্রেণ্ড তাহার অপরিণামদর্শী পথিক বন্ধুটির শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও আশ্চর্য্য হইয়াছিল। গায়ত্রীকে প্রলুব্ধ করিয়া হাজ্‌ব্যাণ্ড কি কুকার্য্য করিয়াছিল এবং পরিণামে নিজেও

কিরূপ নির্য্যাতিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহা সে প্রত্যক্ষ করিল এবং নিজের নিঃসম্বল দরিদ্র অবস্থার কথা ভাবিয়া সে গায়ত্রীর ভার লইতে অস্বীকার করিল। আমি তাহাকে যতদূর পারি সাহায্য করিব এবং দিদির সাহায্যে যত শীঘ্র পারি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সে তখনকার মত গায়ত্রীর তত্ত্বাবধান করিতে স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু লোক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হইবার ভয়ে গায়ত্রীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে সাহসে কুলাইবে না জানাইল।

শরৎচন্দ্র তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "আমি কাছেই থাকি, আর এই পল্লীতে অনেক নিরীহ লোক সপরিবারে বাস করে, আমরা দেখাশুনা ক'রব।"

ফ্রেণ্ড বলিল—"পুরুষ ও নারী উভয়েরই যখন প্রকৃতি-গত চিত্ত-দৌর্ব্বল্য আছে, তখন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে একত্র বাস করা কিছুতেই নিরাপদ নয়।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"প্রলোভনের বস্তু কাছে না থাকলে নিবৃত্তি আপনি আসে, কিন্তু থাকলে যার চিত্ত-বিভ্রম না হয় সেই বীর। পাপের কাছ থেকে পালাব কেন? পাপের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা থাকা চাই।"

—"বীরত্ব আমার মাথায় থাকুক, শরৎবাবু! কুহকের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল স্বইচ্ছায় পায়ে জড়িয়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলবার

শক্তি খুব কম লোকের থাকে। পুরুষকে আমি ইন্ধন আর নারীকে অগ্নিশিখা মনে করি, কাঠ আর আগুন এক সঙ্গে রাখিলে কাঠের পরিণাম ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।”

—“বেশ, আপনাকে তাহ’লে ভস্ম হ’তে দেব না। আমি রোজ রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর আপনার কাছে শোব।”

ফ্রেণ্ড এই প্রস্তাবে আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু সে আমাকে বলিল—“এ পথ বড়ই পিচ্ছিল, পতনের সম্ভাবনা পদে পদে।” শরৎচন্দ্র ও রায়সাহেব যে যাঁহার বাসায় চলিয়া গেলেন। ফ্রেণ্ড আমাকে ছাড়িল না, উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছাইতেই রোরুদ্যমানা ক্ষীণ নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অদৃষ্টের দারুণ পরিহাসে ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় গায়ত্রী সারা রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টে কি আছে সেই চিন্তায় অস্থির।

ফ্রেণ্ড আমাকে বলিল, “যখন এদিকে এ’সেছেন তখন গায়ত্রীকে একবার দেখে যাওয়া উচিত।”

ফ্রেণ্ডের ডাকে গায়ত্রীর চমক ভাঙ্গিল, ‘গিরীনবাবু এসেছেন’ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি কি বলিব তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছিল।

তাহার অসহায় অবস্থা ও অপরিসীম দুঃখের কথা ভাবিয়া আমি কহিলাম—"মা, ভগবানের কৃপায় আপদ বিদায় ক'রে এ'সেছি, উপস্থিত আর কোন ভয় নেই। তোমাদের সঙ্গী এই পাঁচকড়িবাবুকে আমরা ফ্রেণ্ড বলে ডাকি, ইনি অতি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক, ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝ্তে পেরেছি উনি একজন সচ্চরিত্র যুবক, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, ওঁর মন বড় পবিত্র। ওঁর আশ্রয়ে মা ও ছেলের মত তোমাকে এখন কিছুদিন থাকতে হবে। শরৎবাবু ব'লে আমার আর একটি বন্ধু রাত্রে এ'সে ওঁর সঙ্গে শোবেন। তিনিও শিক্ষিত পরোপকারী ভদ্র সন্তান, তোমাদেরই প্রতিবাসী। মা জগদম্বাকে খুব ডাক তিনি নিশ্চয়ই সদয় হবেন।"

আমার মাতৃসম্বোধনের সুরের আন্তরিকতায় গায়ত্রীর অনেকটা লজ্জা কাটিয়া গিয়াছিল, সে কম্পিতকণ্ঠে দরজার পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার বাবার কোন চিঠি পত্র এ'সেছে কি ?"

আমি বলিলাম—"না মা, এখনও তাঁহার চিঠিপত্র আসে নাই। তোমার মেশোমহাশয়ের ঠিকানাটি আমাকে লিখে দাও, আমি লক্ষ্ণৌতে তাঁকে লিখ্‌ব।"

তাহার পর সময়োপযোগী দু' একটি উপদেশ দিয়া ও গায়ত্রীর মেশোমহাশয়ের ঠিকানাটি লইয়া কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে আসিলাম। দিদি গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা

শুনিলেন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ গায়ত্রীর দুঃখ স্মরণ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! আহা, বেচারীর কপালে এতও ছিল।"

দুঃখে, কষ্টে, ক্ষোভে, পাছে গায়ত্রী রান্না করিতে না পারে ইহা ভাবিয়া তিনি পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারা দু'জনের খাবার পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে যে নাপিতানী আল্‌তা পরায় তাহাকে প্রত্যহ রাত্রে গিয়া গায়ত্রীর কাছে শুইতে বলিয়া দিলেন। এই নাপিতানীর দ্বারা তিনি গায়ত্রীর সংবাদ লইতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভাল আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন।

দিদি গৃহকার্য্যে গৃহিণী, অতিথি সৎকারে অন্নপূর্ণা-রূপিণী ও দয়া দাক্ষিণ্যে দেবীস্বরূপিনী ছিলেন। নারী হৃদয়ের ব্যথা ও বেদনা কোথায় তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন।

হাজব্যাণ্ডের এই শোচনীয় পরিণামে গায়ত্রী আন্তরিক দুঃখিত নহে বরং এই নীচাশয় পাপাত্মার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিতেছে।

ইহার পূর্ব্বে কখন গায়ত্রী বাটীর বাহির হয় নাই। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্র বাস করা যে কি কষ্টকর তাহা কল্পনাতীত! গায়ত্রী একা থাকে বলিয়া মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়। একা একা দুঃখশোক সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। কাহাকেও

বলিতে পারিলে বা সহানুভূতি করিবার লোক পাইলে কষ্টের অনেক লাঘব হয়।

মানুষ, স্ত্রীলোকই হউক, আর পুরুষই হউক, যখন অপ্রিয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখে, তখন নিরুপায় হইয়া সে অনিবার্য্যকে আপনা হইতেই বরণ করিয়া লয়, বিশেষতঃ নারীদের একটি বিশেষ শক্তি দিয়া ভগবান এই সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহারা খুব সহজেই নিজের নূতন অবস্থার মত করিয়া নিজেকে তৈয়ার করিয়া তুলিতে পারে।

ইতিমধ্যে গায়ত্রী একটি ক্ষুদ্র গৃহস্থালী কাঁদিয়া নিজেকে গৃহকর্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পাকা গৃহিণী না হইলেও সে ভাত রাঁধা, কুটনা কোটা, বাটনা বাটা, ঘর ধোয়া, ঠাকুর দেবতার পূজা প্রভৃতি সকল গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিত। ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। গায়ত্রী শাস্ত্রোক্ত পূজাবিধি জানিত না, সে মানস-পূজা বা ভাব-পূজা করিত। শিশুর মত সরল প্রাণে মাকে ডাকিত। কোন কোন দিন ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে 'মা' মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আসনের উপর শুইয়া পড়িত, কে বলিবে প্রাক্তনের বলে পূর্ব্বজন্মের সাধনার ফলে গায়ত্রী শক্তি সাধনায় সিদ্ধ ছিল কি না?

ফ্রেণ্ড এই সংজ্ঞাবিহীনা অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ীকে

তাহার উপাস্য দেবী মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ মনে করিয়া, মা বলিয়া সম্বোধন করিত এবং মনে, প্রাণে, চিন্তায় তাহাকে জাগ্রত দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। মা শব্দ বড় মধুর শব্দ! মা-নামে অদম্য রিপু শিথিল হয়, প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠে, নয়নে আনন্দাশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়। ফ্রেণ্ড মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে, সেজন্য সে আত্মজয়ী হইতে পারিয়াছে, তাহার মনে কোন বিকার নাই, মন পবিত্র। এই পবিত্রতাই প্রকৃত আনন্দ ও মানসিক তেজ। এই পবিত্রতার দ্বারা সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় করা যায়, এই পবিত্রতাবলেই গায়ত্রী ও ফ্রেণ্ডের মধ্যে মা ও ছেলে সম্পর্ক দৃঢ় হইয়াছিল।

ঘটনাচক্রে গৃহের বাহির হইয়াও গায়ত্রী তাহার দুর্লভ সতীত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহার হৃদয়ের এখনও পবিত্রতা ও মর্য্যাদা নষ্ট হয় নাই, ইহা জানিয়া শরৎচন্দ্র তাহার অজস্র প্রশংসা করিলেন—এবং গায়ত্রীর জীবনটি যাহাতে একেবারে ব্যর্থ না হইয়া সে সমাজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া একটু স্থান পায় সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"আহা, বেচারীর পৃথিবীতে কোন আশ্রয় নেই, ওকে নিয়ে তুমি কি করবে ভাবছ, গিরীন।"

আমি বলিলাম—"এই পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ওর জন্য ভাবতে ভাবতে রাত্রে আমার ঘুম হয় না, শরৎদা;

কি করি বল দেখি ? ওর বাপ ও মেসোকে চিঠি লিখেছি, কোন জবাব নেই। এরূপ বিধবা, সধবা বা কুমারী যাঁরা নিগৃহীতা হন তাঁদের আত্মীয়-স্বজন যদি তাঁদের গ্রহণ না করেন, তাহ'লে তাঁদের গতি কি হবে ভাব দেখি ! তাঁদের সুশিক্ষা বা সদুপায়ে বেঁচে থাকবার জন্য দেশে কোন সুপরিচালিত আশ্রমও নাই।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "মুসলমান বা খৃষ্টান সমাজে তাদের অনেক উপায় আছে, কিন্তু তোমাদের ভদ্র হিন্দু সমাজে এদের স্থান নেই, কাজেই এই সব নিগৃহীতারা অসহায় অবস্থায় নরপশুদের প্রলোভনে পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হ'য়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সকল ঘোর সামাজিক অমঙ্গলের গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি কর না। তোমাদের বিজ্ঞ সমাজ এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। এ প্রহসনের পিছনে যে মর্ম্মবেদনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে র'য়েছে তা বুঝবার মত প্রাণ তোমার হৃদয়হীন সমাজের নাই। এই সমাজের অত্যাচারে যারা হীনতার পঙ্কে ডুবতে বাধ্য হ'য়েছে এমন কত পতিতা এই বর্ম্মা-মুল্লুকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দুঃখ, নৈরাশ্য ও বেদনার করুণ কাহিনী আমি অনেক জানি, যা শুনলে তোমার রক্ত জল হ'য়ে যাবে। আমার মতে পতিতাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। তারা সংসারে না থাকলে পুরুষ লম্পটদের জন্য আমাদের সতী স্ত্রীলোকদের সতীত্ব রাখা দায় হ'ত। স্ত্রীলোকের

যত অখ্যাতি ও দোষ আমরা জানি ততখানি অখ্যাতির যোগ্য তারা নয়। নিজেদের দুঃখের কথা তারা সমস্ত প্রকাশ ক'রতে পারে না, পারলেও তা সবাই বোঝে না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংযম ঢের কম। পুরুষই রূপের মোহে একদণ্ডে উন্মত্ত হয়ে উঠে। তারাই হীনচরিত্র, পাষণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীন বিশ্বাসঘাতক! দেখ দেখি হাজব্যাণ্ড ব্যাটা বিমাতার অত্যাচারে জর্জ্জরিতা গায়ত্রীকে মাসীর বাড়ী নিয়ে যাবার ছলে কোথায় এনে কি অবস্থায় ফেলে চলে গেল! পুরুষের ফাঁকি দেবার অনেক রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও নিষ্কৃতি নাই নারীদের।"

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া চলিলেন, "তোমাদের স্বার্থপর সমাজের মাপ-কাঠিতে গায়ত্রী এখন পতিতা, আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে স্থান দিবে না, বাড়ী ফিরলে সমাজ তাকে চোখ রাঙাবে, ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য দলভুক্ত করে কঠোর শাস্তি দেবে। এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের একটি সামান্য ভুলের জন্য, আহা! বেচারীর কি লাঞ্ছনা! সে কি সহজে বাপ মা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে মাসীর বাড়ী আশ্রয় নেবার সঙ্কল্প করেছিল? কত মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের বিষম তাড়নায় জর্জ্জরিত হ'য়ে তবে সে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছিল। এই উৎপীড়িতা ব্রাহ্মণ কন্যার চোখের জলের হিসাব তোমার সমাজ নেবে কি? তোমাদের দুর্ব্বল সমাজ

কতকগুলি প্রাচীন সংস্কার মজ্জাগত করে নিয়ে কুম্ভকর্ণের মত দীর্ঘ নিদ্রায় বিভোর। তারা কোন তর্ক যুক্তি, আবেদন নিবেদন শুনবে না, কারুর সাধ্য নাই তাদের জাগাতে। সামাজিক সকল দুর্গতির জড় মারতে হ'লে দেশের সমাজ সংস্কার আবশ্যক। কুঞ্জবাবুর মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের উচিত ছিল গায়ত্রীকে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া। তিনি মনে করলে এক কথায় হাজব্যাগুকে জেলে দিতে পারতেন।"

আমি বলিলাম, "কুঞ্জবাবু ত তোমার মত ভবঘুরে নন্; তাঁকে সমাজ মেনে চলতে হয়।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"চুলোয় যাক্ তোমার সমাজ, মগের মুলুকে আবার সমাজ কি? যে সমাজ নির্য্যাতিতা-দের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান বোঝে না সে কিসের সমাজ? তোমার কুঞ্জবাবুই ত এখানকার সমাজ-পতি।"

আমি বলিলাম—"সমাজপতি বলেই তাঁর দায়িত্ব খুব বেশী।"

শরৎচন্দ্রের সমাজ বা লোকলজ্জার ভয় আদৌ ছিল না। সমাজের যাহা নিয়ম, যে রীতি-নীতি, যে পথে সাধারণ লোকে চলে, সে পথে চলিতে তিনি নিতান্ত নারাজ। সাধারণের মতামতের সহিত তাঁহার মতের মিশ খাইত না, হৃদয়হীন দেশাচার বা লোকাচার তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

গায়ত্রীর দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শরৎচন্দ্র একদিন আমাকে বলিলেন—"তোমার দিদিকে বলো তিনি যেন গায়ত্রীকে দেশে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত না হন। এই বাঙ্গালী মেয়ে-জাতটা, যতক্ষণ ঘরে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সহজে এদের সাড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু একবার ঘরের বাহির হ'লে আর রক্ষে নেই, তখন হয়ত এক লাফে একেবারে দুঃসাহসিকতার চরম সীমায় পৌঁছে যাবে। গায়ত্রীর প্রকৃত মনোভাব কি, জানবার জন্য আমি দিন কতক তাকে 'ষ্টাডি' করতে চাই।"

আমি বলিলাম—"তোমার মাথা ক'রতে চাও। কাল কেউটের সম্মুখীন হওয়া বা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কি সহজ কথা? আমার ঘাড় থেকে এ বোঝা নেবে গেলেই বাঁচি। আমি ওর বাপের চিঠির জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছি।"

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একত্র শয়ন করেন এবং ইদানীং উহাদের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন শুনিয়া আমি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এই সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্প্রতি গায়ত্রীকে 'ষ্টাডি' করিতে চায় বলিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহা ভয়াবহ। কত কষ্টে এক পাষণ্ডের হস্ত হইতে গায়ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছি, আবার এই খেয়ালী শরৎচন্দ্র খেয়ালের বশে কখন কি করিয়া ফেলিবে ভাবিয়া

উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। রাত্রে শয়ন করিয়া গভীরভাবে গায়ত্রীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। হাজ্ব্যাণ্ডের বিদায় রাত্রের অপ্রীতিকর ঘটনা-গুলি একে একে স্মৃতিপথে জাগরূক হইবামাত্র অকস্মাৎ সমগ্র হৃদয় মন গায়ত্রীর চিন্তায় ভরিয়া গেল, তাহার সেই অনুপম লালিত্য, আলুলায়িত কেশপাশ ও বিষাদভরা সৌন্দর্য্যপূর্ণ ঢলঢল মুখখানি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ভাবিলাম—অকারণে সাধ করিয়া কেন এ অনর্থ বরণ করিলাম ? কেন ইচ্ছা করিয়া এ অশান্তি ক্রয় করিলাম ? কেন পাগল শরৎচন্দ্রকে গায়ত্রীদের বাড়ীতে শুইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম! মনে ভীষণ অনুতাপ হইল। একটি বিপন্নকে সাহায্য করিতে গিয়া নিজে এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কোন দিন গায়ত্রীর সম্মুখীন হইব না এবং যেরূপে পারি তাহাকে শীঘ্র কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব।

মানুষের জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় থাকে কত বিচিত্র কাহিনী, কত সুখ দুঃখের নব ভঙ্গিমা! কিন্তু এ সময় শরৎচন্দ্রের জীবনটি একটানা স্রোতের মতই নীরবে বহিতেছিল। এই বৈচিত্র্যহীন নীরব জীবনের স্রোত গায়ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। গায়ত্রীর চিন্তা তাঁহার জীবনে এক নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল।

শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, গায়ত্রীর ব্যর্থ জীবনের অন্তস্তলে নিশ্চয়ই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রবাহিত আছে, পথ পাইলেই সে প্রবাহ জীবনকে প্লাবিত করিতে পারে। সেই আশায় তাঁহার ছন্নছাড়া জীবনটা ব্যর্থতার মধ্যেও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল।

এই দেবীস্বরূপিণী-নারী-মূর্ত্তির অপরূপ সৌন্দর্য্যই শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার সহিত আলাপে আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম। পারিয়া শঙ্কিত হইলাম। শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর রূপের ধ্যানে তন্ময়, গায়ত্রীই এখন তাঁহার চিত্তের সর্ব্বত্র জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ফ্রেণ্ডের বাড়ী যতক্ষণ না যাইতে পারেন ততক্ষণ শরৎচন্দ্রের মনে শান্তি নাই।

একদিন বর্ষার আকাশ-ঘনঘটাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেঘের আড়ম্বর কিছু বেশী হইয়া আসিল, বিদ্যুৎ-বিকাশে দিঙ্মণ্ডল চমকিত হইতেছিল। প্রকৃতির ভাবগতিক দেখিয়া আজ আর গৃহের বাহির হওয়া যাইবে না ভাবিয়া শরৎচন্দ্র ভিজিতে ভিজিতে ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ফ্রেণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি খুব ভিজে গিয়েছেন দেখ্‌ছি, এক পেয়ালা চা দেব কি ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমি ওই কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছি। গায়ত্রী দেবীর কোন কষ্ট হ'বে না ত ? আর একটা কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, এই

বর্ষা-বাদলে এখানে বসে দু'একটা গান করতে পারি কি ?"

ফ্রেণ্ড ভিতরে যাইয়া এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল এবং বলিল—"উনি গান খুব ভালবাসেন।" একটু বৃষ্টি থামিলে শরৎচন্দ্র তাঁহার বাসা হইতে একটি হারমোনিয়ম আনিলেন এবং বিছানায় বসিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিলেন :—

"নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর' পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির সুখময় প্রণয় ভরে।
জগতে কিছুই নাহিক একেলা,
সকলি বিধির বিধান গুণে,
একের সহিত মিলিছে অপরে,
আমি বা কেন না তোমার সনে ?
ওই দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি।
সে কুলবালারে কেবা না দোষিবে
অভাগারে যদি যায় সে ভুলি।
রবিকর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশীকর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম সজনী,
সে সব চুম্বনে তবে কি ফল ?"

শরৎচন্দ্রের অতৃপ্ত প্রেমতৃষাতুর হৃদয় প্রেমের জন্য দিবা-নিশি ঝুরিয়া মরিত। প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ উদ্দাম শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিল।

কবিতা হিসাবে এই গানটি ফ্রেণ্ডের জানা ছিল, শরৎচন্দ্রের মুখে স্থানে স্থানে দু' একটি শব্দ রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিল; কিন্তু জীবনে সে এমন মধুর কণ্ঠ কখন শোনে নাই বলিয়া ভাবে মুগ্ধ হইয়া রহিল।

আমি পরে ফ্রেণ্ডের নিকট এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। গায়ত্রী সঙ্গীত শ্রবণের পর বিচলিত হইয়াছিল কিনা, তাহা ফ্রেণ্ড আমাকে বলিতে পারে নাই। তবে সে একান্ত আগ্রহভরে যে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়াছিল, ফ্রেণ্ড তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ফ্রেণ্ড আমাকে জানাইয়াছিল যে, উল্লিখিত গান হইবার পর শরৎচন্দ্রের প্রতি গায়ত্রীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। সে কারণে, সে ফ্রেণ্ডকে দিয়া শরৎচন্দ্রকে জানাইয়াছিল যে, শরৎচন্দ্র যেন দয়া করিয়া মধ্যে মধ্যে এরূপ গান শুনাইয়া তাহাকে আনন্দ দান করেন এবং যেদিন গান করিবেন সেই রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে আহার করিবেন।

সঙ্গীত রস-রসিক শরৎচন্দ্র কি ভাবিয়াছিলেন তাহা তিনি জানেন। তবে কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে এক-দিন যে আভাস প্রদান করেন, তাহাতে আমার ধারণা

হইয়াছিল যে, শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর হৃদয়ে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এরূপ বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছিল।

গায়ত্রীর কথা শরৎচন্দ্রের জপমালা হইল। এবং যাহাতে তাহাদের দুঃখের সংসারে তাহার কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেজন্য একটি ঠিকা ঝি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ঝিটি প্রত্যহ গৃহস্থালীর মোটামুটি কাজ-কর্ম্মগুলি করিয়া দিত ও ফ্রেণ্ডের সহিত বাজারে যাইত। দরিদ্র সংসারের অভাব পূরণের জন্য শরৎচন্দ্র মধ্যে মধ্যে নিজ ব্যয়ে যথাসাধ্য ফল মূল, তরী তরকারী প্রভৃতি আহার্য্য সামগ্রী কিনিয়া উহাদের পাঠাইয়া দিতেন।

শরৎচন্দ্র অবিবাহিত যুবক, স্বল্প মাহিনার একটি চাকরী করেন, বাসায় একাকী থাকেন, কোনদিন স্বপাক উষ্ণান্ন, কোনদিন পর্য্যুষিতান্ন এবং কোনদিন বা শুধু জলযোগ করিয়াই তাঁহাকে তিন চারি মাইল পথ পদব্রজে আপিসে যাইতে হইত শুনিয়া গায়ত্রী তাঁহাকে প্রতিদিন রাত্রে তাহাদের বাটিতেই আহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

বোধ হয়, গায়ত্রীর সহিত মাখামাখি একটু বেশী হইবার আশায় শরৎচন্দ্র এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, শরৎচন্দ্র সকল অবস্থাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। চর্ব্ব্যচোষ্য, লেহ্য-পেয় খাইতে পাইলে তিনি সুখী হইতেন, আবার

এক পয়সার মুড়ি মুড়কী খাইয়া দিন কাটানও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিলনা।

গায়ত্রীর ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর সরল অনাড়ম্বর ব্যবস্থা ও স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন শরৎচন্দ্রের খুবই প্রীতিকর হইত।

গায়ত্রী যথেষ্ট লজ্জা সঙ্কোচের সহিত অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া শরৎচন্দ্রের সম্মুখে বাহির হইয়া পরিবেষণ করিত। একদিন পরিবেষণের সময় গায়ত্রী অন্যমনস্কভাবে শরৎচন্দ্রের পাতে ডালের বাটি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা না খাইয়াই শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। এই নিরীহ ব্যক্তিটির নির্ব্বিকার ব্যবহার প্রথম হইতেই গায়ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

যাহার অপরূপ রূপ-লাবণ্য সর্ব্বদা মৃদু লজ্জার আবরণে অবগুণ্ঠিত, যাহার আচরণ, ভাবভঙ্গি, চাল-চলন সব কিছুতেই যেন একটি স্নিগ্ধ মধুর রহস্যজাল জড়িত, শরৎচন্দ্রের জীবনে কখনও এরূপ কোন তরুণী নারীর সংসর্গ ঘটে নাই।

নারী যতই আপনার সৌন্দর্য্য লজ্জা-আবরণে আবৃত রাখে, যত তাহার চিত্তের শোভা-মাধুরী নিঃশেষে প্রকাশ না করে, পুরুষের ততই তাহার রহস্যাবৃত স্বরূপটি জানিবার জন্য কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠে। নারী হৃদয়ের সকল মাধুর্য্যই গায়ত্রীর মধ্যে ছিল, কিন্তু সে গহন

কাননে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। হয়ত ইহাই নারী প্রকৃতির নিবিড় রহস্য। শরৎচন্দ্র যতই তাহাকে জানিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ততই সে রহস্যময়ী হইয়া তাঁহার ভাব-রাজ্যে অপরূপ হইয়া ফুটিতেছিল।

গায়ত্রীর চরিত্রে নারীর স্বভাবজাত সলজ্জভাব, কোমলতা, দয়া ও সঙ্কোচ প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি ও সর্ব্বোপরি তাহার ব্যবহারে অপূর্ব্ব সারল্য মিশ্রিত সহজ আত্মীয়তার ভাব শরৎচন্দ্রকে মোহিত করিয়াছিল। গায়ত্রীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাভাব ক্রমে অন্ধ ভালবাসায় পরিণত হইল।

ফ্রেণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষিত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যুবক। দেশে বৃদ্ধা জননী, বিবাহিতা স্ত্রী ও একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য সুদূর বিদেশে আসিয়া বহু চেষ্টাতেও একমাসের মধ্যে কোন চাকরীর সংস্থান করিতে পারিল না। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে দরখাস্ত হাতে করিয়া বাহির হইত এবং আফিসে আফিসে কত সাহেব সুবার খোসামোদ করিত, কত বাবুদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু কিছুতেই তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না। হাতে যে যৎসামান্য অর্থ ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, গায়ত্রীর গলায় সরু একছড়া সোনার হার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়ী

ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, উপস্থিত সংসার অচল। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, মাতৃভক্ত ফ্রেণ্ড মাতৃপদে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—প্রকৃত অভাব হইলে তাহার পূরণ নিশ্চয়ই হইবে; মা কি কখন সন্তানকে উপবাসী রাখিতে পারেন? তাহার দেহখানি যেমন সুকুমার সে তেমনই প্রিয়দর্শন ছিল। এই সচ্চরিত্র যুবকটিকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত।

ফ্রেণ্ড প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া আমার বাটিতে আসিত এবং তাহাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ ও অভাবের কথা জানাইয়া যাইত। তাহাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা শুনিয়া আমি আমার বরাদ্দ মুদীখানা হইতে চাল, ডাল, ময়দা, তেল, ঘি প্রভৃতি সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। শরৎচন্দ্র তাহাদের দৈনিক বাজার ও ধোপা নাপিতের খরচ যোগাইতেন।

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী মিস্ত্রীমহলে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, ফ্রেণ্ড একটি ভদ্রঘরের রূপসী বিধবাকে কুলের বাহির করিয়া আনিয়াছে, আর 'বামুন দাদা' তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতেছে, প্রত্যহ রাত্রে ঐ বাড়ীতে শয়ন করে ও মধ্যে মধ্যে গান বাজনা করে। ...

এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়া সহরে যে সমস্ত গুজব উঠিত তাহার অনেক কথা মধ্যে মধ্যে আমার কর্ণগোচর হইত, কিন্তু যাহাকে লইয়া বাহিরে এতখানি ইতর

সন্দেহের ঝড় বহিত, সেই গায়ত্রী তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। প্রতিবেশিনীরা মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিয়া আলাপ পরিচয় করিলে দেখিতে পাইত গায়ত্রীর নয়নে বচনে ও ভঙ্গিমায় একটি মধুর লজ্জা ও সঙ্কোচ ভাব জড়িত। গায়ত্রী স্বভাব-সুলভ সরলতাগুণে তাহাদের নিকট নিজের বিষাদময় জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে এবং ভক্তিমতী স্ত্রীলোকরা আসিলে তাহাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া শুনায়; শুনিতে শুনিতে তাহারা মুখের দিকে চাহিয়া ভাবে—এই সুন্দর কমনীয় মুখমণ্ডলে পুঞ্জীভূত বেদনার কি মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তি! বলে—"মা যেন আমাদের অশোক বনে সীতা দেবী।"

সমস্ত দিন নানা কাজের মধ্যে গায়ত্রীর নিজের অবস্থার কথাটি বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিত এবং পৃথিবীটিকে মনে হইত একটি প্রেতপুরী। ক্রমে এই পল্লীর পঙ্কিল আবহাওয়ায় তাহার মন বিষময় হইয়া উঠিল। সে ভাবিত বিদেশে নির্ব্বাসিত অবস্থায় এরূপভাবে কতদিন থাকিবে? এই আত্মীয়-স্বজনহীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা কল্পনাতীত! কোথায় স্বদেশের মধুময় স্মৃতি, আর কোথায় এই চির-অপরিচিত বর্ম্মা-মুল্লুক! কেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আবাল্যের স্নেহময় পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া

আসিয়াছি? এই বিলাপে শোকের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া যখন চোখের জলে গায়ত্রীর বুক ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন বাহিরের ঘরে শরৎচন্দ্রের অমৃত-মধুর সঙ্গীত গায়ত্রীর প্রাণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র গাহিতেছিলেন :—

গীত :—

কোথা ভবদারা! দুর্গতিহরা
কতদিনে তোর করুণা হবে!
কবে দেখা দিবি কোলে তুলে নিবি
সকল যাতনা জুড়াবে।
কৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জিবার তরে,
বারে বারে মাগো আসি এ সংসারে
বড় পথশ্রান্ত হ'য়েছি এ'বারে,
যাওয়া আসা কিসে ঘুচিবে?
মায়ার সংসারে কর্ম্ম কোলাহলে
শ্রীপদ দুখানি রয়েছি গো ভুলে
বিবেক-বৈরাগ্য তুমি নাহি দিলে,
মোহ ভ্রান্তি কিসে ছুটিবে?
আয়ু-সূর্য্য মোর বসিতেছে পাটে,
কোথা ব্রহ্মময়ী এসো তুমি ছুটে
তনয়ে তার মা এ ঘোর সঙ্কটে,
তুমি বিনা কে আর তারিবে?

গায়ত্রী মোহমুগ্ধ ভাবে তন্ময় হইয়া যখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত শ্রবণ করিত, তখন গানের প্রত্যেক শব্দ উদ্দাম গতিতে তাহার প্রাণে পৌঁছুছিয়া তাহার অশান্ত হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিত। ঐ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহার মনে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইত, সমস্ত মনের গতি এই মায়ারাজ্য হইতে মায়াতীত উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিত। এই সময়ে সে নিজ ইষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া প্রগাঢ় আনন্দরস অনুভব করিত ও যুক্তকরে মার নিকট প্রার্থনা করিত।

যে দিন শরৎচন্দ্রের গানে গায়ত্রীর হৃদয় ভিজিয়া যাইত, সেদিন সে দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের আহারাদি প্রস্তুতের জন্য পাকশালায় গমন করিত, কিন্তু গৃহকর্ম্মে তাহার মন লাগিত না, উদাস মনে গবাক্ষ দ্বারে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিত।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে কোন কোন দিন শরৎচন্দ্র ও ফ্রেণ্ডের মধ্যে যে সমস্ত সমাজ-নীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, গায়ত্রী পার্শ্বের ঘরে থাকিয়া সে সমস্ত শুনিত। একদিন শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আপনি পরমহংসদেবের ভক্ত ও গায়ত্রী দেবী আনন্দময়ীর উপা-সিকা, এরূপ অপূর্ব্ব ভক্ত সম্মিলন সহজে দেখা যায় না, ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই কিরূপে এ যোগাযোগ হ'ল।"

ফ্রেণ্ড উত্তর করিলেন, "অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মা

আমার এই অঘটন ঘটিয়েছেন, তাঁর ঈঙ্গিত মাত্রে কত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটিত হচ্ছে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আপনারা ভক্তলোক, আপনাদের এত অভাব কেন?"

ফ্রেণ্ড বলিলেন—"মার সঙ্গে ভাব নেই বলে, ষোল আনা প্রাণ দিয়ে মাকে ডাকতে পারছি না বলে, আর জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলটা ত ভোগ করতে হ'বে।"

শরৎচন্দ্র উত্তরে বলিলেন—"সকাল সন্ধ্যা আপনারা পূজা অর্চ্চনা ও সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রছেন তাই কি যথেষ্ট নয়?"

ফ্রেণ্ড বলিলেন—"এটি Morning বা Evening walk নয় যে একবার করলেই হবে, always দিবারাত্র তাঁহার স্মরণ মনন চাই।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমার ওসব নেশা নেই আমি নাস্তিক মানুষ।"

ফ্রেণ্ড উত্তর দিলেন—"মানুষ মাত্রেরই নেশা আছে, কারুর বিষয়ের নেশা, কারুর মদের নেশা, কারুর কর্ম্মের নেশা, কারুর মেয়ে মানুষের নেশা, কারুর আহারে নেশা, কারুর নাম যশের নেশা—এই সব। ভাগ্যবান সেই—মার নামে যার নেশা হ'য়েছে।"

এ গল্প আমি সেই যুবক ফ্রেণ্ডের মুখেই শুনিয়াছিলাম।

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে গায়ত্রীর বিষয় উত্থাপিত হইলে শরৎচন্দ্র বলিলেন—"বিধবাদের জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা আমার অসহ্য মনে হয়। জোর করিয়া বিধবাকে বিবাহ দেওয়া যেমন অন্যায়, জোর করিয়া তাহাদের বিবাহ না দেওয়াও তেমনি অন্যায়। গায়ত্রীর বৈধব্য তাহাকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচারিণীর ব্রতা-ধিকার বাহিরের দিকে দিলেও অন্তরের দিকে খুব সম্ভব দিতে পারেনি। কেন না, নিতান্ত তরুণ বয়সে সে স্বামী-হারা। স্বামীর সঙ্গে তার হৃদয়ের পরিচয় হবার কোন দিনই সুযোগ ঘটেনি। এ অবস্থায় শাস্ত্র তাহাকে যে জায়গাতেই দাঁড় করাবার চেষ্টা করুক না কেন, হৃদয়ের দিক দিয়ে সে আজও কুমারী। বিধবা বিবাহ ত অসঙ্গত নয়। কেউ যদি গায়ত্রীকে ধর্ম্মানুযায়ী পত্নী বলে গ্রহণ করতে চায়, তা'তে আমি কোন দোষ দেখি না।" ফ্রেণ্ড কহিল—"গায়ত্রীকে আমার শাপভ্রষ্টা দেবী বলে মনে হয়।"

এই সময় শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী কাঠের ব্যবসায়ী রেঙ্গুন সহরে আসেন। পূর্ব্বে এজেণ্টের মারফৎ তাঁহার কাঠ চালান হইত। এবার গবর্ণমেণ্টের টিম্বার সেল হইতে সেগুন কাঠের লগ্ কিনিয়া সেগুলি মিলে চেরাই করিয়া প্রতি জাহাজে চালান দিবার জন্য তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়াছেন।

এই কাজে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আবশ্যক হওয়ায় তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ফ্রেণ্ডকে কেরাণী নিযুক্ত করিলেন।

দারুণ অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ হইলে, লোক স্বভাবতই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ফ্রেণ্ড গায়ত্রী দেবীকে আপন সৌভাগ্যের কথা জানাইলে, সে ইহার মূলে তাহার আরাধ্যা-দেবী মায়ের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে অসংখ্য প্রণাম করিল।

ফ্রেণ্ডকে শশাঙ্ক বাবুর কাজকর্ম্মের দৈনিক সমস্ত হিসাব-নিকাশ ও হাতে সামান্য টাকাকড়ি রাখিতে হইত ও আবশ্যক মত তাহা মনিবকে বুঝাইয়া দিতে হইত।

একদিন হঠাৎ কার্য্যোপলক্ষে শশাঙ্ক বাবু ফ্রেণ্ডের বাড়ীর সন্ধানে আসিতেছিলেন, দূর হইতে একটি ছোট গৃহের বারাণ্ডায় দেখিলেন, অনিন্দ্য-সুন্দরী গায়ত্রী আয়ত লোচনে উদাস দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। শশাঙ্ক বাবুর পাপ-দৃষ্টি সেই অপাপ-বিদ্ধ অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তির উপর পতিত হইবামাত্র মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হইল। এইটি ফ্রেণ্ডের বাড়ী শুনিয়া তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন, ফ্রেণ্ড এখনও কর্ম্মস্থল হইতে ফিরে নাই।

শশাঙ্ক বাবু সেদিন বাড়ী ফিরিয়াও গায়ত্রীর সে রূপ ভুলিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত

হইল। তাঁহার চরিত্র সবিশেষ দুষ্ট না হইলেও, পবিত্র ছিল না।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া শশাঙ্ক বাবুর ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে গতিবিধি বাড়িয়া গেল। বুভুক্ষিত গৃধ্র যেমন মৃত শবের প্রতি লোলুপ বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, শশাঙ্ক বাবুও তেমনই ফ্রেণ্ডের বারাণ্ডার দিকে গায়ত্রীর উদ্দেশে চাহিয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য বস্তুটি কোথায় থাকিত তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ের অদম্য লালসা ও বিপুল চিত্তবেগ তিনি কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া একদিন ধরণীর মাকে ডাকিয়া গোপনে ফ্রেণ্ডের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ধরণীর মা, শশাঙ্ক বাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত লোহার মিস্ত্রীর রক্ষিতা।

ধরণীর মা গায়ত্রীর কাছে আসিয়া কথায় কথায় তাহার উপর শশাঙ্কবাবুর আকস্মিক কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে জানাইল এবং তাঁহার বিপুল ধন সম্পত্তি ও গায়ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবনের মর্ম্ম সে কি বুঝিবে? গায়ত্রী তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল।

গায়ত্রী এতদিন পর্য্যন্ত তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ ভাল করিয়া অনুভব করে নাই। দুইটি মানুষ তাহার

রূপ-মুগ্ধ হইয়া জীবনের নিশ্চিন্ততার অবসান করিতে চায়। একজন তাহার জন্য লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্যের বোঝা মাথায় লইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে। অপর একজন তাহাকে ধনৈশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চায়। তাহার মনে দারুণ আশঙ্কা মেঘের মত ধূমায়িত হইয়া উঠিল।

ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার উদ্দেশ্যে শশাঙ্কবাবু মধ্যে মধ্যে লেংড়া আম, লিচু, পটল প্রভৃতি রেঙ্গুনে দুষ্প্রাপ্য ফল মূল কলিকাতা হইতে আনাইয়া মিষ্টান্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে ফ্রেণ্ডের বাটিতে উপঢৌকন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। নির্ব্বিকার-চিত্ত ফ্রেণ্ড তাহার অধিকাংশ দ্রব্যই আমার বাটিতে পাঠাইয়া দিত এবং তাহার মনিবের অযাচিত করুণার অজস্র প্রশংসা করিত।

শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। তিনি রূপে, অর্থে, সামর্থ্যে, শঠতা বা প্রবঞ্চনা কিছুতেই শশাঙ্কবাবুর সমকক্ষ নহেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে বিদেশে কত বিভিন্ন দেশের ও ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর মত ধূর্ত্ত ও অদ্ভুত চরিত্রের লোক তিনি এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। সন্দেহ, সংশয় ও ঈর্ষায় তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। এক্ষেত্রে উভয়ে সমগুণবিশিষ্ট ও সমধর্ম্মী

হইলেও শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, আকাশের চাঁদে ও মর্ত্ত্যের খদ্যোতিকায় যে প্রভেদ তাঁহাতে ও শশাঙ্ক বাবুতেও সেই প্রভেদ।

এক প্রণয়ের পাত্রীকে দুইজন প্রণয়ীর সমভাবে আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। একের সমগ্র ভালবাসা লাভ করিতে হইলে অপরকে সরাইতে হইবে। নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের আশা ও আনন্দ একেবারে নিভিয়া যাইতে বসিল।

গায়ত্রীর পিতার পত্র আসিয়াছে, চিঠিখানি পড়িয়া আমি গায়ত্রীকে পাঠাইয়া দিলাম। আমার পত্রের উত্তরে গায়ত্রীর পিতা লিখিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিবেন। আমার কন্যা গায়ত্রী গৃহত্যাগ করায় কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কুলকামিনী স্বইচ্ছায় কুলত্যাগ করিয়া অকুলে পা দিয়াছে! লোকের ধিক্কারে সমাজে আমার মুখ দেখান ভার। সে কোন্ লজ্জায় আবার ঘরে ফিরতে চায়? সমুদ্রে জলের অভাব নাই, কালামুখীর কালাপানির জলে ডুবিয়া মরা উচিত। ইতি"

ভবদীয়

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গায়ত্রী যদিও সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন,

তত্রাচ তাহার পিতার পত্রে সে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। এই পত্র তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিল, শত যাতনার বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া সে শয্যায় পড়িয়া ছট্ফট্ করিতে লাগিল। ভাবিল—এ পৃথিবীতে তাহার মত হতভাগিনী আর কে আছে ? সমাজের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শান্তিময় অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সে প্রায়শ্চিত্ত জীবন আহুতি ছাড়া আর কি আছে ? তাহার স্নেহময় পিতা তাহাকে কুলটা আখ্যা দিয়া কালাপানির জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আদেশ দিয়াছেন! এই চিন্তায় সে মরমে মরিয়া গেল, চারিদিক শূন্যময় দেখিল, এ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করা তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। নিজের অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিয়া স্থির করিল, এ অভিশপ্ত জীবন সে ইরাবতীর জলে বিসর্জ্জন দিবে।

গায়ত্রী নাপিতানীর নিকট অনুসন্ধানে জানিল বাটির অদূরে রাস্তার পরপারেই ইরাবতী নদীর শাখা রেঙ্গুন নদী প্রবাহিত। এই নদীর উপরেই ভারতবর্ষের তৃতীয় বাণিজ্য বন্দর রেঙ্গুন সহর অবস্থিত, এই সহরে অসংখ্য ভারতবাসী প্রত্যহ স্বদেশ ও স্বজাতির মায়া ছিন্ন করিয়া জীবিকা সংগ্রহের জন্য যাতায়াত করে।

গায়ত্রীর ললাটে যে দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত

হইয়াছিল তাহা কিছুতেই ঘুচিবার নহে। তাহার আর ইহ-সংসারে থাকিবার ইচ্ছা নাই। সারাদিন উপবাস ও উৎকণ্ঠায় জীবনের ব্যর্থতা অনুভব করিয়া কিরূপে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া অবশেষে অবসন্ন মনে ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র আসিয়া যখন শুনিলেন, গায়ত্রী দেবী আজ রান্না করে নাই, কিছুই খায় নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে নাই, কেবল বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়াছে, ঝি ও নাপিতানী অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও তাহাকে জলগ্রহণ করাইতে পারে নাই, তখন তাঁহার দরদী প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র জানিতেন, অশান্ত মনকে শান্ত করিতে, শোকার্ত্ত মনে সান্ত্বনা দিতে সঙ্গীতের মত ভাবোদ্দীপক বিষয় আর কিছুই নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "Music is solace to the heart", "World without music is nothing but wilderness", গানের অপূর্ব্ব শক্তি আছে, মানব মাত্রেই সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তিতে অভিভূত হয়।

ভাব-সাগরের ভাবুক সুরশিল্পী শরৎচন্দ্র দেশ, কাল ও পাত্র-নির্ব্বিশেষে সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে নিজস্ব সুর সংযোগে ভাবভরে গান করিতেন, সেইজন্য তাঁহার গান ভক্তের নিকট এত প্রাণারাম—এত মনোমদ হইত। গায়ত্রী দেবীর অসহ্য দুঃখের ভার লাঘব করিবার জন্য

শরৎচন্দ্রের অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই গানটি গাহিতে ইঙ্গিত করিল।

"কোলের ছেলে ধূলা ঝেড়ে তুলে নে কোলে।
ফেলিস্ নে মা ধূলা কাদা মেখেছি ব'লে॥
সারা দিনটা কোরে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা
(আমার) খেলার সাথী যে যার মত গিয়াছে চ'লে॥
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা বিঁধেছে পায়,
কত পড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে॥
কেউ ত আর চাইল না ফিরে, নিশার আঁধার এলো ঘিরে,
এখন মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে॥"

নাপিতানী ও বৃদ্ধা ঝির কাছে শুনিয়াছি, গায়ত্রী এই গান শুনিয়া একবার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া স্তব্ধভাবে গান শুনিতেছিল।

শরৎচন্দ্র খানিক পরে আবার গাহিলেন,—

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা!
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা!
পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসে না
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভাল বাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা!

বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি
বড় জ্বালা স'য়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা !
স্বরগ হইতে এ জ্বালার জগতে
(আমায়) কোলে তুলে নিতে আয় মা !"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই গান গীত হইল।

এই সঙ্গীতের পর গায়ত্রী শয্যার উপর শয়ন করিয়া সংজ্ঞাহীন হইল ।

নাপিতানী ও বৃদ্ধা ঝি উভয়েই তাহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। তাহারা শুনিয়াছিল, গায়ত্রীর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে আনন্দের স্ফুরণসূচক 'মা মা' ধ্বনি।

পর দিবস ফ্রেণ্ড ধীরে ধীরে গায়ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মা, আপনি আর নিজেকে হেয়, দীন ব'লে ভাববেন না, কাল রাত্রে আপনাতে যে দিব্যভাবের বিকাশ দেখেছি, তাতে মনে হয়, আপনার আত্মোপলব্ধির আর বিলম্ব নাই। আপনি মায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সৌভাগ্য-বতী রমণী। আপনি অত হতাশ হবেন না, মা।"

গায়ত্রী শরৎচন্দ্রের গানে পরমানন্দ উপভোগ করিত। তাঁহার এই গুণেই মুগ্ধ হইয়া সে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

শরৎচন্দ্র কোনদিন তাঁহার চিরাভ্যস্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের

অবতারণা করিলে গায়ত্রী তাঁহাকে মার নাম গাহিতে অনুরোধ করিত।

ফ্রেণ্ড এ কয়দিন শরৎচন্দ্রের সহবাসে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই গানগুলি শরৎচন্দ্র শুধু গায়ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য গাহিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার আন্তরিক ভাবের বিকাশ নহে।

গায়ত্রী একদিন বলিল—"শরৎ বাবুর গানে প্রাণ আছে, ওঁর গানের অপূর্ব্ব সম্মোহনী শক্তি আমাকে আত্মহারা করে, মনে হয় স্বয়ং বাগ্‌দেবী ওঁর কণ্ঠে আবির্ভূতা হন।"

ফ্রেণ্ড বলিল, "সে কথা সত্য। কিন্তু মা, যতই শরৎ বাবুর সঙ্গে মিশছি ততই দেখছি উনি একটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।"

গায়ত্রী উত্তরে বলিল, "না বাবা, তুমি ভুল বুঝেছ, উনি খুব উচ্চ প্রকৃতির সাধক।"

ফ্রেণ্ড বলিল, "আমি লক্ষ্য ক'রেছি ওঁর মন ও মুখ এক নয়। আজকাল উনি অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে আপনার সম্বন্ধে যে সব কথাবার্ত্তা বলেন, তাহা ধর্ম্মনীতিশূন্য। শুধু নাটক, নভেল পড়া ও নারীচরিত্রের সমালোচনা করা ছাড়া ওঁর অন্য কোন কাজ দেখি না।"

গায়ত্রী প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"মা যাকে যেভাবে চালান, সে সেইভাবেই চলে, কিন্তু গানে যে মাকে প্রাণের

এমন কাতর ক্রন্দন জানাতে পারে, সে নিশ্চয়ই পরম ভক্ত।”

শরৎচন্দ্রের গান-মুগ্ধ গায়ত্রীর কাছে তাঁহার বিরুদ্ধে বেশী কিছু বলিলে পাছে সে মনে ব্যথা পায় সেজন্য ফ্রেণ্ড সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল।

শশাঙ্ক বাবু ফ্রেণ্ডের নিকট গায়ত্রীর বিষয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিয়া মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং প্রকাশ্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“আমি কলকাতায় ফিরে যাবার সময় ওঁকে নিয়ে গিয়ে ঢাকার নারী আশ্রমে রেখে দেব।”

তারপর তাঁহারা কেন এই কদর্য্য পল্লীতে বাস করেন এবং শরৎ বাবু কেন রাত্রে তাঁদের বাটিতে শয়ন করেন এ সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন —“আমার কাজের সুবিধার জন্য এ অঞ্চলে একটি আফিস খোলা আবশ্যক হ'য়েছে। আমি টম্‌সন্ ষ্ট্রীটে মাসিক ১০০৲ শত টাকা ভাড়ায় একটি বড় বাড়ী ভাড়া করেছি, সেথায় অনেক ঘর-দুয়ার আছে। নীচে আমার স্বতন্ত্র আফিস ও থাকবার বন্দোবস্ত হবে, উপরে আপনি ও গায়ত্রী দেবী থাকতে পারবেন। পাচক, ব্রাহ্মণ, দাসদাসী, খাওয়া দাওয়া সমস্তই এক সঙ্গে হ'বে, উপস্থিত সংসার চিন্তার হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন।”

দয়ালু মনিবের কৃপায় এইরূপে অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে ভাবিয়া ফ্রেণ্ড আনন্দে গায়ত্রী দেবীকে এ

সংবাদ জানাইল। সে ভাবিয়াছিল শশাঙ্ক বাবুর সদাশয়তার জন্য গায়ত্রী দেবী খুবই আনন্দিত হইবেন।

সৎপথ রুদ্ধ হইলে প্রলোভনীয় জিনিষ মানুষকে অসৎ পথে চালিত করে। গায়ত্রী বুঝিল তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিবার জন্য শশাঙ্ক বাবু প্রকারান্তরে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, শশাঙ্ক বাবু ফ্রেণ্ডের বাটিতে আসিলে মনিব হিসাবে তিনি যথেষ্ট খাতির যত্ন পাইতেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহাকে মোটেই গ্রাহ্য করিতেন না; অধিকন্তু তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ও চরিত্রহীন বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করিতেন। একদিন কথায় কথায় উভয়ে বচসা হইলে শরৎচন্দ্র তাঁহাকে "অসভ্য-বাঙ্গাল" বলিয়া গালি দেন, উত্তরে শশাঙ্ক বাবু বলেন—"অসভ্য বাঙ্গাল আমরা নই—সে চট্টগ্রামের লোক, আমরা খাস ঢাকার লোক,—আমরা আসল বাঙ্গাল, আর আপনারা 'ঘটি চোর' কলকাতার লোক—বিলাতী বাঙ্গাল।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বিলাতী বাঙ্গালরা বিলাতী ঘুসী চালাতে জানে।"

ইহা শুনিয়া শশাঙ্ক বাবু রাগে অবজ্ঞাস্বরে বলিলেন—"আরে রাখেন, রাখেন ঘুসা-ঘুসির কথা। আপনার মুরদ আমি জানি,—A man is known by the company he keeps. যত মুটে মজুর আপনার বন্ধু!"

শরৎচন্দ্র এই হীন পল্লীতে বাস করিতেন বলিয়া নানা লোকে নানা কথা বলিত, কত মিথ্যা অপবাদ রটাইত, কিন্তু কেহ কোন দিন তাঁহার মুখের উপর কোন অপমান-সূচক কথা বলিতে সাহস করে নাই। আজ শশাঙ্কবাবুর কথায় তাঁহার রাগে ঘৃতাহুতি পড়িল। সন্ধ্যার পর পল্লীর এককড়ির চায়ের দোকানের বারাণ্ডায় যে ছোট একটি মজলিস্ বসিত, শরৎচন্দ্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার সকলের সহিত শরৎচন্দ্রের বিশেষ আলাপ ছিল। কয়েকটি উদ্ধত স্বভাব যুবকের সহিত তিনি এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, শশাঙ্কবাবু বেশী বাড়াবাড়ি করিলে একদিন তাঁহাকে রীতিমত শায়েস্তা করিয়া দিতে হইবে।

প্রায় মাসাধিক কাল এইভাবে কাটিয়া গেল। গায়ত্রী এখন শরৎচন্দ্র ও শশাঙ্কবাবু উভয়েরই ধ্যানের বস্তু হইয়াছে, উভয়েই মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঈর্ষানলে পুড়িয়া মরিতেছেন। মধ্যে রক্ষক স্বরূপ ফ্রেণ্ড না থাকিলে কি যে অঘটন ঘটিত তাহা কে বলিতে পারে?

বর্ষার লতার মত অপ্রতিহত গতিতে শরৎচন্দ্রের লালসা বাড়িয়া উঠিল, তিনি গায়ত্রীর হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য গোপনে নাপিতানীকে হাত করিলেন। নাপিতানী একদিন কথায় কথায় শরৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গায়ত্রীকে বলিল—"এমন নিরীহ পরোপকারী

লোক পৃথিবীতে আর দুটি নেই, মা। সারা দিন বই আর লেখা নিয়েই থাকেন। বাইরের জগতের দিকে বাবুর মোটেই লক্ষ্য নেই, শুধু কি জানি তোমাকে দেখে পাগলের মত হ'য়ে গেছেন। প্রায়ই তোমার কথা ভাবেন, বলেন তুমি আর কতদিন এমন অবস্থায় একলা থাকবে। আজ কাল বিধবা বিবাহ ত মোটেই দোষের নয়—।"

বিরক্তিতে গায়ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সুখে দুঃখে এইভাবে দিন কাটিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন ফ্রেণ্ডের তলপেটে ব্যথা ধরায় সে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল। অফিসপ্রত্যাগত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর শরৎচন্দ্র বাসায় ফিরিবার পথে দেখিলেন, ফ্রেণ্ডের বাটিতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে এবং গায়ত্রী বিষণ্ণ মুখে বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছে? শরৎচন্দ্র আমাকে সংবাদ দেওয়ায় আমি ডাঃ নীলমণি দে কে সঙ্গে লইয়া আসিয়া দেখিলাম, ফ্রেণ্ড যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, আমাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ডাক্তারকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ডাক্তার বাবু! মারা গেলাম, আপনি দয়া ক'রে আমাকে ভাল করুন, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার দেখতে চাই আমার দুঃখিনী মাকে।"

ডাক্তার দে ব্যারামটি 'এপেণ্ডিসাইটিস্' অনুমান করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই তাহার অপারেশনের জন্য হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। আমি অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম।

শরৎচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সস্নেহে ফ্রেণ্ডের সেবা করিলেন এবং গায়ত্রী শরৎচন্দ্রের সহিত সারারাত্র জাগিয়া শুশ্রূষা কার্য্যের যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই করিল এবং মাতৃত্বের সীমাহীন স্নেহে ফ্রেণ্ডের আরোগ্য কামনায় কত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল,—কত পূজা-মানসিক করিল, মনে মনে কাঁদিয়া বলিল—মাগো! অভাগীর অদৃষ্টে আরও কি আছে?

ফ্রেণ্ডের ওখান হইতে আসিয়া ভাবিলাম, গায়ত্রী অসহায়া অবস্থায় না জানি কত দুঃখ ভোগ করিবে।

পরদিন সকালে ফ্রেণ্ডের বাটিতে ঠিক সিঁড়ির সম্মুখেই শশাঙ্কবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, আজ তাঁহার সাজ সজ্জার একটু বিশেষ পারিপাট্য দেখিলাম। অমাবস্যা-নিশীথে সম্মুখে প্রেতমূর্ত্তি দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, শশাঙ্কবাবু আমাকে দেখিয়া সেরূপ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আপনি এখানে?"

রেঙ্গুনে 'বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব' প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত। এখানে সাধারণ পাঠাগার, লাইব্রেরী, ক্রীড়া-কৌতুক, গীত-বাদ্যাদির আয়োজন ও অতিথি

অভ্যাগত আসিলে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। রেঙ্গুন সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বাঙ্গালী এই ক্লাবের সভ্য। কোন নবাগত ব্যক্তির ক্লাব গৃহে থাকিতে হইলে, ক্লাবের নিয়মানুযায়ী সেক্রেটারীর অনুমতি লইতে হয়। আমি এই ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলাম বলিয়া শশাঙ্কবাবু প্রথমে রেঙ্গুনে আসিয়া কিছুদিন ক্লাবে থাকিবার জন্য আমার অনুমতি লইতে আমার বাটিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং এই কদর্য্য পল্লীতে বিশেষতঃ, গায়ত্রীদের বাটিতে আমাকে দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য হওয়া বিচিত্র নহে।

আমি কিরূপভাবে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জানিয়া শশাঙ্কবাবু আমাকে বলিলেন,—তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর কঠিন পীড়ায় সবিশেষ দুঃখিত এবং রোগীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে অন্য একজন কর্ম্মচারীর সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। সমস্ত ব্যয়-ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন সেজন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী পরদিনের জাহাজেই ফ্রেণ্ডকে কলিকাতায় পাঠান হইল। শশাঙ্কবাবু অদূর ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন দেখিয়া উৎসাহিত হইলেন, এবং একদিনেই গায়ত্রীর পরম হিতৈষী বন্ধু সাজিয়া তাহাকে ঢাকার নারী আশ্রমে পাঠাইবার অছিলায় উপস্থিত তাঁহার টম্‌সন্ ষ্ট্রীটের নূতন বাসায় স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র

তাহাতে ঘোর আপত্তি করায় তিনি একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পূতচরিতা সতীসাধ্বী গায়ত্রী নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে দুঃখভরা ভাঙ্গা প্রাণে ফ্রেণ্ডকে বিদায় দিবার সময় তাহার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। তাহার এই বন্ধুহীন নিঃসঙ্গতা আমাকে কম আঘাত দিল না।

এখন আর গায়ত্রীর সহিত দেখা করিতে বা কথা কহিতে আমার কোন দুর্ব্বলতা বা লজ্জা আসিল না, আমি তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"মা, তুমি ভক্তিমতী, মায়ের চরণাশ্রিতা, মাই তোমাকে রক্ষা ক'রবেন। আমি একটু পরেই কুঞ্জবাবুর গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি, গাড়ীর সঙ্গে তাঁর বাড়ীর কেউ এ'লেই তুমি চলে এস, উপস্থিত দিদির কাছেই থাকবে।"

ফ্রেণ্ডই ছিল গায়ত্রীর একমাত্র সম্বল ও রক্ষক। ফ্রেণ্ড চলিয়া যাইবার পর গায়ত্রী বিরাট শূন্যতা ও অসহায়তার অবসাদ অনুভব করিয়া অন্যমনস্কভাবে অনেক কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মধ্যে কুঞ্জবাবুর বাড়ীর চিন্তাই বেশী। এই সময় হঠাৎ কোথা হইতে বেগে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন শরৎচন্দ্র! প্রবল ভাবের রুদ্ধ আবেগে উদ্‌ভ্রান্ত সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া এবং তাঁহার কল্পনাতীত আবির্ভাবে মহাবিস্ময়ে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পার্শ্বের ঘরে পলাইয়া গেল এবং দেখিল তাহার কল্পিত পবিত্র

সাধক মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটি লালসালিপ্ত কামনার জীবন্ত চিত্র! শরৎচন্দ্র গায়ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এ সময়ে আমাকে দেখে আপনি ভারী অবাক হয়ে গেছেন না? আমি কিন্তু আপনাকে রক্ষা করবার জন্মই ছুটে এসেছি। শয়তানের প্রতীক শশাঙ্কবাবু আপনাকে এখনই তাঁর বাসায় নিয়ে যাবার জন্ম গোপনে ষড়যন্ত্র ক'রে অনেক লোকজন নিয়ে আসছেন, আপনি কিছুতেই যাবেন না। আমি প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাঁর কার্য্যে প্রাণপণে বাধা দোব, খুব সম্ভব একটা ভীষণ মারপিট ও পুলিশ কেস হবে।"

অবগুণ্ঠনাবৃত গায়ত্রী এই কথা শুনিয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এখন যাবেন কোথায়?"

—"মার ইচ্ছা যা হবে, উপস্থিত ত পথে দাঁড়িয়েছি!"

—"পথে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু ঘর তৈয়ার করে নিতে কতক্ষণ?"

—"সে ঘর মাই ঠিক ক'রে দেবেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।" খরবাহিনী নদীর দ্রুত স্রোতে ক্ষুদ্র উপলখণ্ড যেমন ভাসিয়া যায়, গায়ত্রীর প্রণয়াশারূপ প্রবল প্রবাহে শরৎচন্দ্রের বিবেক, মনুষ্যত্ব ও চক্ষুলজ্জা সব ভাসিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আমার জীবনের

মাঝখানে যে আপনার আসন পাতা হ'য়ে গিয়েছে, গায়ত্রী দেবী। আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে দিয়ে কি আপনি চলে যেতে পারবেন?"

অবনতমুখী গায়ত্রী করুণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমি সে সৌভাগ্য চাইনা, আপনি আমার পিতা, আমায় ক্ষমা করুন, আমি বড় অনাথা!"

গায়ত্রীর নয়নে জলের আবির্ভাব হইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া শরৎচন্দ্র বুদ্ধিমানের মত "আমাকে ভুল বুঝবেন না, গায়ত্রী দেবী", বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

শরৎচন্দ্রের কথায় গায়ত্রী শিহরিয়া উঠিল! উদাসী সাধকের মনে যে পাপ থাকিতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। গায়ত্রী কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্ব যেন হঠাৎ কোন পৈশাচিক মন্ত্রে ভরিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে বসিয়াছে, বিরাট অন্ধকারে সে ধরিবার ছুঁইবার কিছুই পাইল না।

পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছিল। সে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিল, তাহার দুঃখদীর্ণ-নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অকস্মাৎ দরজায় ধাক্কা মারার শব্দ শুনিয়া গায়ত্রী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

—"চিঠি, মাইজী।"

গায়ত্রী জানালা দিয়া হাত বাড়াইতে একটি হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকে সেলাম করিয়া একখানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

মানুষ এমনি দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কূল কিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্ব্বল মন বড় ভয়ে ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরে। গায়ত্রী মনে করিয়াছিল এটি গিরীনবাবুর চিঠি হইবে।

পত্র খুলিয়া দেখিল শশাঙ্কবাবু লিখিয়াছেন—"আপনার ধরম-পুত্র ফ্রেণ্ডের ইচ্ছামত আপনার সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দে থাকিবার মত নূতন বাড়ী, পাচক ও ঝি নিযুক্ত করিয়াছি, আপনি প্রস্তুত হউন, অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী পাঠাইব। আমার দরওয়ান ও ঝি আপনাকে লইয়া আসিবে, চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনার পুত্রের কলিকাতায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, তিনি আরোগ্য হইয়া শীঘ্রই রেঙ্গুনে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবেন। ইতি

আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই একজন আধাবয়সী স্ত্রীলোক একখানি থালায় করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া গায়ত্রীর বাটিতে উপস্থিত হইল। গায়ত্রী প্রশ্ন করিল—"তুমি কে গা?"

স্ত্রীলোকটি মুচকি হাসিয়া জানাইল—"আপনাদের মনিব শশাঙ্ক বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন এত কষ্টে থাকা বাপু, এমন রূপ যার।"

কথার মাঝখানেই গায়ত্রী উত্তেজিত হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল—"না। এখুনি নিয়ে যাও সব।"

মেয়েমানুষটি একটু অবাক হইয়া বলিল—"নিয়ে যাব কি গো? আপনার জলখাবার জন্যেই ত তিনি পাঠিয়ে দিলেন, গাড়ী আসছে, এখুনি ত আমাদের বাড়ীতে যেতে হ'বে?"

তখনই গাড়ী আসিবে শুনিয়া গায়ত্রী ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। অন্তরে ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল ও তাহার হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিতে লাগিল; বড়ই উৎকণ্ঠা ও দুঃখে সে মনে মনে ভবভয়হারিণী মাকে স্মরণ করিতে লাগিল।

প্রণয়মুগ্ধ শরৎচন্দ্র ও পরদারলোভী শশাঙ্ক বাবুর মধ্যে যাহাতে এই ঘটনা লইয়া রক্তারক্তি না হয় তাহা নিবারণ করিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া আমি গায়ত্রীকে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলাম।

অসীম আশা হৃদয়ে লইয়া শরৎচন্দ্র যে প্রেমের তরী ভাসাইয়াছিলেন, তাহা কাল বৈশাখীর ঝড়ে পড়িয়া উল্টাইয়া যাইতে পারে এ কথা তাঁহার মনে কোনদিন উদয় হয় নাই। কোন্ দুরাকাঙ্ক্ষার বেগে বুদ্ধির বিপদ-

সঙ্কুল পথে তিনি চলিয়াছেন সেই দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না। যে গায়ত্রীকে না পাইলে তাঁহার জীবন মরুময় হইয়া উঠিবে, যে গায়ত্রী-লাভের লুব্ধ বাসনা তাঁহার মনকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে, সেই গায়ত্রীকে শশাঙ্ক বাবু অবৈধ উপায়ে হস্তগত করিবে এই চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইল। সেইজন্য আজ শরৎচন্দ্র অফিসে যান নাই। প্রতিবেশী মহলে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র ফ্রেণ্ডের বাড়ী হইতে তাঁহার বিছানা পত্র আনিবার সময় নাপিতানীর হাতে গায়ত্রীর জন্য একখানি চিঠি দিয়া আসিলেন।

এ সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনের সদসৎ, ভালমন্দ কোন জিনিষই আমার নিকট অব্যক্ত রাখিতেন না, কিন্তু মনের মধ্যে পাপ ছিল বলিয়া এই প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারটি গোপন করিয়াছিলেন ; এমন কি আজ ফ্রেণ্ডের বিদায় মুহূর্ত্তেও গায়ত্রী নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোথায় থাকিবে এ কথাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

গায়ত্রীর আশ্রয় নাই বা তাহার পথে বসাও অভ্যাস নাই, সুতরাং নিরাশ্রয়া গায়ত্রী নিশ্চয়ই তাঁহার বাটীতে আসিবেন এই অলীক কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া শশাঙ্কবাবু যথাসময়ে একখানি ঠিকা গাড়ী, ঝি ও দরওয়ান

পাঠাইয়াছেন। অধিকন্তু শরৎচন্দ্র পাছে বাধা দেন এই আশঙ্কায় দুইজন জেরবাদী (বর্ম্মা ও মুসলমান মিশ্রিত—দো আঁশলা) গুণ্ডা তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে।

আমি কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম তখন তাঁহার আফিস যাইবার সময়, তিনি খাইতেছিলেন ও দিদি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই অসময়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলায় দিদি বলিলেন—"আহা! বেচারীর কি বিপদ, তুমি এখনই এঁর অফিসের ফেরৎ গাড়ীতে তাকে আমার এখানে নিয়ে এস।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"ও পাড়ার অত গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি একেলা যেও না, সঙ্গে বাদলু ও মসিদীর একজন লোক নিয়ে যাও।"

বাদ্‌লু ওরফে চুনীলাল চট্টোপাধ্যায় কুঞ্জবাবুর শ্যালক। এ বাড়ীতেই থাকে, অবিবাহিত চরিত্রবান যুবক, বর্ম্মা রেলওয়ে অফিসে চাকরী করে। সে দিদির আপন ভাই ও আমি স্নেহ সম্পর্কীয় ভাই হইলেও এ বাড়ীতে আমরা উভয়ে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় বহুকাল কাটাইয়াছি।

বাদ্‌লু ভায়া ও আমি কুঞ্জবাবুর সহিত তাঁহার অফিসে গিয়া মসিদী সাহেবের নামে একখানি চিঠি লইয়া তাঁহার চিকে-মংটলে ষ্ট্রীটের বাটিতে পৌঁছিবামাত্রই তিনি সসম্ভ্রমে

আমাদের সেলাম করিয়া একজন বলিষ্ঠ পাঠান পালোয়ানকে আমাদের সঙ্গে দিলেন।

রেঙ্গুন সহরে মসিদী সাহেবের নিকট সেলাম পাওয়া একটি সম্মানের কথা, এটি কুঞ্জবাবুর খাতিরেই আমরা পাইলাম। মসিদী সাহেব কুঞ্জবাবুর একজন বড় মক্কেল, ইনি পেশওয়ারী মুসলমান। প্রসিদ্ধ সওদাগর ; ঘর-বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্তই রাজোচিত। দুঃখের বিষয় তাঁহার একটি বিষম দুর্নাম আছে ; জনরব যে গবর্ণমেণ্টের নিষিদ্ধ আবগারী বিভাগ গোপনে তাঁহারই হস্তগত। সহরে যতগুলি মেওয়া-ফলের দোকান আছে ইনি সবগুলিরই মালিক। ইঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে অনেক পেশওয়ারী গুণ্ডা নিযুক্ত থাকায় রেঙ্গুন সহরের দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি সকল দুঃসাহসিক কার্য্যের সহিতই ইঁহার নাম সংশ্লিষ্ট। এক কথায় মসিদী সাহেবের নামে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খাইত।

মসিদী সাহেবের লোক সঙ্গে লইয়া আমরা শরৎ পল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শশাঙ্কবাবু একখানি গাড়ীতে বসিয়া আছেন ও তাহার পশ্চাতে আর একখানি খালি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, কিছুদূরে শরৎচন্দ্র একটি গলি পথের আড়ালে গায়ত্রীর ঘরের দিকে চাহিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয় পক্ষের উত্তেজিত বহুলোক সমবেত হইয়া কুরুক্ষেত্রের সূচনা করিতেছিল।

এমন সময় কুঞ্জবাবুর বর্ম্মা-পনি সংযুক্ত জুড়ি গাড়ীতে লাঠি হস্তে পালোয়ান সহ আমাদের নামিতে দেখিয়া ভয়ে সকলে একে একে সরিয়া পড়িল।

আমি ও বাদ্‌লু ভায়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম শশাঙ্ক-বাবুর ঝি গায়ত্রীর নিকট বসিয়া আছে। নাপিতানী আমাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা, বাঁড়ুজ্যে সাহেবের গাড়ীতে গিন্নীমার দুই ভাই তোমায় নিতে এসেছেন।" আমাদের দেখিয়া গায়ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং অবিলম্বে আমাদের গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

দূরে শরৎচন্দ্র হতভম্বের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, দারুণ লজ্জায় আমাদের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অকূলে কূল পাইয়া গায়ত্রী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিল, বহুদিনের এই কদর্য্য পল্লী হইতে বাহির হইয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিয়াই দিদির পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

প্রবল অশ্রুবেগ দমন করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর গায়ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাহার অবরুদ্ধ মনোবেদনার কথা সমস্ত একে একে দিদিকে জানাইল।

দিদি একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎবাবু লোকটি কে, গিরীন্দ্র?"

আমি বলিলাম—"উৎসবের সময় আমার বাড়ীতে যিনি গান করেন।"

—"তোমাদের শরৎ বাবু গায়ত্রীকে বিয়ে করতে চান, বলেন বিধবা বিবাহে দোষ নেই ?"

—"উনি মাথাপাগলা—একটু ছিট আছে।"

এই ঘটনার পর শরৎচন্দ্র বহুদিন পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহা ক্রোধের বা ঘৃণার নীরবতা নয় ; গভীর লজ্জার মৌন-ব্রত !

কুঞ্জবাবু দিদির কাছে গায়ত্রীর যোগ-বিভূতি-পূর্ণ উন্নত অবস্থার কথা সমস্ত শুনিলেন। আহার নিদ্রা তাহার মনে থাকে না, দেহের রক্ষণাবেক্ষণে তাহার যত্ন নাই, সর্ব্বদা একাকী নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া বসিয়া থাকে। মা বলিতে তাহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। দিদি বুঝিয়াছিলেন, এই ভাবই যথার্থ সাধকের ভাব—এই অবস্থা পাইলেই মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়।

কুঞ্জবাবু নিজের গরজেই গায়ত্রীর মেসোমহাশয়কে তাহার প্রবাস ক্লেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তীব্র বৈরাগ্যের কথা লিখিয়া জানাইলেন এবং তিনি অনাথা গায়ত্রীকে তাঁহার সংসারে একটু স্থান দিতে পারেন কিনা জানিতে চাওয়ায় উত্তরে গায়ত্রীর মেশোমহাশয় লক্ষ্ণৌ হইতে লিখিলেন :—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

পূজনীয় কুঞ্জবাবু,

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল সেজন্য ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি আমার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার দরুণ বড়ই মনঃকষ্টে আছি। আমার স্ত্রী গায়ত্রীকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী আমার স্ত্রীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, তাহার হঠাৎ দেশত্যাগের সংবাদে তিনি মরমে মরিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীস্বরূপিনী কন্যাটি ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে ও আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়ে আছে শুনিয়া তিনি মৃত্যু সময়ে অনেক সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন।—আমি বেশ বুঝিয়াছি গায়ত্রী নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র। আপনি রেঙ্গুনের জননেতা ও অনেকের আশ্রয় দাতা। দয়া করিয়া গায়ত্রীকে পত্র পাঠ লক্ষ্ণৌয়ে পাঠাইয়া দেবার বন্দোবস্ত করিলে চিরবাধিত হইব। আপনার পত্র পাইলে জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা খরচ হইয়াছে সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিব। নিবেদন ইতি।—

প্রণতঃ শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য্য।

এই পত্র মধ্যে তিনি গায়ত্রীকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"মা গায়ত্রী ; তোমায় হারিয়ে মন অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছিল, এখন সে কষ্ট দূর হ'ল। তুমি যে ব্যথা পেয়েছ, আমরা কর্ত্তব্য ও সমাজকে রক্ষা ক'রতে গিয়ে

তোমার অভাবে তাহার চেয়ে একটুও কম ব্যথা পাইনি। আমরা পাহাড়ের মত শক্ত হ'য়ে তোমার প্রতি যে মমতা-হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রেছি তার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত। তুমি শীঘ্র চলে এস। তোমার মাসীমা মৃত্যুকালে তাঁহার দেবসেবার ভার তোমার উপর দিয়ে গেছেন, আর তোমার তীর্থ ভ্রমণ, পূজা অর্চ্চনা ও অতিথি সংকারের জন্য দশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছেন। শোকের সময় গিরীন বাবুর পত্রের জবাব দেওয়া হয়নি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি তোমায় রক্ষা ক'রেছেন, আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিও ও তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও !

ইতি তোমার মেসোমহাশয় !"

এই পত্র পাইয়া গায়ত্রী যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

কয়েক দিন পরে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের চাকরী হইতে বদলী হইয়া ভারত সরকারের অধীনে লক্ষ্ণৌর সন্নিকটস্থ পিলিভিট নামক স্থানে বাহাল হন। তিনি সপরিবারে যাইতেছেন দেখিয়া আমরা গায়ত্রীকে তাঁহার সহিত একই জাহাজে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম।

মা সর্ব্বমঙ্গলা যাহার অন্তর-ফলকে সদা প্রতিফলিত, জাগতিক বিপদ কি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে ?

সরলা গায়ত্রী বিদায় বেলা কি যে বলিতে হইবে তাহা জানিত না, হঠাৎ ছলছল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া পায়ের ধূলা লইল। আমি এতক্ষণ যেন একটি প্রাণহীন পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিলাম, গায়ত্রীকে বাধা দিবার পূর্ব্বে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, এ যেন বিধাতার ভ্রান্তিমূলক এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বহুদিন পরে শরৎচন্দ্র একদিন আমার বাটিতে আসিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"ভাই, লুকোচুরি কেবল মনকে বিক্ষিপ্ত করে ও অশান্তি বাড়ায়, তাই তোমার কাছে এলাম।"

—"বেশ ক'রেছ, শরৎ দা। আমি প্রায়ই তোমার কথা ভাবি, কোথায় ডুব দিয়েছিলে এতদিন ?"

—"পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা আমার ভাগ্যে ঘটেনি, ভাই। কল্পনা কোন দিনই বাস্তব হ'য়ে দেখা দেয় না। —দেয় না বলেই তার প্রতি আমাদের লোভ এত বেশী, তার জন্য আমরা মরি তবু তাকে জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনে।"

—"তুমি কল্পনার উড়ো জাহাজে উড়ে বেড়াও বলে এত কষ্ট পাও। দেখ দেখি ক্রেগু কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় কেমন উত্তীর্ণ হ'য়ে চলে গেল!"

—"ভুক্তভোগী ভিন্ন আমার অবস্থা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। অপরিণত বয়সে নিজেকে বিসর্জ্জন দেবার

আকাঙ্ক্ষা অল্প বিস্তর সকল মানুষেরই থাকে, অসংযমী মনের উপর প্রভুত্ব করা বড় শক্ত! এমন কত পুরুষের মন কত নারীর মনকে গোপনে চেয়ে এসেছে তার সংখ্যা করা যায় না। মনের কোণে থাকে কলুষ-কামনা-ব্যাধি, সাধুতার অন্তস্তলে থাকে জমাটবাঁধা পশুত্ব, মানুষ তাহা সহজে টের পায় না, যখন টের পায় তখন তার সাধ্যের অতীত! এই গায়ত্রীর আকর্ষণের দুঃসহ বেগ সহ্য ক'রে বহু বার পালাবার চেষ্টা ক'রেছি কিন্তু গোলক-ধাঁধার মত সকল পথই আবার আমাকে সেইখানেই ফিরিয়ে এনেছিল।"

—"তুমিই ত ফ্রেণ্ডকে বলেছিলে, প্রলোভনের জিনিষ সম্মুখে রেখে সংগ্রাম করাই বীরত্ব।"

—"মুখে কি না বলা যায়, কিন্তু সংসারে করিব বলায় ও সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান! তোমার দিদিকে আমার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা ক'রতে বোল, কুঞ্জবাবুর কাণে যেন এ সব কথা না উঠে।"

নিরাশ প্রণয়ের বিষম বিষাদে শরৎচন্দ্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মানুষের সব দিন সমান যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে যে পৃথিবী ছিল স্বপ্নে ভরা রঙ্গীন, আজ তাহা হইয়াছে মলিন অন্ধকার। দীর্ঘ দিবসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্ফল প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া শরৎচন্দ্র হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছিলেন তাহা

উপশম করিবার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

অষ্টম স্তবক

পত্নী-বিয়োগে শরৎচন্দ্র

বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্র বেশী দিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহা স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।

স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল অপূর্ব্ব প্রেমের ভাণ্ডার, তিনি তাঁহার সমস্ত খুলিয়া দান করিয়াছিলেন তাঁহার স্ত্রী শান্তি দেবীকে, কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্য প্রকার থাকায় ঘটনা অন্যরূপ হইল। বিধির বিপাকে বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এ সময়ে তিনি অসহায় অবস্থায় রেঙ্গুন সেবক ও সৎকার সমিতির সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ঘটনাটি সবিশেষ বুঝিবার জন্য এখানে সেবক ও সৎকার সমিতির কিছু পরিচয় আবশ্যক।

বিদেশে আত্মীয় স্বজন অভাবে অনেক গৃহস্থের ঘরে রোগীর সেবা শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত হয় না, কোন মেস্ বা বোর্ডিং-হাউসে একজন সভ্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত

হইলে অধিকাংশ স্থলে অন্যান্য সভ্যরা ভয়ে অন্যত্র চলিয়া যাইতেন, রোগীকে একা অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইত। এখানে কলিকাতার ন্যায় স্বল্পমূল্যে শুশ্রূষাকারিণী নার্শের একান্ত অভাব। মৃতদেহের সৎকারের জন্য ছয় মাইল পথ শব কাঁধে লইয়া শ্মশান ঘাটে যাইতে হইত এবং একটি শবদাহের জন্য প্রায় তিরিশ টাকা ব্যয় হইত। এ সমস্ত কারণে দুঃস্থ, অসহায় ও আর্ত্তের সাহায্যের নিমিত্ত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন সহরে রায় বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু, রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র-মুখার্জ্জি, প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, বসন্তকুমার সরকার ও যজ্ঞেশ্বর কর প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে রেঙ্গুন সেবক ও সৎকার সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। মিঃ পি, সি, সেন এই সমিতির সভাপতি ও মিঃ জে, আর, দাশ, ব্যারিষ্টার (পরে হাইকোর্টের জজ) সহকারী সভাপতি ও আমি সম্পাদক ছিলাম। অনেক সহৃদয় যুবক আর্ত্তের সেবা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বেচ্ছা-সেবকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছিলেন। ডাঃ সুধাংশুমোহন সেন, এম্, বি, অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন এম্, বি, ও ডাঃ নীলমণি দে এম্, বি প্রভৃতি সহরের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ বিনা-পারিশ্রমিকে এই সমিতির রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন।

এই সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সকলেই শিক্ষিত ভদ্র-

সন্তান। তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের আদর্শে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিজেদের জীবন সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন করিয়া অনেক কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ রোগীর সেবা ও সৎকার করায় সমিতির কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই সময় প্রতি মাসে প্রায় ৮।১০টি কেস্ সমিতির হাতে থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে নির্ব্বান্ধব বাঙ্গালীদের মৃত দেহ হাঁসপাতাল হইতে লইয়া সৎকার করিতে হইত।

সমিতির অফিস আমার বাটীতে ছিল। একটি স্বতন্ত্র আলমারিতে সমিতির কাগজপত্র, আইস্ ব্যাগ, হট্ ওয়াটার ব্যাগ, বেড প্যান, ডুস, থার্ম্মোমিটার, ফিডিং কাপ ও প্রতিষেধক ঔষধ পত্রাদি থাকিত।

সমিতির সম্পাদকের পদ অবৈতনিক হইলেও এই কাজে বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সমিতির ডাক্তারদিগকে যথা সময়ে সংবাদ দেওয়া, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা, কোন্ রোগীর বাড়ীতে কখন যাইতে হইবে, রাত্রে কোথায় কতক্ষণ পর্য্যন্ত সেবা করিতে হইবে, কাহাকে বদলী দিয়া আসিতে হইবে এবং কে কে শব লইয়া শ্মশানে যাইবে, এই সমস্ত বিষয় বন্দোবস্ত করা সম্পাদকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত।

রেঙ্গুন সহরে যখন প্রথম প্লেগের উপদ্রব সুরু হইল,

তখন ভগবান সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদিগকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন।

একদিন সকালে শরৎচন্দ্র আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন যে, পাবলিক ওয়ার্কস ষ্টোরের মিঃ হৃদয়কৃষ্ণ রাহার একটি চারি বৎসর বয়স্কা কন্যা প্লেগে মারা গিয়াছে, লোকাভাবে মৃতদেহের এখনও সৎকার হয় নাই।

এই রাহা পরিবারের সহিত আমার পরিচয় ছিল না। শুনিয়াছিলাম ইনি ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্ম যুবক এবং ইঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক প্রধান আচার্য্যের আত্মীয়া। ইনি রেঙ্গুন সহরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটিতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা ও ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিতেন। মিসেস রাহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল বলিয়া এই উপাসনা বাসরে প্রতি সপ্তাহে বহুলোক সমাগত হইত এবং শরৎচন্দ্র সেখানে মধ্যে মধ্যে যাইতেন, কিন্তু তাঁহাদের এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ পাইয়াও কেহ সাহায্য করিতে আসেন নাই বলিয়া তাঁহারা সমিতির দ্বারস্থ হইয়াছেন।

একে প্লেগ কেস্, তাহার উপর বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, সমিতির স্বেচ্ছা-সেবকগণ সকলে অফিসে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া লোকাভাবে আমি স্বয়ং বসন্তবাবু

ও যজ্ঞেশ্বর বাবুকে সঙ্গে লইয়া মিঃ রাহার বাটিতে উপস্থিত হইলাম। এই নবীন স্বার্থত্যাগী কর্ম্মিদ্বয় সমিতির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা যেখানে রোগ, শোক, ব্যথা-জ্বালা, যেখানে আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন সেখানেই নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেন।

আমি মিঃ রাহার বাড়ীর উপরে গিয়া তাঁহাকে আমার পরিচয় দিতে তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমাদের সমিতির অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাজারে ফুল আনতে পাঠিয়েছি, একটু উপাসনার পর মৃত দেহ আপনাদের হাতে দেব।"

ফুল আসিলে তিনি কন্যার দেহটি পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া মুদিত নেত্রে উপাসনায় মগ্ন হইলেন। উপাসনা-শেষে তাঁহার মুখে এই কয়টি কথা শোনা গেল—

"মা বিমলা, স্বর্গে তোমার পিতার জন্য অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই তোমার কাছে যাইতেছি।"

উপাসনা শেষ হইলে আমরা শবটি সৎকারের জন্য লইয়া গেলাম। মর্ম্মান্তিক শোকে মিসেস রাহা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মিঃ রাহা স্নেহময়ী কন্যার অভাব অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় শোকে অভিভূত হইলেন না।

মিঃ রাহার কন্যার শব দাহ করিয়া সন্ধ্যার পর বাটীতে ফিরিয়া শুনিলাম, মিঃ রাহা নিজে প্লেগাক্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার দুই বৎসরের শিশু সন্তানটির ভীষণ জ্বর হইয়াছে। বাসায় একটি মাত্র ভৃত্য ছিল, সে প্লেগ ভয়ে পলাতক। সমস্ত পরিবার সারাদিন উপবাসী আছেন। আত্মীয়-স্বজন বা সহৃদয় প্রতিবেশী অভাবে কেহই তাঁহাদের খোঁজ লয় নাই, কেবল শরৎচন্দ্র কিছু দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ ডাঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেনকে সঙ্গে লইয়া মিঃ রাহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পথে একাউন্-টেণ্ট জেনারেল অফিসের সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ সত্যচরণ গাঙ্গুলীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলাম। সত্যচরণ বাবু সমিতির সভ্য ছিলেন না, তত্রাচ তিনি বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমার অনুরোধ প্রত্যা-খ্যান না করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিলেন এবং সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকিয়া আমার সাহায্য করিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মিঃ রাহার ১০৫ ডিগ্রী জ্বর, বগলে একটি বিওবো গ্ল্যাণ্ড দেখা দিয়াছে, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে ভুল বকিতেছেন।

খোকার জ্বরের উত্তাপে গা পুড়িয়া যাইতেছে। মিসেস রাহার মুখের দিকে চাহিবার যো ছিল না, শোকের ছায়া

পড়িয়া তাঁহার অনশনক্লিষ্ট মুখখানি বিষণ্ণ হইয়াছে, তিনি খোকাকে কোলে করিয়া সংজ্ঞাহীন স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সমিতির সভ্যদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন, অধিক রাত্রে আবার তিনি আসিয়া বিউবোটি অপারেশন করিয়া দিলেন এবং বলিয়া গেলেন রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ নহে।

খোকার চীৎকারে সারা রাত্রি সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। মিঃ গাঙ্গুলী অপরিচিত ভদ্রমহিলার সম্মুখে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে অনভ্যস্ত বলিয়া তিনি রোরুদ্যমান খোকাকে কাঁধে লইয়া সারা রাত্রি বৈঠকখানা ঘরে পায়চারী করিয়া বেড়াইলেন। আর আমি সেই কাল-রাত্রিতে হতবুদ্ধি হইয়া রোগীর মাথায় আইস ব্যাগ ধরা, ঔষধ খাওয়ান, মলমূত্র পরিষ্কার করা এবং ভৃত্য অভাবে পথ্য প্রস্তুত করা, বস্ত্র ধৌত করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই করিলাম। কিন্তু আমাদের সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল। শেষ রাত্রে রোগীর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত দিন রাত্রির অনাহার ও অনিদ্রায় মিসেস রাহা ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্য তন্দ্রাভিভূত হইয়া স্বামীর পদপার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ মিঃ রাহার শ্বাস আরম্ভ হইল এবং কিছুক্ষণ পরে গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল। মিসেস্ রাহা

শশব্যস্তে উঠিয়া দেখিলেন, অন্তিম নিদ্রার ছবি তাঁহার স্বামীর মুখের উপর ভাসিতেছে, বেদনাকাতর ঠোঁটের মৃদু স্পন্দনের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর শেষ করুণ অস্পষ্ট বাণী শুনা গেল—"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।" আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! স্পর্শমাত্রেই বুঝিলাম, মিঃ রাহার আত্মা পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে।

প্রিয়তম স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া মিসেস রাহা মূর্চ্ছিত হইলেন না, এমন কি নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল না! শোকোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। অন্তরের সুগভীর বেদনা শুধু কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ও কথায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিল:—"এতদিনে আমার কপাল পুড়ল, ইনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।"

আমি শোক সম্বরণে অক্ষম হইয়া মুখ ফিরাইলাম। ভাষা নাই, বাস্তবের কঠোরতায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সেবক-সৎকার সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া আমি প্রায় শতাধিক শব দাহ করিয়াছি এবং অনেকের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু মৃত্যুকালে কাহাকেও ভগবানের নাম করিতে শুনি নাই। মিঃ রাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' বলিয়া পরমব্রহ্মের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাদ-পদ্মে আশ্রয় দিবেন।

মিসেস রাহা স্বামীর মৃত্যুতে সংসারের সকল সহায় সম্বল হারাইয়া অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

আমি এতক্ষণ নিজের অবস্থা ভাবিবার বিন্দুমাত্র অবসর পাই নাই। সারা রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় এই ভীষণ ব্যাধির সহিত একা সংগ্রাম করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার অজানিত ভাবে চোখ দুটি নিদ্রায় বুজিয়া আসিতেছিল, এমন সময় খোকার কান্নার স্বরে চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

মিঃ গাঙ্গুলী সকালের ট্রেণেই বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে আমি একা। এই গৃহটিতে মাত্র দুইখানি ছোট ঘর ছিল। এক খানিতে বস্ত্রাচ্ছাদিত শব দেহ শায়িত, তাহারই পার্শ্বে একটি ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্র সন্তান নিদ্রিত, বেচারী গত রাত্রি হইতে উপবাসী। অপরটিতে রুগ্ন শিশু ক্রোড়ে মিসেস রাহা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শুইয়া আছেন। ঘরের চতুর্দ্দিক রোগীর মলমূত্র ও নানা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, বিষাক্ত দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া উঠিতেছিল।

স্থানটি সহর হইতে একটু দূরে, এ অঞ্চলে নিকটে আর বাঙ্গালীর বসতি নাই। মিঃ রাহার মৃত্যু সংবাদ বা তাঁহার সৎকারের ব্যবস্থার কথা সমিতির সভ্যদিগকে বলিয়া পাঠাইব এমন একটিও লোক পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে বেলা নয়টা বাজিয়া গেল; সমিতির

সভ্যগণ সকলেই অফিসে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ রাস্তায় শরৎ-পল্লীর নন্দ মিস্ত্রীকে যাইতে দেখিয়া তাহার হস্তে শরৎচন্দ্রকে এক-খানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলাম। শরৎচন্দ্র আসিয়া আমার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং অফিসে সাহেবের সহিত তাঁহার বনিবনাও না থাকায় ছুটি লইয়া এই সৎকার কার্য্যের সাহায্য করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি অফিস যাইবার পথে এই দুঃসংবাদ সমিতির দুইজন বিশিষ্ট সভ্য রায় বাহাদুর ক্ষেত্র মোহন বসু ও রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়া গিয়াছিলেন। রায় সাহেব আসিয়াই প্রথমে অভুক্ত বড় খোকাটিকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন এবং তাহার পর তিনি ও ক্ষেত্র বাবু আরও দশ পনর জন সমিতির সভ্যকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া চুপে চুপে মিসেস রাহার অজ্ঞাতে মৃত দেহটি সৎকারের জন্য শ্মশানে লইয়া গেলেন। আমি মূর্চ্ছিত মিসেস রাহা ও পীড়িত খোকার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস রাহার সংজ্ঞা হইলে তিনি যথা স্থানে স্বামীর মৃতদেহ দেখিতে না পাইয়া শোকা-বেগে—"ইনি কোথায় গেলেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর অসাড় ও নিশ্চল হইয়া গেল।

এই প্রত্যক্ষ ভীষণ দৃশ্যগুলি আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শুধু তাঁহার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে দিতে বহুক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। বহু কষ্টে তিনি খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া উঠিয়া বসিলেন। ঠিক এই সময় রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের জনৈক ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী বার জন কুলি সঙ্গে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। মিসেস রাহা জিজ্ঞাসা করিলেন— "ওরা কে?"

—"মিউনিসিপালের লোক, ঘর ধুইতে, ধোঁয়া দিতে ও মৃতের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রতে এসেছে।" ইহা শুনিয়া তিনি দু'হাত ও হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"ভগবান এ কি করলে, আমি কোথায় যাব?" আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয় মধ্য হইতে সমস্ত ভয় বিদূরিত হইল—কোন তর্ক যুক্তির আশ্রয় না লইয়া তাঁহাকে বলিলাম— "আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব, সেখানে আমার স্ত্রী ও একটি শিশুকন্যা আছে।"

—"কে আপনি? আপনার এত দয়া পিতার ন্যায় যত্নে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে কাল থেকে আমাদের সেবা ক'রছেন!"

—"মা, আমি সেবক সমিতির সামান্য একজন কর্ম্মী,

রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা ও বিপন্নদের সাহায্য করাই আমাদের ব্রত।"

নিঃস্বার্থ পরোপকারের আনন্দ আছে, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব তৃপ্তির প্রসাদ অনুভূত হয়। ভগবান রামকৃষ্ণ-দেবকে স্মরণ করিয়া আমি প্লেগাক্রান্ত রুগ্ন শিশুটিকে কাঁধে লইলাম এবং শোকার্ত্ত মিসেস রাহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিলাম।

প্লেগ রাক্ষসীর কবলে মিঃ রাহার ও তাঁহার কন্যার পর পর মৃত্যু এবং তাঁহার স্ত্রীর প্লেগাক্রান্ত শিশুসহ আমার বাড়ীতে আশ্রয়লাভের কথা রেঙ্গুন সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সকলেই এই রাহা পরিবারের ও আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বন্ধু বান্ধব সকলে দলে দলে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইবার জন্য আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কেহ বা এই অসমসাহসিকতার জন্য অশেষ প্রশংসা করিলেন, কেহ বা আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিলেন।

শিশুটিকে বাঁচাইবার চেষ্টায় দুই তিন জন অভিজ্ঞ ডাক্তার বিশেষ যত্ন সহকারে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। রায় সাহেব মুখার্জ্জি সেই রাত্রে অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার পরিচিত একটি মাদ্রাজী খৃষ্টান নার্সকে আনিয়া তাঁহার উপর শিশুটির ভার অর্পণ করিলেন, সমিতির কয়েক জন স্বেচ্ছা-সেবক সারারাত্রি তাহার তত্ত্বাবধান করিতে

লাগিলেন। পার্শ্বের ঘরে আমার স্ত্রী মিসেস রাহার যথা সাধ্য সেবা করিতে ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু রাত্রের শেষ ভাগে মিসেস রাহার জ্বর আসিতেছে দেখিয়া ভয়ে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

মিসেস রাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিশু সন্তানটি বাঁচিবে না, আরও বুঝিয়াছিলেন যে, রায় সাহেব মুখার্জ্জি তাঁহার বড় সন্তানটিকে স্থানান্তরিত না করিয়া এখানে আনিলে তাহারও জীবন রক্ষা হইত না, সেইজন্য তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহার কথা উত্থাপন করেন নাই।

শোকে ও দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ক্রমে তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি পাইল ও তিনি সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করিলেন। আমার স্ত্রী একা এই দুইটি রোগীর তত্ত্বাবধানে অক্ষম হইয়া রায় সাহেবের স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে তাঁহার সহিত সেবাশুশ্রূষার কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে পরামর্শ করিতেছিলেন, এই অবসরে মৃত্যু আসিয়া শিশুটিকে নার্সের কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল।

এই বিপদের উপর দুর্ভাবনা আসিল যে, শিশুটির আমার বাটীতেই মৃত্যু হইয়াছে জানিতে পারিলে মিউ-নিসিপ্যালটীর লোক ঐ বাটীর নীচের তলায় আমার আত্মীয়ের "ইণ্ডিয়ান টেলারিং কোম্পানী" নামে যে বহুমূল্য বস্ত্রের দোকান আছে, সংশোধনের সময় তাহার বহুমূল্য বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া দিবে। সেইজন্য প্রমথ

বাবুদের বাসার নীচে যে ফ্ল্যাটটি খালি ছিল, প্রমথবাবু তাহার চাবি ভাঙ্গিয়া ঘরটি অধিকার করিলেন এবং খৃষ্টান নার্সটি মৃত শিশুটিকে সেখানে লইয়া গিয়া একটি টেবলের উপর শোয়াইয়া তাহার মাথার শিয়রে দুইপার্শ্বে দুইটি বাতী জ্বালিয়া দিল।

এই নিদারুণ সংবাদ যখন মিসেস রাহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি মৃত শিশুটিকে দেখিবার জন্য জ্বর গায়ে সেখানে ছুটিয়া গেলেন এবং মৃত দেহটি আবেগের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, অন্য সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। এই শেলসম ভীষণ শোক তাঁহার প্রাণে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহার বর্ণনাই নিষ্প্রয়োজন।

মিসেস রাহা পক্ষাধিক কাল পীড়িত অবস্থায় এই বাটীতেই শয্যাশায়ী ছিলেন। প্রত্যহ আমার স্ত্রী তাঁহাকে পথ্যাদি খাওয়াইয়া আসিতেন। ঐ খৃষ্টান নার্শটির সাহায্যে ও সমিতির প্রধান কর্ম্মী রায় বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু ও প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

মৃত্যুকালে মিঃ রাহার সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না, মিসেস রাহা ও বড় খোকাটিকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য আমি চাঁদা সংগ্রহ করিলাম। সমিতির সহকারী সভাপতি দানশীল মিঃ জে, আর, দাশ একশত টাকা

দিলেন, মিঃ ভি, এন, সিভায়া, ডাঃ পি, কে, মজুমদার, রায় সাহেব মুখার্জ্জি প্রভৃতির নিকট আরও দুই শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম।

উপর্য্যুপরি স্বামী, পুত্র ও কন্যার অকাল মৃত্যুতে শোকে জর্জ্জরিতা মিসেস রাহা বিদায়কালে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমার স্ত্রীর হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন—"স্বর্গের দেবতাকে কত ডাকিয়াও সাড়া পাই নাই, কিন্তু আপনার স্বামী দেবতার মতই আসিয়া আমার স্বামী পুত্রের সেবা করিয়াছেন ও আমার জীবন দান করিয়াছেন।" এই সংবাদটি স্থানীয় ও কলিকাতার বহু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই একটি প্লেগ রোগাক্রান্ত দরিদ্র স্বর্ণকারকে সেবা করিতে গিয়া সমিতির দুইটি স্বেচ্ছাসেবক ঐ নিদারুণ ব্যাধির কবলে পড়িয়া অকালে প্রাণ ত্যাগ করেন! এমন সুসংযত, নির্ভীক সহকর্ম্মীদিগকে হারাইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি বিচলিত হইলাম এবং সমিতির সভ্যগণের মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইল।

এই মহামারীর প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যাগ যজ্ঞ পূজার দ্বারা দৈবকে সন্তুষ্ট করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধে আমরা রেঙ্গুন দুর্গাবাড়ীতে এক শনিবারে ৺রক্ষাকালী পূজার আয়োজন করিলাম। এই দুর্গাবাড়ীটি চট্টগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় নিমাইচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের

চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। তিনি সন ১২৯৬ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বহু অর্থব্যয়ে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশীধাম হইতে ধাতুময়ী দশভুজা মূর্ত্তি আনাইয়া স্থাপিত করিয়াছেন। এখানে মায়ের নিত্য সেবার বন্দোবস্ত ছাড়া প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসবোপলক্ষে রেঙ্গুনে প্রবাসী সমস্ত বাঙ্গালী একত্র হইয়া শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব করিয়া থাকেন।

দুর্গাবাড়ীর চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণগণ শরৎ-পল্লীর জনসাধারণের পৌরোহিত্য করিত। আজ রাত্রে এখানে রক্ষাকালীর পূজা হইবে তাহাদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া শরৎচন্দ্র সস্ত্রীক পূজা দিতে আসিয়াছিলেন।

শরৎদা বিবাহ করিয়াছেন এ কথা শুনাই ছিল, এতদিন বৌদিদিকে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, আজ চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিল।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শরৎদা, তুমি এখানে যে?" শরৎচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন—"পেয়াদায় টেনে এ'নেছে। আমার স্ত্রীর রক্ষাকালী পূজা মানসিক ছিল।"

—"কি উপলক্ষে বৌদিদি পূজা মানসিক করেছিলেন?"

—"তোমাদেরও যে উপলক্ষ আমাদেরও সেই, আমাদের পাড়াতে আজকাল ভীষণ প্লেগের মড়ক লেগেছে। জানই ত, যখন যেখানে মহামারী উপস্থিত

হয়, তখন সেখানকার দরিদ্র পল্লী নিয়েই টান পড়ে। আমাদের পল্লীটি শ্মশানের মত হ'য়ে উঠেছে। কেউ কাহারও মুখে জল দেবার নাই। যারা বেঁচে আছে, তারাও আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় শশব্যস্ত।"

—"তুমিও সহরের দিকে পালিয়ে এসো, শরৎদা। কি সুখেই ও নোংরা পল্লীতে থাক ?"

—"কি ক'রব ভাই, সামান্য মাহিনা পাই, অত টাকা বাড়ী ভাড়া দেব কি ক'রে ?"

তাহার পর শরৎচন্দ্র আমাদের সমিতির উল্লেখ করিয়া দুইটি স্বেচ্ছাসেবকের অকাল মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

শরৎচন্দ্রের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া তিনি সুখেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

সহসা তাঁহার স্ত্রী প্লেগ রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া শয্যা-শায়ী হইলেন। শরৎচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদে আত্ম-হারা হইয়া মনের আবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু তাঁহার পাড়া প্রতিবেশী কেহই নিজেকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা তিনি সেবক-সমিতির সাহায্যের জন্য আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই গিরিন, আমার বড় বিপদ, স্ত্রীর প্লেগ হয়েছে।"

—"কি সর্ব্বনাশ! বল কি, শরৎ দা? কে দেখ্ছে?"

—"এখনও ডাক্তার ডাকতে পারিনি, মাস কাবার, হাতে টাকা কড়ি কিছুই নেই।"

—"ভয় নেই, আমি অপূর্ব্ব ডাক্তার কিংবা ডাক্তার দে কে সঙ্গে নিয়ে এখনই যাচ্ছি।"

—"ভাই, তুমি সৎকার সমিতি ক'রে অনেক পুণ্য সঞ্চয় ক'রেছ, আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর।"

শরৎচন্দ্র গালে হাত দিয়া হতাশভাবে একখানি ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কপাল ভাই, সবই কপাল। যেমন ভাগ্য নিয়ে এ'সেছিলাম,—তাই ত হ'বে।"

আমি সমিতির আল্মারী খুলিয়া রোগীর ব্যবহার্য্য কতকগুলি জিনিষপত্র, কিছু ঔষধ ও অত্যাবশ্যক দু'একটি উপদেশ দিয়া একখানি রিকস গাড়ী ডাকিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখিলাম, রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোষের উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হইতেছে। একটি বৃদ্ধা মুড়িওয়ালী তাঁহার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। প্লেগরোগ যে কি ভীষণ ব্যাধি, তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়া শুধু গল্প শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করা

অসম্ভব। এ পল্লীতে পূর্ব্বে ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে কয়েকবার আসিয়াছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এই প্রথম। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, একটি বড় ঘরকে বেড়া দিয়া ভাগ করা হইয়াছে, ঘরের মধ্যেই রান্না ঘর, স্নানের জায়গা ও পাইখানা—চমৎকার ব্যবস্থা। ঘরে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের বাতি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, পার্শ্বে একটি ছোট টেবলের উপর মোটা মোটা কয়েকখানি বই, একখানি ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ার, একটি গড়গড়া, একটি রেঙ্গুন প্যাটার্ণ কাঠের সিন্ধুক, কাঠের আলনায় কয়েকখানি কাপড়। সামান্য জিনিষপত্রে ঘরটি সাজান, কোন বিলাসিতার চিহ্ন নাই। দেয়ালে কয়েকখানি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারের মধ্যে একখানি রবিঠাকুরের বাঁধান ছবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

রোগিণীর লক্ষণ দ্বারা ডাক্তার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক। আমি কিয়ৎক্ষণ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শরৎচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কাতর ভাব দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্র রোগ শয্যার পার্শ্বে উদাস মনে বসিয়াছিলেন, এমন সময় একবার চকিতের ন্যায় তাঁহার স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—

"দেখ, তোমার অনেক অবাধ্য হ'য়েছি—সে সব আমায় ক্ষমা কর।" শরৎচন্দ্র আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, —"তুমি অমন ক'রে কথা বল্‌লে বড় ভয় পাই যে, শান্তি!"

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ধরা গলায় শান্তি দেবী কহিলেন—"ছিঃ, ভয় কিসের। আমাকে একটু পায়ের ধূলা দাও, আশীর্ব্বাদ কর।"

কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করিবার কিছুই নাই! কিছুতেই কিছু হইল না, শান্তি দেবী সংসারের দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যুবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি বাড়ী ফিরিবার পথে সমিতির দু'একটি স্বেচ্ছা-সেবককে এই সংবাদ দিতে তাঁহারা প্লেগাতঙ্কে বড়ই ভীত হইয়াছেন জানাইলেন, রায় সাহেব মুখার্জ্জি অসুস্থতা নিবন্ধন আসিতে পারিলেন না। সাধারণ বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনের সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেহ—"শরৎবাবু আবার বিয়ে করলেন কবে?" কেহ বা "উনি ত আমাদের সমাজের লোক নন" বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন। হতাশ্বাস হইয়া বাড়ী ফিরিয়া শ্মশান গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান করিলাম এবং বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, মানসিক অবসাদে শরীর বড়ই ক্লান্ত বোধ

হইতেছিল। পরছিদ্রান্বেষী হৃদয়হীন লোকগুলির প্রত্যাখ্যানে ও পরিহাসে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলাম।

এই গভীর রাত্রে এখনই শরৎচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর শবদাহ করিতেই হইবে। শরৎচন্দ্রের বাসা হইতে শ্মশানঘাট প্রায় সাত মাইল দূরে। শববাহী মাত্র আমি ও শরৎচন্দ্র, কি উপায় হইবে ভাবিয়া দিশাহারা হইলাম।

দেখিতে দেখিতে উন্মত্তের ন্যায় শরৎচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চেহারা মলিন, মাথার চুল এলোমেলো, চরণদ্বয় নগ্ন, কণ্ঠস্বর রুক্ষ, বলিলেন—"ভাই, কোথায় সে চলে গেল, এক দণ্ডে যেন একটা প্রলয় হ'য়ে গেল। কে কে শ্মশানে যাবে কিছু বন্দোবস্ত হ'ল কি?"

আমি সমিতির সভ্যগণের অবস্থা জানাইয়া বলিলাম—

"শরৎদা, যদি ভদ্রপল্লীতে তোমার বাস হ'ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকত, তা'হলে আজ ভাবতে হ'ত না। অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জন বন্ধু-বান্ধব তোমার স্ত্রীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যেত, কিন্তু তুমি কখনও তাদের সঙ্গে মেশনি, তোমার বিবাহিত জীবনের কথা অনেকে জানেই না।"

শরৎচন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল, হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে যেন তড়িত স্রোত বহিতে লাগিল। বুঝিলাম এ সময়ে

এ কথাটি না তুলিলেই ভাল হইত। কথাটিতে তিনি এত ব্যথা পাইবেন ভাবিবার অবসর পাই নাই।

আমি একা শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাড়ীতে চলিলাম। এই পথে তখন জনপ্রাণীরও সমাগম ছিল না।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তাহার চারিধারে অজস্র মিট্‌মিটে তারা। রাত্রি অনেক হইয়াছে, শ্রান্ত প্রকৃতি নিঝুম, যেন কর্ম্মক্লান্ত দেহখানি অবশ হইয়া পড়িয়াছে। দূরে কুলী বস্তির দু'একটি বাড়ী হইতে অস্পষ্ট বুক ভাঙ্গা কান্নার রোল শুনা যাইতেছিল। শরৎচন্দ্রের চেহারা পাগলের মত, দৃষ্টি উদাস, কথা অসংলগ্ন।

বারাণ্ডার এক পার্শ্বে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর 'ভেলো' সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া মাথা গুঁজিয়া অসাড়ের মত শুইয়াছিল, অন্ধকারে ইহার চোখ দুটি নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছিল। এতক্ষণে এই জন্তুটিকে শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন। ভেলো শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া অস্বাভাবিক ক্রন্দন করিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এই জন্তুটিও কি তাঁহার এই সর্ব্বনাশে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে? কোন্‌ ইন্দ্রিয় দিয়া এই অবোধ জীব তাঁহার অন্তরের ভাষা বুঝিতে পারিল?

তাহার পর শরৎচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া শবদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন এবং "ওগো, কোথা গেলে গো! তুমি যে আমার সকল অবস্থার সাথী ছিলে"

বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিদারুণ শোকে তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহই এই প্লেগ রোগীর শবদাহ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না দেখিয়া, এই অবস্থা সঙ্কটে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলাম। তারপর একবার শবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শরৎচন্দ্রের বিষাদ দৃষ্টি ও আকুল আবেদনের কথা মনে পড়িল। অগত্যা একখানি কুরঙ্গী, কুলিদের মানুষটানা ঠেলাগাড়ী ভাড়া করিয়া দুইজনে অতি কষ্টে ধরাধরি করিয়া তাহাতে শবদেহ তুলিয়া শ্মশানে লইয়া গেলাম।

নদী তীরে এই শ্মশানের সন্নিকটে এক মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় ছিল না। এই গভীর নিঃস্তব্ধ নিশীথে বিজন শ্মশানের মধ্যে আমাদের পাহারা দিবার জন্য গাড়ীওয়ালা কুলি দুইটিকে রক্ষী নিযুক্ত করিলাম।

পদব্রজে শ্মশানে পৌঁছিয়াই শরৎচন্দ্র কয়েক রাত্রি জাগরণের ফলে অসুস্থতা বোধ করিয়া ক্লান্তিজনিত অবসাদে একটি চাতালের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। শত সহস্র চিন্তা আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

এই শ্মশানে চিতা শয্যার কাষ্ঠ ভিন্ন সৎকারের অন্যান্য উপকরণ সমস্তই সঙ্গে লইয়া আসিতে হয়, কিন্তু লোকাভাবে আমরা শুধু একটি মাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠন সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার এই শ্মশানে আসিয়াছি, বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে এখানে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছি, কত দিনের গভীর দুঃখের স্মৃতি এই স্থানে জড়িত আছে, কিন্তু আজ আমি একা। একা বলিয়াই এই নীরব নিশীথে জোৎস্নাময়ী নদী-সৈকতে বসিয়া আত্মচিন্তা করিবার সুযোগ পাইলাম, ভাবিলাম—অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন বিশ্বশিল্পীর সমস্ত সৃষ্টিই অত্যদ্ভুত, তন্মধ্যে মৃত্যু কি ভয়ানক শব্দ! যে শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই সমস্ত আমোদ কোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়, রিপুগণ কম্পিত কলেবরে হাহাকার করে, কুটিল কামনা সকল আর্ত্তনাদ করিয়া মন হইতে অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল নাই। কিরূপে সেদিন দেখিতে দেখিতে রাহা পরিবারের সাজান বাগান শুকাইয়া গেল, সেবক সমিতির পরোপকারী স্বেচ্ছাসেবক দু'টিকে তাহাদের বৃদ্ধ পিতামাতার ক্রোড় হইতে অকাল মৃত্যু কিরূপে অপহরণ করিল, নব বিবাহিত শরৎ-দম্পতির পরস্পর প্রণয়ের পূর্ণ পরিণতি হইতে না হইতেই মৃত্যু তাহাদিগের একটিকে অপরের আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিল! যে দুঃসাহসিক সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, কে জানে—আজি হউক, কালই হউক, দশ দিন পরেই হউক হয়ত অকস্মাৎ একদিন প্লেগ রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া এই শ্মশানক্ষেত্রে আসিতে হইবে।

কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য এই জীবন?

অনন্ত কোটি তারকা খচিত নীলাকাশের তলে নীরব শ্মশানে বন্ধু পত্নীর শব দেহের পার্শ্বে বসিয়া নিজ মনে প্রশ্ন করিলাম—আমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছার মধ্যে এখন কোন বাসনাটি অত্যন্ত প্রবল? কোন সাধটি অপূর্ণ থাকিলে মরিয়াও সুখ পাইব না। মনের মধ্যে সুপ্ত পৃথিবী ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, মনে হইল বিশ্ব-শিল্পীর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে যত নদ, নদী, গিরি, প্রস্রবণ, জল-প্রপাত, হ্রদ, মহাসমুদ্র, মরুভুমি, আগ্নেয়গিরি, বিভিন্ন দেশ ও নরনারীর আবাসস্থল আছে তাহা দেখিয়া তবে মরিব। এই দিনে এই শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়াই আমার ভূ-পর্য্যটনের সঙ্কল্প স্থির হইল।

এই সময়ে শ্মশানমধ্যে কে মধুর কণ্ঠে গাহিল ঃ—

"আমিই শুধু রইনু বাকী।
যা ছিল তা চলে গেল, রইল যা তা কেবল ফাঁকি॥
বল দেখি মা! সুধাই তোরে
আমার কিছুই রাখলিনিরে
আমি শুধু আমায় নিয়ে কোন প্রাণে মা বেঁচে থাকি॥"

বুঝিলাম ইহা পূর্ব্ব পরিচিত শ্মশান-বাসী 'উদাসী বাবাজীর' কণ্ঠস্বর।

শ্মশান-তট ধৌত করিয়া ইরাবতী নদী সাগরাভিমুখে

চলিয়া যাইতেছে। শূন্য বায়ু হো হো করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে শবভুক জন্তু-জানোয়ার কলরব করিতেছিল। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তিনি শোকাবেগে চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন—"শান্তি, প্রাণের শান্তি! আমার যে আর কেউ নেই, বুক যে একেবারে শূন্য করে চলে গেছ! শান্তিহীন জগতে থেকে লাভ কি? এ যে অসহ্য জ্বালা! হা ভগবান, তুমি না মঙ্গলময়—তবে তোমার এ রাজত্বে এত অবিচার কেন। শান্তিকে হারাতে হয় কেন? কোন্ পাপে বুকে এ শেল বিদ্ধ ক'রলে?"

শরৎচন্দ্রের ব্যথাহত বক্ষ হইতে করুণ ভাষায় এই মর্ম্মন্তুদবাণী উঠিয়া দিগন্ত ভাসাইয়া দিল। কেহ তাহার উত্তর করিল না। আমার সান্ত্বনা বাক্যে তিনি আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই জনমানবশূন্য শ্মশানে মধ্যে মধ্যে একটি ভাব-পাগল সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করিতেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে উদাসী বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতাম। বাবাজীর মুখে অনেক অর্থযুক্ত তত্ত্বকথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইত। তাঁহার কণ্ঠে শ্মশান-সঙ্গীত শুনিয়া মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইত।

আমাকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া বাবাজী সুন্দররূপে চিতা

সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, শরৎচন্দ্র ও আমি শব দেহ চিতায় তুলিয়া অগ্নিসংযোগ করায় মুহূর্ত্তমধ্যে সে বহ্নি গগনমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। বাবাজী তাহার পর নদী হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া চিতা নির্ব্বাণ করিতে করিতে গাহিলেন :—

"খেলার ছলে হরি ঠাকুর,
গড়েছেন এই জগতখানা ;
চারদিকে সব খেলার মেলা,
খেলা শুধু আনাগোনা।
খেল্‌তে খেলা ভবের হাটে,
কোথেকে সব মানুষ জোটে,
খানিক খেলে খেল্‌না ফেলে,
কোথায় পালায় যায় না জানা।"

শরৎচন্দ্রকে শোকে অধীর দেখিয়া তিনি বলিলেন—"বাবা! বিরাটের চিন্তা কর, সান্ত্বনা পাবে, 'জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুঃ'।

'জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে!'

বাবা! কখন আত্ম চিন্তা ক'রেছ কি ? এ সংসারটা একটা দোল্‌না। মা আমাদের দোল দিচ্ছেন নিয়ত—জন্ম ও মৃত্যু—এ পাশ আর ও পাশ। একবার মা জীবনরূপ দোল্‌না দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন, আবার

মৃত্যুরূপ দোল্‌না দিয়ে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—কর্ম্মক্ষয় না হ'লে আবার পাঠাচ্ছেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত দেহের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। দেখ্‌লে ত উলঙ্গ এ'সেছিল, উলঙ্গ চলে গেল, একা এ'সেছিল, একাই গেল, আসবার সময় যে দেহটি সঙ্গে এনেছিল সেইটিও সঙ্গে গেল না! অগ্নি সংযোগে কেমন ধীরে ধীরে পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেল! যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু সঞ্চিত থাকে তাহাই আত্মার সহগামী হ'য়েছে।"

এই সময়ে শরৎচন্দ্র গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন দেখিয়া, বাবাজী বলিলেন—"কি ছাই গালে হাত দিয়ে বসে চিন্তা করছ? তার চেয়ে একটু গুণ গুণ করে দেখ দেখি গানে মজাটা কি? সুর হ'ল না—ব'য়ে গেল, কেউ শুনলে না—ব'য়ে গেল, তুমি নিজে শুন আর শোনাও তাঁকে, যিনি বিশ্বসঙ্গীত শোনবার জন্য এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। যাঁর মহিমা-গীতি নানা ছন্দে, নানা ভাবে দেব, মানব, বিহগ, কীট পতঙ্গ, ঝিঁঝিঁ পোকা প্রভৃতি মনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে দিবানিশি গান ক'রছে।

গাও :—

'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
অসীম সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগত মন্দিরে'।

বাবাজী ওই দু'লাইন গান গাহিতেছেন আর পায়চারী

করিতেছেন। এক একবার গান গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া আকুল, আওয়াজ যেন আর বাহির হয় না। ভোর পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই কাটিল। বাবাজীর একটু করকোষ্ঠি জ্ঞান ছিল, তিনি শরৎচন্দ্রের হাতের রেখা কয়টি দেখিয়া বলিলেন— "বাবা, আবার তোমায় সংসার করতে হ'বে।"

সাধু সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তিনি বুকভরা জ্বালা লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

এই রাত্রের স্মৃতি এখনও আমার মনে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

শরৎচন্দ্র স্ত্রীর জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি দুর্গাবাড়ীতে যথারীতি স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে শুনিলাম, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণটিও অত্যন্ত দুঃখের। কোন প্লেগ রোগগ্রস্তা দরিদ্র প্রতিবেশিনীর সেবা করিতে গিয়া তিনি নিজে বিপন্ন হইয়াছিলেন।

এই ঘটনায় শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি ঐ কদর্য্য পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে কয়েকটি বন্ধু-বান্ধবের সহিত একত্রে বাসা করিয়াছিলেন। শ্মশানের সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণী বিফল হয় নাই। দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬ নং গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক

বৎসর ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, দুইটি কুকুর ও কয়েকটি পক্ষীশাবক তাঁহার অপত্য স্নেহের অধিকারী হইয়াছিল।

নবম স্তবক

মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র

দান ও পরোপকার শরৎচন্দ্রের একটি প্রধান গুণ ছিল। অবস্থা স্বচ্ছল না থাকিলেও তিনি মুক্তহস্ত ও উদার ছিলেন। একবার জনৈক বন্ধুর জামিন হওয়ায় কোন চেটীর পাঁচ শত টাকার ঋণ তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছিল। দুই বন্ধুতে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বন্ধুটি পলাতক হওয়ায় চেটী তাঁহার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায়ের সংকল্প করিলে তিনি ভীত হইয়া পড়েন।

এই চেটী সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের মাদুরা ও রামেশ্বর অঞ্চলের লোক, ইহারা প্রকৃতই ধনকুবের। সমগ্র ব্রহ্মদেশে ইহাদের শতকোটি টাকার উপর তেজারতী কারবারে খাটিতেছে। আমেরিকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য যেরূপ নিউইয়র্ক সহরের ওয়াল ষ্ট্রীটের ধনকুবেরদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেরূপ বর্ম্মাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য রেঙ্গুন সহরের মোগল ষ্ট্রীটের চেটী ধনকুবেরদিগের হস্তগত। ইহারা হাত গুটাইলে একদিনের মধ্যেই সমগ্র দেশের কারবার কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রভূত ধনের অধিকারী করিয়াও বিধাতা ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখে

বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহারা স্বল্প গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট ও সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা-বর্জ্জিত, কিরূপে চক্রবৃদ্ধির হারে টাকা বৃদ্ধি পাইবে ইহারা দিবানিশি সেই চিন্তায় মগ্ন। সুদে টাকা খাটাইবার ইহারা এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল জানে, যাহার ফলে প্রতি দশবৎসর অন্তর ইহাদের মূলধন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেক কোটিপতি আছে। এই আত্মবঞ্চনাকারী অর্থপিশাচ কুসীদ-জীবীর দল বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্র পরের গলার ফাঁস নিজে গ্রহণ করিয়া ঐ চেটীর ভয়ে আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শরৎচন্দ্রের মহাজন চেটীটির নাম 'আনা-মুনা-কাঁণা পালিয়ানাপ্পা চেটী'। নামের বিশেষত্ব শুনিয়া আমার স্মরণ হইল যে, এই চেটীটি আমার বন্ধু মোগল ষ্ট্রীটের গুজরাটী ধনকুবের ডাঃ পি, জে, মেঠার ব্যাঙ্কার। শরৎচন্দ্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাঃ মেঠা কে?" আমি বলিলাম—"ডাঃ মেঠা একজন গুজরাটী ব্যারিষ্টার ও এম, ডি, ডাক্তার, কিন্তু তিনি ডাক্তারী বা ব্যারিষ্টারী করেন না, শুধু হীরা জহরতের ব্যবসায়ে বহু লক্ষপতি হ'য়েছেন। ইনি মহাত্মা গান্ধীর সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ডায়েরীর একখানি কপি প্রতি সপ্তাহে ডাঃ মেঠার কাছে পাঠান। আমি অনেকবার

সেই ডায়েরি পড়েছি। এরূপ শিক্ষিত স্বদেশবৎসল, হৃদয়বান ও দয়ালু লোক ইতিপূর্ব্বে আমি দেখি নাই। তিনি তাঁহার থিংঙ্গাজুনের বাগানে অনেকগুলি খদ্দর তৈয়ার ক'রবার উন্নত প্রণালীর তাঁত বসিয়ে অসহায় যুবকদিগকে স্বল্প পারিশ্রমিকে খদ্দর বয়ন শিক্ষা দেন। নিজ পরিবারবর্গ বহুদিন যাবৎ খদ্দর ব্যবহার করেন। ইনি তিলক স্বরাজ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা, গুজরাট বিদ্যা-পীঠে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন বিল্ডিং ফণ্ডে এক হাজার টাকা দান ক'রেছেন।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "তোমার সঙ্গে এঁর আলাপ হ'ল কি করে ?"

আমি বলিলাম, "মিঃ পোলক সাউথ আফ্রিকা থেকে যখন রেঙ্গুনে এসেছিলেন তখন আমি ডাঃ মেঠার হাত দিয়ে সেখানকার জন্য কিছু চাঁদা তুলে দিয়েছিলাম, তা ছাড়া উনি রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ও আমি ভাইস প্রেসিডেণ্ট।"

—"তোমার বাহাদুরী আছে, জৈন ধনকুবেরকে রামকৃষ্ণ ভজার দলে ভিড়িয়েছ ?"

—"এতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই, স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজের মুখে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম্ম' বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনে ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে প্রথমে সোসাইটির সভ্য হ'য়েছিলেন, পরে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন"।

—"ভাই, তুমি ডাঃ মেঠাকে দিয়ে আমার চেটীকে একটু বলিও, যাতে সে আমার নামে নালিশ না করে।"

—"ভয় নেই, আমি ডাঃ মেঠার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব ও যাতে একটা মিটমাট হয় তার চেষ্টা ক'রব। ডাঃ মেঠা ক'দিন খুব ব্যস্ত আছেন, শুনেছ বোধ হয় মহাত্মা গান্ধী কাল ভোরে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছাবেন ও ডাঃ মেঠার বাড়ীতে পনর দিন থাকবেন।"

—"যদি এর মধ্যে চেটী নালিশ করে দেয়?"

—"আচ্ছা, তুমি আজ অফিসের ফেরৎ বৈকালে লুইস ষ্ট্রীট জেটীতে একবার এ'সো।"

"কেন জেটীতে কি হ'বে?"

—"মিঃ জামালের একান্ত ইচ্ছা যে, মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর ষ্টীম লঞ্চে করে জাহাজ থেকে নামিয়ে এনে লুইস ষ্ট্রীট জেটীতে তুলবেন। সেই জন্য পোর্ট কমিশনারদের কাছ থেকে ঐ জেটীটি চেয়ে নেওয়া হ'য়েছে। আমাকে রকমারি নিশান ও ফুল পাতা দিয়ে ঐ জেটীটি আজ রাত্রের মধ্যেই সাজিয়ে রাখতে হ'বে। এটি দেখবার জন্য মিঃ জামাল, মিঃ সেন, মিঃ দাশ ও ডাঃ মেঠা প্রভৃতি অনেকেই বৈকালে জেটিতে আসবেন।"

—"এটি কি তোমার কনট্রাক্টারীর কাজ, না বেগার?"

—"বেগার, শরৎদা, আমিও যে একজন কমিটির সভ্য।"

—"তোমার উপর আর কি কাজের ভার আছে ?"

—"সাধারণ অভ্যর্থনা, সভা-সমিতির বন্দোবস্ত ও সংবাদপত্রে রিপোর্ট পাঠান।"

—"খবরের কাগজের রিপোর্টগুলো লিখে দিয়ে আমি তোমার সাহায্য করতে পারি।"

—"তা ক'রলে ত আমার ঢের উপকার হবে।"

আমি স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা অভিনব, বিচিত্র ভাবে এই জেটিটি সাজাইয়া ছিলাম। ডাঃ মেঠা সন্ধ্যার পর আসিলে তাঁহার সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলাম, কিন্তু সময়াভাবে আসল কথা উত্থাপন করিবার সুযোগ হইল না। ডাঃ মেঠা বলিলেন—"Mr. Sircar, you have very artistically decorated the wharf where Mahatma Gandhi will spend only a few minutes, but you have paid no attention to my house where he is going to stay for a fortnight."

আমি—Other committe members are all sitting idle, how can I manage to look after so many things alone.

ডাঃ মেঠা—Everyone is not Mr. G. N. Sircar who possesses such a gifted power, so we have entrusted you with all the important

work in connection with Mahatma Gandhi's reception.

তারপর আমি শরৎচন্দ্রকে লইয়া ডাঃ মেঠার গাড়ীতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। ডাঃ মেঠা মোটর গাড়ীর পরিবর্ত্তে ফিটন গাড়ী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার গৃহের বহুমূল্য আসবাবপত্র সমস্তই দেশী কারিগর দ্বারা প্রস্তুত, উহার সাজসজ্জা যা কিছু সমস্তই খদ্দর দিয়া মোড়া। ধনীর গৃহের দ্বারে মূল্যবান ক্রেটনের পর্দ্দার স্থলে খদ্দরের পর্দ্দা, গবাক্ষে বর্ডার ও কুঁচি দেওয়া সূক্ষ্ম বিলাতী স্ক্রীনের পরিবর্ত্তে খদ্দরের স্ক্রীন, শয্যায় শীটিংএর পরিবর্ত্তে খদ্দরের চাদর, টেবলে খদ্দরের টেবল ক্লথ, ইলেক্ট্রীক পাখার পরিবর্ত্তে টানা পাখা। কক্ষের এমন কোন স্থল দৃষ্টিগোচর হইল না, যেখানে বিলাতী বস্ত্র খদ্দরের দ্বারা অপসারিত হয় নাই।

শরৎচন্দ্র এই সমস্ত দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন ও বলিলেন—"এরূপ স্বদেশপ্রেমিক না হ'লে কি মহাত্মা-জীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে পারেন।"

উপরে গিয়া দেখিলাম, মহাত্মার আগমন উপলক্ষে কক্ষগুলির যেখানে যাহা প্রয়োজন সমস্তই দেওয়া হইয়াছে, কেবল ড্রইং রুমটিতে কয়েকখানি ছবির অভাব। আমি সেদিকে ডাঃ মেঠার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি একটি দেওয়ালের উপর ব্যারিষ্টারের গাউন পরিহিত

মহাত্মা গান্ধীর ছোট একখানি ছবি দেখাইয়া বলিলেন—"That is the only picture worth keeping in the house. I don't care for any other pictures."

এ কথাটি শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। মহাত্মার খ্যাতি প্রতিপত্তি তখন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এ দেশে তাঁহার নাম যশ তত বিস্তার লাভ করে নাই বলিয়া তিনি ডাঃ মেঠাকে বলিলেন—"Don't be so partial, Dr. Mehta, there are other noble sons of India of whom we can be proud, especially I mean Swami Vivekananda."

ডাঃ মেঠা—I know the Swami as an intellectual, a great scholar and orator, a patriotic Hindu and powerful preacher of the Vedanta.

শরৎচন্দ্র—That is knowing only one phase of his many-sided genius. What is your opinion about Messers Tilak, Gokhale, Lajpatrai and Rabindranath Tagore ?

ডাঃ মেঠা—It is a delight to know all of them. I have no objection, Mr. Chatterjee, to keep pictures of such patriots who have

sacrificed their lives and have genuine love for the country.

কথা প্রসঙ্গে ডাঃ মেঠা বলিলেন—"আমাদের জাতীয় শক্তি উচ্চতর কার্য্যে না লাগাইয়া বৃথা তুচ্ছ জিনিষে অপব্যয় করিতেছি। তাহার পর তিনি আত্মোৎসর্গে মহাত্মা গান্ধীকে যীশু খৃষ্টের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার বিশ্বপ্রেম, সত্যপ্রিয়তা ও অদ্ভুত সমদর্শিতার স্তুতিবাদ করিয়া বলিলেন—"We will have that saint amongst us to-morrow. I have invited some selected friends to dine with Mahatma Gandhi, at my house to-morrow evening and shall be glad if you both join with us on the occasion."

ডাঃ মেঠার সৌজন্যে শরৎচন্দ্রের হৃদয় তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল। আমি সঙ্গীতানুরাগী ডাঃ মেঠাকে একখানি ভজন গান শুনাইবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার ড্রইং রুমে বসিয়া নিম্নোক্ত হিন্দী গানটি গাহিলেন :—

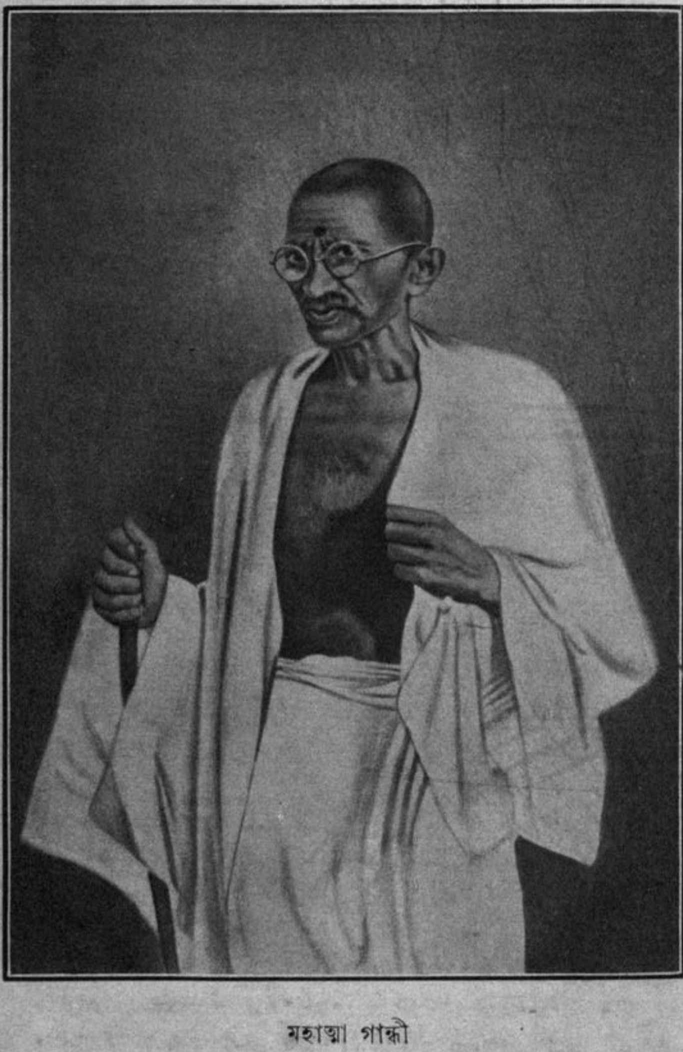
ভক্তি হরিকো নেহি কিয়া তো কেয়া কিয়া কুছ্ ভি নেহি।
নাম প্রভু কো নেহি লিয়া তো কেয়া লিয়া কুছ্ ভি নেহি॥
শিখ্ কর্ বিদ্যা বহুত সে বাদশাওঁ সে মিলা,
শ্যামসুন্দর সে মিলা নেহি তো মিলা কুছভি নেহি॥

তান টপ্পে আউর ঠুংরী গায়ে সারা জগৎ কো,
গুণ না গায়া কৃষ্ণকে তো কেয়া গায়া কুছ্ ভি নেহি ॥
নারী ও সে পিয়ার করকে যো পিয়া অধরোঁকে রস,
শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-রস নেহি পিয়া তো কেয়া পিয়া কুছভি নেহি॥
পায়কে নরতনু গুরু শরণমে যো নেহি আয়া জিউ
এ জগ্ মে জীবনকে যশ কেয়া পায়া কুছ্ ভি নেহি ॥

ডাঃ মেঠার বাটির মহিলাদিগের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা না থাকায় তাঁহারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই গানটি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। রাত্রে ফিরিবার সময় শরৎচন্দ্রের বিপদের কথা ডাঃ মেঠাকে বলায় তিনি তাঁহার চেটীর সহিত একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে সকল সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে গিয়া লুইস্ ষ্ট্রীট জেটিতে সমবেত হয় এবং অসংখ্য লোক কোলাহল মুখরিত জয়ধ্বনি গর্জ্জিত রাজপথ দিয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে মহাত্মা গান্ধীকে ডাঃ মেঠার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্ম্মী বন্ধু ও ইউনাইটেড বর্ম্মা পত্রিকার এডিটার মিঃ ভি, মদনজিতের উদ্যোগে পথে কয়েক সহস্র মহাত্মা গান্ধী ও মিসেস গান্ধীর ফটো সম্বলিত গোলাপী রংয়ের রেশমী রুমাল বিতরণ করা হইয়াছিল।

সেই দিন অপরাহ্নে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত



মহাত্মা গান্ধী

নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা ডাঃ মেঠার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অন্য সময় হইলে শরৎচন্দ্র কিছুতেই এ বাটির ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতেন না, কিন্তু আজ তিনি নিজের গরজে আসিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ডাঃ মেঠার সহিত সম্মুখস্থ উদ্যানে পায়চারী করিতেছিলেন। ডাঃ মেঠা আমাকে কর্ম্মী স্বদেশসেবক বলিয়া মহাত্মার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখনকার সামান্য আলাপে তাঁহার অপূর্ব্ব হাসিটুকু ও ঐকান্তিক সরলতায় আমার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপাসনা আরম্ভ হইল। মিঃ মদনজিত শরৎচন্দ্রকে একখানি ভজন গান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সম্মুখীন হইলেন না। জনৈক গুজরাটি ভক্ত একখানি গুজরাটি ভজন গান করিবার পর মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনার উপকারিতা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলেন।*

---

* (a) Every human being stands in need of prayer and therefore everybody does pray in some form or other. Any thought of God with expressed or unexpressed wish for the fulfilment of one's desires may be termed as prayer.

(b) The fact of God's being an all-wise, omnipotent and loving Father does not make prayer

এই সারগর্ভ উপদেশ বাক্যগুলি শুনিয়া শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য সকলেই আনন্দিত হইলেন।

কিছুক্ষণ উপাসনার পর আর একটি সঙ্গীত হইলে উপাসনা শেষ হইল।

সান্ধ্য ভোজের ডাক পড়িলে আমরা সকলে খাবার দালানে উপস্থিত হইয়া গুজরাটী ভোজের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একখানি কাঠের পিঁড়ি, সম্মুখে একটি বড় চৌকির উপর একখানি বড় থালা ও দুইটি বাটি দেওয়া আছে। প্রত্যেকের বাম

---

unnecessary. What father is there who does not wish to hear the needs of his children from their own lips inspite of his knowledge of them (the needs) ? God loves to hear the petitions of His children and answers their prayers.

(c) Prayer is the means of receiving spiritual power from God. This can be done by realising the presence of God and holding close communion with Him. By this communion with the deity the devotee becomes attached to him and begins to imbibe in some measure the attributes of the Devine i. e, patience, love, sympathy, righteousness and holiness and at the same time gets detached from the world, i. e. selfishness, greed, impurity, lust and all carnal desires. But this cannot be done uuless one believes *n the* goodness, love and power of God.

পার্শ্বে একটি করিয়া স্বতন্ত্র জলের কুঁজা ও তাহার উপর একটি গেলাস রাখা হইয়াছে। মহাত্মাজী ও ডাঃ মেঠা একধারে পাশাপাশি বসিলেন, তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে আমরা সারি সারি বসিলাম। শরৎচন্দ্র ঠিক আমার বামপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। মিসেস মেঠা যত্নের সহিত স্বহস্তে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য পরিবেষণ করিলেন। তাঁহাদের দেশাচার কিম্বা তাঁহার নিজের অভ্যাস দোষেই হউক, তিনি প্রথমে সকলের থালাতে বাম হস্তের দ্বারা তুলিয়া দুইখানি করিয়া রুটি দিলেন। ঐ রুটির উপর পড়িল এক হাতা গরম ঘি, তাহার পর ভাজি, পকোড়া, ঘিয়ে

The following things are essential in prayer.

(I) Faith in God's grace and love.

(2) Entire surrender to His will.

(3) Confession of sins.

(4) Strong desire and honest resolution to forsake sins.

(5) Complete unselfishness.

(6) Making friends with those whom one has harmed in any way by confession and restitution etc.

From the above statements it is clear that prayer does not consist in begging for worldly and material things, i. e. riches, wealth, fame etc., but it is an endeavour to secure the fellowship of the Param-pita God. By prayer we are taught to rule our lives according to the will of God.'

সিদ্ধ তরকারী, দুধ-পাক (মেওয়া ও জাফরাণ মিশ্রিত ক্ষীর)।.........সর্ব্বশেষে এক মুঠা ভাত ও একহাতা ডাল।

মিসেস মেঠা বাম হস্তে রুটি দিলেন দেখিয়া শরৎচন্দ্র হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন, সে রুটি স্পর্শ করিলেন না। মহাত্মা গান্ধী দুধ ও ফল খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিলেন, সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে ব্যস্ত ছিল, কেহই শরৎচন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই।

পথে আমি শরৎচন্দ্রের ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"ভাই, একে স্ত্রীলোক, আবার বাঁহাতে দেওয়া রুটি খেতে আমার মোটেই প্রবৃত্তি হ'ল না। মনে বড় বিঘ্ন আসায় শুধু দুবাটি দুধ-পাক চেয়ে খেলাম, জিনিষটা বেশ হে!"

মহাত্মার সম্মানার্থ ডাঃ মেঠা আর একদিন নিজের বাড়ীতে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। আমি সপরিবারে এই ভোজে যোগদান করিয়াছিলাম। শরৎচন্দ্রের নিমন্ত্রণ পত্র ডাকে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেদিন আসেন নাই।

রেঙ্গুন ভিক্টোরিয়া হলে এক বিরাট জনসভায় মহাত্মা গান্ধীকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় তাহার রিপোর্ট বহু সংবাদপত্রে নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের লিখিত রিপোর্টটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখের রেঙ্গুন গেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

PUBLIC RECEPTION TO Mr. GANDHI.

The Victoria Hall was filled to its utmost capacity on Tuesday evening on the occasion of the public reception to Mr. M. K. Gandhi. Every inch of standing room in the body of the hall, on the stage and in the gallaries was occupied and great enthusiasm prevailed throughout the proceedings.

The Hon. U. Hpay was in the chair and those present included Mrs. Gandhi and family, Dr. P. J. Mehta, the Hon. Mr. M. Cowasjee, Messers P. C. Sen., J. R. Das, A. K. S. Jamal, Dr. Parakh, V. N. Sivaya, Municipal Commissioners, Members of the Bar and leaders of the various communities in town.

On the arrival of Mr. Gandhi there were greetings of 'Bande Mataram'. Mr. S. B.

Gupta sang 'Namo-Hindustan' which was followed by a Gujrati song by Mr. V. Shastri. After the chairman's opening address Mr. U. Ba Thein, Bar-at-law, read the address of welcome amidst loud cheering.

Mr. Gandhi was then presented with a silver casket in which was enclosed the address. Mr. and Mrs. Gandhi were after this garlanded by Mr. G. N. Sircar.

Mr. Gandhi, in responding, said that, if this address by the citizens of Rangoon was flattering to his vanity it was for him to return an adequate reply to it. He felt the difficulty he had to contend against was that he had to speak to a composite audience in a tongue which was foreign to them. The speaker said that he held a certificate from late Mr. Gokhale and it was on that account that he had gone out and done something in South Africa. The speaker eventually asked the audience to follow the message Mr. Gokhale had left and endeavour

to lead lives of self-denial for the good of their countrymen. (Loud applause). Mr. P. C. Sen then proposed a vote of thanks to the chair. The whole proceedings were terminated with the singing of 'Bande Mataram' by Mr. S. B. Gupta.

মহাত্মা গান্ধী মহামান্য গোখেলকে এত সম্মান করিতেন শুনিয়া শরৎচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন —"গান্ধীজীর বেশ সুন্দর নামটি হে। মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী, কিন্তু চেহারাটি মোটেই সুবিধার নয়।"

পরদিন মহাত্মা গান্ধীর সম্মানার্থ জুবিলী হলে একটি গার্ডেন পার্টিতে প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই দিন শরৎচন্দ্র মিঃ মদনজিতের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া ৮।১০ প্লেট আইসক্রীম খাইয়াছিলেন।

মহাত্মাজী চলিয়া যাইবার পর একদিন ডাঃ মেঠা তাঁহার চেটী ও শরৎচন্দ্রকে নিজের অফিসে ডাকাইয়া শরৎচন্দ্রের গোলমাল মিটাইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র মাত্র ২৫০৲ টাকা দিয়া ৫০০৲ টাকার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এই টাকা শরৎচন্দ্রের গান-মুগ্ধ রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি তাঁহাকে ধার দিয়া বলিলেন—"শরৎ দা, তোমার যখন সুবিধা হবে এই টাকা শোধ দিও।" রায় সাহেব একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার উদার

স্বভাব, চরিত্রবল ও দয়ার জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার অনেক গুপ্ত ও প্রকাশ্য দান ছিল, তাহার মধ্যে স্বদেশে পিতৃস্মৃতি স্মরণার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে 'বড়া মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' স্থাপন ও মাতৃস্মৃতি রক্ষার্থে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে 'প্রসন্নময়ী চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেনসারী' প্রতিষ্ঠা প্রধান।

সংসারে উপকার অনেকেই অনেকের কাছে পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে চায় কয়জন? শরৎচন্দ্রের মুখে প্রায়ই এই উপকারের কথা শুনা যাইত। একবার নিবারণ বাবু এপেনডিসাইটিস রোগাক্রান্ত হইয়া রেঙ্গুন জেনারেল হাঁসপাতালে ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ আমার বাড়ীতে থাকিতেন বলিয়া শরৎচন্দ্র কোনদিন হাঁসপাতালে যাইয়া, কোনদিন বা আমার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন।

দশম স্তবক

কেল্লার মধ্যে শরৎচন্দ্র

সমুদ্র হইতে রেঙ্গুন বন্দরে প্রবেশ পথে নদীর মোহানার উপর তিন দিকে তিনটি কেল্লা আছে, প্রথমটি সিরিয়াম পয়েন্ট, দ্বিতীয়টি চৌকি পয়েন্ট এবং তৃতীয়টির নাম কিংস পয়েন্ট। এই তিনটি কেল্লা লইয়া সামরিক বিভাগে গ্যারিসন্ ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে Special Defence Division নামে একটি বিভাগ আছে। আমি ঐ বিভাগে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর কনট্রাক্টর ছিলাম। প্রত্যহ জলপথে কাজ দেখিতে যাইবার জন্য আমার একখানি শামপান (ব্রহ্মদেশীয় নৌকা) ছিল। শরৎচন্দ্র কয়েকবার আমার সহিত গিয়া এই কেল্লার বহির্ভাগ দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই দুর্গাভ্যন্তর দেখিবার সাধ থাকা সত্ত্বেও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ, এই দুর্গাভ্যন্তরস্থ যুদ্ধের বিরাট আয়োজন লোকচক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভে প্রোথিত বলিয়া গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ার ও কনট্রাক্টর ব্যতীত অন্যের সে স্থলে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

একদিন এই দুর্গাভ্যন্তরস্থ টনেলের ভিতর একটি কামানের কোন অংশ সংস্কারের আবশ্যক হওয়ায়

গ্যারিসন্ ইঞ্জিনীয়ার ঐ কাজটি দেখাইবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির করিলে, আমি তাঁহার নিকট হইতে আমার বড় মিস্ত্রীর নাম করিয়া একখানি পাশ চাওয়াতে তিনি "Allow contractor G. N. Sircar and one Workman" বলিয়া পাশ লিখিয়া দিলেন।

পরদিন আমি সেই পাশে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া অতি প্রত্যূষে গ্যারিসন্ ইঞ্জিনীয়ারের লঞ্চে সিরিয়াম পয়েন্ট কেল্লায় আসিলাম। ঐ দিন Heavy Gun Practice অর্থাৎ কৃত্রিম জলযুদ্ধ দেখাইবার দিন ধার্য্য ছিল বলিয়া সকালে এক ঘণ্টার জন্য বন্দরের সমস্ত জলযান যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং নদী বক্ষে ভাসমান একটি বৃহৎ কাষ্ঠের চলন্ত ভেলাকে শত্রুপক্ষীয় জাহাজ মনে করিয়া সেটিকে লক্ষ্য করিয়া তিন দিকের কেল্লা হইতে এক সঙ্গে আক্রমণ করা হয়। যুদ্ধস্থল ব্যতীত আসল কামান ছোঁড়া দেখিবার সুযোগ জীবনে সম্ভবপর নয় বলিয়া শরৎচন্দ্র এই দৃশ্যটি দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একজন মিলিটারি কমাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে চালিত ছয়জন সৈনিক পাঁচ হইতে ছয় হাত উচ্চ চাতালের উপর বৃহদায়তন একটি কামান হইতে বীরোচিত উৎসাহে কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল। কামান ছুড়িবা মাত্র গোলা গুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে বজ্রনাদে ধুমোদ্গিরণ করিয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া

ঐ ভাসমান ভেলার উপরে পতিত হইল। প্রথম কামান গর্জ্জনের শব্দ হইতেই আকাশে কাক, চিল, বক প্রভৃতি পক্ষিগণ হাহা রবে চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে উড়িয়া পলাইল। শরৎচন্দ্র ও আমি কাণে আঙ্গুল দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। দু' তিন মাইল দূরবর্ত্তী বিভিন্ন দুর্গ হইতে গোলাগুলি একত্রে লক্ষ্যস্থলে পড়িয়া পর্ব্বতপ্রমাণ জলরাশি হইতে এক একটি জলস্তম্ভের সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই তুমুল যুদ্ধের অভিনয় দেখিয়া আমরা যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শরৎচন্দ্র বলিলেন—"দেখ, জন বুলের সমস্তই চূড়ান্ত ব্যাপার, গোরাগুলো কেমন জ্বলন্ত উৎসাহের সঙ্গে হুঙ্কার ছেড়ে নদীর জল কাঁপিয়ে তুলছে!"

এই কামান দাগা শেষ হইবার পর গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ার আমাকে ও শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ দ্বারে নিজেদের জুতা ছাড়িয়া তথায় রক্ষিত রবারের জুতা পরিলাম এবং এক একটি টর্চ লাইট হাতে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভূগর্ভে রক্ষিত বিবিধ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম।

গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ার শরৎচন্দ্রকে সুনিপুণ কারিগর ভাবিয়া তাঁহাকে কামান মেরামতের কাজগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি বাহিরে

আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি লঞ্চের দিকে দৌড় দিলেন। যাইবার সময় আমাকে কি বলিয়া গেলেন তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না, কামান গর্জ্জনের ভীষণ শব্দে সেদিন একরূপ বধির হইয়া গিয়াছিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই লঞ্চের হুইসিল্ শুনা গেল, ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ারের লঞ্চ কিনারা ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। বাস্! সারা দিনের মত আমরা এই দ্বীপান্তরে পড়িয়া রহিলাম। শরৎচন্দ্র অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, তোমার ইঞ্জিনীয়ার আমাদের ফেলে গেল কেন ?"

—"কি জানি, শরৎ দা, হয়ত মনে ক'রেছে আমি আমার অন্য কাজকর্ম্ম দেখে নিজের সাম্পানে যাব।"

—"তোমার সাম্পান কোথা ?"

—"আমি যে আজ সাম্পানে আসি নাই তা হয়ত ওঁর খেয়াল নাই।"

—"এখন উপায় ?"

—"সারাদিন উপবাস, নয়ত চার মাইল পথ হেঁটে টাঙ্গিনে যেতে পারলে সাম্পান পাওয়া যেতে পারে।"

—"ভাই, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

—"এত কামানের গোলা খেলে, এরই মধ্যে হজম হ'য়ে গেল ?"

—"পেট না ভরুক, কাণ ভরে কাণে তালা ধরে গিয়েছে।"

—"তুমি অপয়া লোক সঙ্গে এসেছ ব'লে আজ এই বিভ্রাট ঘটেছে।"

তাহার পর দুর্গ প্রাচীরের বাহিরের ঝিলে একজন টমি ছিপে একটি মাছ গাঁথিয়া টানাটানি করিতেছে দেখিয়া শরৎচন্দ্র দৌড়িয়া তাহার কাছে পৌঁছিবামাত্র মাছটি ছুটিয়া গেল। টমি আপশোষ করিয়া শরৎচন্দ্রকে বলিল—"Narrowly escaped, Bloody son of a Gun!" বড্ড পালিয়েছে, কামানের বাচ্ছার মত মাছটি বড় ছিল।

টমির কথাবার্ত্তা ও হাবভাবে বীরোচিত নম্রতা দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাহার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে 'Bloody son of a Gun' কথাটি বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

পদব্রজে আমরা টাঙ্গিনের পথে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর বহু মাইল ব্যাপী বিরাট কারখানা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। পথিমধ্যে শরৎচন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় একটি বর্ম্মা পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময় একটি কুটীরের মধ্য হইতে কান্নার সুর শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইলাম। কান্নার

যন্ত্রণাসূচক কি করুণ সুর! আমরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির আর্ত্তনাদ? অনুসন্ধানে জানিলাম শব্দ একটি আসন্ন-প্রসবা যুবতীর প্রসব বেদনা-প্রসূত কাতর ক্রন্দন। এ দেশের প্রাচীন প্রথা অনুসারে অনেক স্থলে সন্তান প্রসবের বিলম্ব হইলে প্রসূতিকে মাটিতে শোয়াইয়া পল্লীর আনাড়ী ধাত্রী তাহার পেটের উপর উঠিয়া দাঁড়ায় এবং আস্তে আস্তে পা দিয়া পেট টিপিতে থাকে, প্রসূতিকে এই নিষ্ঠুর নির্য্যাতন অবাধে সহ্য করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া শরৎচন্দ্রের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। প্রসূতির আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কায় তিনি ভয়-বিহ্বল চিত্তে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"গিরীন, তুমি লোকজন ডাক, প্রাণপণে এ নিষ্ঠুর কাজে বাধা দাও, তোমার কথা না শোনে এদের মারধর কর—ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দাও।" তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া ও তাঁহার অসংলগ্ন প্রলাপ বাক্য শুনিয়া প্রতিবেশীর মধ্যে অনেক লোক জড় হইয়া গেল। তাহারা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া শরৎচন্দ্রের খুব মায়ার শরীর এই অভিমত প্রকাশ করিল। অশিক্ষিতা ধাত্রী বিদেশী পথিকের এই অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি দেখিয়া তখনকার মত এই নিষ্ঠুর কার্য্যে নিবৃত্ত হইল।

শরৎচন্দ্রের হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। কাহারও

সামান্য দুঃখ দেখিলে তিনি অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতেন।

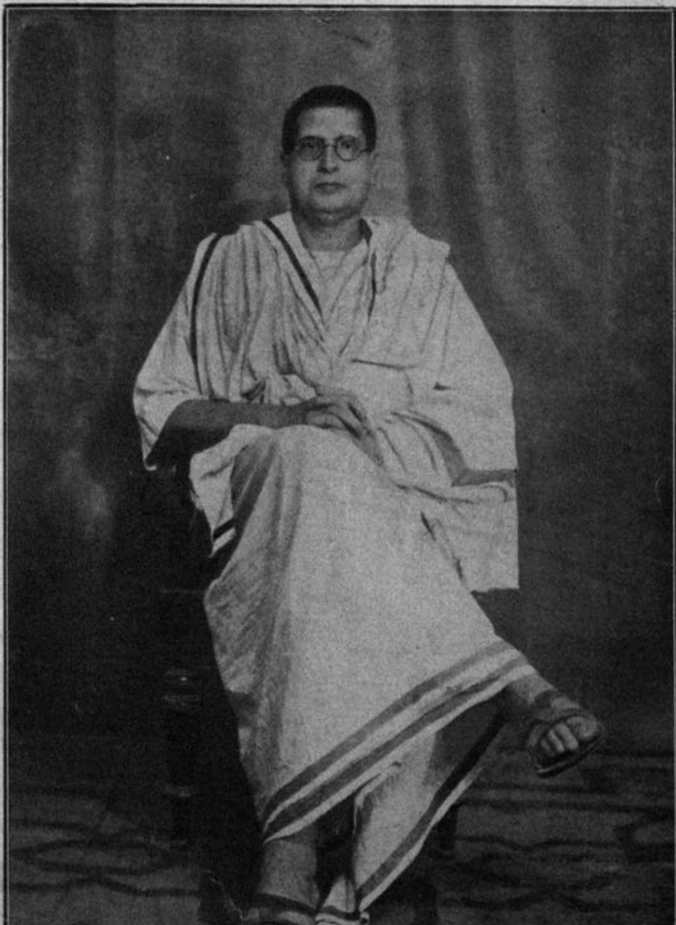
ফিরিবার পথে আমাদিগের বিদেশীর পোষাক দেখিয়া প্রায় শতাধিক পল্লী-কুকুর তাড়া করিয়াছিল। লুজির (village head-man) সাহায্যে কোনরূপে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

টাঙ্গিনে আসিয়া বহু অনুসন্ধানের পর একখানি সাম্পান ভাড়া করিয়া রেঙ্গুনে ফিরিলাম। তীরে নামিয়া আমি শরৎচন্দ্রকে বলিলাম—"শরৎ দা, এই শেষ। তোমার মত পাগলকে নিয়ে আর কখন পথে বের হ'ব না।"

একাদশ স্তবক

রেঙ্গুনে স্বামী শর্ব্বানন্দ ও শরৎচন্দ্র

রাম-কৃষ্ণ মিশনের স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজ যে সময়ে রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাটীতে ছিলেন সেই সময় তিনি রেঙ্গুনে একটি স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ও ঠাকুরের ভাব প্রচার করিবার জন্য সহরের নানা স্থানে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি রেঙ্গুনে বাঙ্গালীদিগের স্থাপিত 'রামকৃষ্ণ সমিতি' ও মাদ্রাজী ভক্তগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সোসাইটী' দুইটি একত্র সম্মিলিত করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নাম দিয়া একটি প্রকাশ্য সভায় উভয় প্রতিষ্ঠানের সভ্যদিগের প্রত্যেককে তাঁহাদের এক মাসের আয় চাঁদা দিতে অনুরোধ করায় ডাঃ পি, জে, মেঠা এক-কালীন এক হাজার টাকা দান করেন ও অন্যান্য সভ্যদের প্রদত্ত টাকায় একদিনে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ হয়। কিন্তু এই টাকা মঠ স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া আমি স্বামী শর্ব্বানন্দের সভাপতিত্বে স্থানীয় জুবিলী হলে 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে'র মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে একটি সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান করিয়া যে সঙ্গীতাভিনয়ের আয়োজন



স্বামী শর্ব্বানন্দ

করিয়াছিলাম, শরৎচন্দ্র আমার বিশেষ অনুরোধে তাহার দৃশ্যপট পরিকল্পনা, সাজসজ্জা নির্ব্বাচন ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেজের ভিতর উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের উচ্চাঙ্গের নির্ব্বাচিত অভিনয় রেঙ্গুন সহরে প্রথম হওয়ায় ইহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং অর্থ সাফল্যে এক রাত্রে চৌদ্দ শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজের সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্র শুনিয়াছিলেন যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী, দিল্লী, সিলোন, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে স্বামী শর্ব্বানন্দই তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময় বর্ম্মার ডেপুটি স্যানিটারী কমিশনার (পরে পোর্ট হেলথ্ অফিসার) ডাঃ ডিমেলো ও তাঁহার কন্যা মিস্ ডিমেলো ডিলিসিয়া আমার বাড়িতে অতিথি ছিলেন। ডাঃ ডিমেলো গোয়ানীজ খৃষ্টান হইলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা লইয়া মঠের ভক্ত হইয়াছিলেন।

প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় অনেক ভক্ত সমাগম হইত বলিয়া স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ক্লাস করিয়া ধর্ম্ম-উপদেশ দিতেন। একদিন অপরাহ্নে যখন শরৎচন্দ্র ও ডাঃ ডিমেলো ভিন্ন অন্য কেহ আমার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন

না, সেই সময় রেঙ্গুনের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী শশিভূষণ নিয়োগী স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শশীবাবু ধার্ম্মিক, দাতা, পরোপকারী, বিনয়ী ও মধুর স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। শশীবাবু স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"আমি আপনার কাছে একটি পরামর্শ নিতে এসেছি।"

স্বামীজী বলিলেন—"বেশ ত, কি বলুন ?"

শশীবাবু বলিলেন,—"টমসন ষ্ট্রীটের মোড়ে আমি দশ হাজার টাকা মূল্যে একখণ্ড জমি কিনেছি, ইচ্ছা আছে ঐখানে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।"

স্বামীজী বলিলেন—"রেঙ্গুনে এমন সুন্দর দুর্গাবাড়ী থাকৃতে আবার কালীবাড়ীর আবশ্যক কি ?"

শশীবাবু উত্তরে বলিলেন—"ওখানকার পূজারী ব্রাহ্মণরা মূর্খ ও কদাচারী, সাত্ত্বিক পূজা-পদ্ধতি কিছুই জানে না।"

স্বামীজী বলিলেন—"আপনি মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রলে সদাচারী, পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পাবেন তার স্থিরতা কি ?"

শশীবাবু বলিলেন—"সেই উদ্দেশ্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই একজন সাত্ত্বিক পূজারী খুঁজে দিতে পারবেন, আমি তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করে দেব।"

স্বামীজী তখন বলিলেন—"আমি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দেখেছি কিন্তু তন্ত্রোক্ত বিধিমত ঠিকভাবে কালী পূজা করতে পারে এমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দু'একজন ছাড়া চোখে পড়েনি।"

শশীবাবু তখন বিস্মিতভাবে বলিলেন—"আপনাদের পূজাপদ্ধতি কি রকম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমরা অধিকাংশ স্থলে মানস-পূজা বা ভাব-পূজা করি। সেই এক অজ্ঞেয় শক্তিকে বোধে বা জ্ঞানে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা যে ঘট, পট, পাষাণ বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পূজা করি, ঐ সকল দেব-বিগ্রহ মাটি, কাঠ বা পাষাণের নির্ম্মিত হ'লেও যিনি পূজা ক'রবেন তাঁকে ঐ সকল বিগ্রহের স্থূলভাব ভুলে গিয়ে অলৌকিক চিন্ময়ভাবে চিন্তা করতে হ'বে, এজন্য চাই পূজার মূল বস্তু ঐকান্তিক ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস, হৃদয়ের পবিত্রতা ও ব্যাকুলতা। আপনার পেশাদার পূজারী ব্রাহ্মণরা এসব কোথায় পাবে? দেখেছি অনেকে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রথমে হৃদয়ের আগ্রহে বিগ্রহ স্থাপন করেন, কিছুদিন পরে ঐ বিগ্রহের নিগ্রহ সুরু হ'য়ে অবশেষে গলগ্রহে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা-অপরাধে অনেকের বংশ-নাশ হ'য়েছে!"

স্বামীজীর অনিন্দ্যসুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শশীবাবুর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার

কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি হাতযোড় করিয়া বলিলেন—"আপনি দয়া করে এমন পরামর্শ দিন যাতে আমার দেবোদ্দেশ্যে খরিদ জমিটির সুব্যবস্থা হয়।"

স্বামীজী বলিলেন—"আপনি গিরীনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করুন না, উনি ত রেঙ্গুনে একটি ঠাকুরের মঠ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন ও চার পাঁচ হাজার টাকা চাঁদাও তুলেছেন।"

শশীবাবু বলিলেন—"উনি ত' একবার আমার কাছে সে প্রস্তাব করেছিলেন।"

স্বামীজী বলিলেন—"বেশ ত ঐ মন্দিরে মা কালীর একখানি বড় অয়েল পেন্টিং ছবি রাখলেই হ'বে। বর্ত্তমান যুগে পরমহংসদেবই মায়ের ভাবময়ী জীবন্ত বিগ্রহ!"

আমি সুযোগ বুঝিয়া শশীবাবুকে অনেক বুঝাইলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি বলায় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে ঐ জমিটি দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ঐখানে সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমার বহুদিনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া আমি হর্ষ বিস্ময়ে 'জয় প্রভু রামকৃষ্ণ!' বলিয়া জয়ধ্বনি দিলাম এবং একথা উপস্থিত সাধারণে প্রকাশ করিতে শরৎচন্দ্রকে নিষেধ করিলাম।

শরৎচন্দ্রের পেটে কোন কথা হজম হইত না। তাহা ছাড়া তিনি দুই পক্ষে গণ্ডগোল বাধাইয়া তামাসা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন বলিয়া পরদিন অফিসে গিয়াই 'রামকৃষ্ণ মিশন'-বিদ্বেষী তাঁহার সহকর্ম্মী প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিলেন, "বাঁড়ুয্যে মশায়, কাল গিরীন-বাবু শশী নিয়োগীর কাছ থেকে খুব শিকার বাগিয়েছে। এক কথায় দশ হাজার টাকার জমি ও চল্লিশ হাজার টাকার 'রামকৃষ্ণ' মঠ। আপনাদের কালীমন্দির মাথায় রইল।"

অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, প্রিয়বাবু সেইরূপ চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ অফিস হইতে বাহির হইলেন এবং শশীবাবুর অফিসে গিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"শশী! রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু যারা কাছা দিয়ে কাপড় পরে না, পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, বিলাত যায়, অখাদ্য খায়, তুমি সেই বিধর্ম্মীদের প্রশ্রয় দিচ্ছ? খবরদার সাবধান! তুমি হিন্দুর সন্তান, ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না কর, কালী-মন্দির না করে যদি মঠ করে দাও তোমার ভাল হ'বে না।"

শশীবাবু জাতিতে কৈবর্ত্ত। তিনি দেব-দ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া গোঁড়া প্রিয়বাবুকে ভয় করিতেন। তিনি বলিলেন—"রাণী রাসমণি আমাদেরই স্বজাতি ছিলেন, শুনেছি তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে পরমহংস-দেবের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে মন্দির করে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়বাবু বলিলেন—"সে মা কালীর মন্দির, 'রামকৃষ্ণ' মঠ নয়। এখন সেখানে এদের ঢুকতে দেয় না।"

শশীবাবু বলিলেন—"যেখানে দুর্ভিক্ষ, বন্যাপীড়িত, মহামারী ও ভূমিকম্প সেখানেই ত বেলুড়ের সাধুরা গিয়ে সাহায্য করেন।"

প্রিয়বাবু তাহাতে কাণ না দিয়া বলিলেন—"যত অকর্ম্মণ্য কুঁড়ের দল সব একত্র জুটেছে, শুধু বসে খেলে ভাত হজম হ'বে না বলে ওঁরা মধ্যে মধ্যে এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়ান। এখন বর্ম্মায় এসেছেন মঠ করতে, এদেশে কি মন্দিরের অভাব আছে? লক্ষ লক্ষ 'ফয়া' ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি গিরীন সরকারের ধাপ্পাবাজীতে পড়ে গেলে কি করে? উনি এখন বিলেত ঘুরে এসে আবার রামকৃষ্ণ ভজার দলে ভিড়েছেন।"

শশীবাবু উত্তরে বলিলেন—গিরীনবাবুই ত কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য এখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছিলেন।"

প্রিয়বাবু দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"সে শুধু নাম কেনবার জন্য।"

শশীবাবু বলিলেন—"কি ক'রব বলুন, সেদিন ওঁর বাড়ীতে স্বামীজীকে দর্শন ক'রতে গিয়ে কথা দিয়ে ফেলেছি।"

প্রিয়বাবু বলিলেন—"কিসের কথা দেওয়া? যদি

কথা ফেরাতে না পার ব'ল কালী-মন্দির করতে হ'বে।"

এ সংবাদ শশীবাবুর নিকট আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।

তাহার পর প্রিয়বাবু আরও কয়েকটি গোঁড়া ভদ্র-লোককে সঙ্গে লইয়া দলপুষ্টি করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন করিতেছেন দেখিয়া পরদিন আমি তাড়াতাড়ি ঐ জমিটি শশীবাবুর নিকট হইতে মিশনের নামে রেজেষ্টারী করাইয়া লইলাম।

শর্ব্বানন্দ মহারাজ একটি শুভদিন দেখিয়া বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তির সম্মুখে ঐ জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভিত্তি পত্তন করিলেন। ঐ দিন রাত্রে স্বামীজীর সহিত একত্রে আহার করিবার জন্য শশীবাবু, কুঞ্জবাবু, ডাঃ মেঠা, রায় সাহেব মুখার্জ্জি, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে আমার বাটিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ঐ দিন দেখিলাম, শশীবাবু প্রিয়বাবুর প্ররোচনায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন এবং মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভারের কথা প্রত্যাহার করিয়া মাত্র আর দশ হাজার টাকা দিতে রাজী হইলেন। শরৎচন্দ্রের অদূরদর্শিতার জন্য মিশনের এই ক্ষতি হওয়ায় তিনি বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ স্তবক

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনায় শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপান হইয়া আমেরিকা যাইবার পথে রেঙ্গুনে আসিবেন এই সংবাদ আসিল। কবি-সম্রাটের বিশিষ্ট বন্ধু ব্রহ্মদেশের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেন মহাশয় কবিবরের টেলিগ্রামখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"গিরীন্দ্র, রবি বাবু আসছেন, তিনি আমার বাড়ীতে থাকবেন। এখন সহরবাসীর পক্ষ থেকে যাতে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয় তুমি তার বন্দোবস্ত ক'র।"

মিঃ সেন ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীদের গৌরব ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত ধনী ব্যারিষ্টারশ্রেণীর মধ্যে মিঃ সেনের ন্যায় দানশীল ও হৃদয়বান লোক অতি বিরল। সাহায্য প্রার্থী হইয়া কেহ কখনও তাঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফেরেন নাই। রেঙ্গুন সহরে স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরী, দুর্গা মন্দির, ব্রাহ্মসমাজ, সেবক সংকার সমিতি প্রভৃতি সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানেরই তিনি পৃষ্ঠপোষক বা সভাপতি ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ব্রহ্মদেশে আসিয়া ইনি প্রতিভা ও অধ্যবসায় গুণে ব্যারিষ্টার, জজ,



মিষ্টার পি, সি, সেন

অফিসিয়েল রিসিভার হইতে য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া সম্মানের উচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। মিঃ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ এস, এন, সেন রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ এ, এন, সেন সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতা রেঙ্গুন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ জে, আর, দাশ ইঁহার জামাতা।

রেঙ্গুন সহরে সুসাহিত্যিকের অভাব জানিয়া মিঃ সেন আমাকে বলিলেন—"এবার রবিবাবুর জন্য ভাল করে তুখানি অভিনন্দন পত্র লিখতে হ'বে, একখানি বাঙ্গালায় ও আর একখানি ইংরেজীতে। যা তা লিখলে আমরা হাস্যাস্পদ হব। অভ্যর্থনা সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এমন কি লাট সাহেব পর্য্যন্ত আসতে পারেন।"

আমি বলিলাম—"বাঙ্গালার ভার আমি নিলাম, আপনি ইংরেজী লেখার ভার নিন।"

মিঃ সেন হাসিয়া বলিলেন—"তোমার বাঙ্গালা লেখার দৌড় আমি জানি, ও লেখা রবি বাবুর আসরে চলবে না।"

আমি বলিলাম—"আমি নিজে লিখব না, একটি সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে লেখাব।"

মিঃ সেন বলিলেন—"কে তোমার সাহিত্যিক বন্ধু? তাঁর নাম কি?"

আমি বলিলাম—"তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে চাকরী করেন।"

মিঃ সেন বলিলেন—"কই তাঁর নাম কখন ত শুনি নাই, তিনি কি আমাদের ক্লাবের মেম্বার ?"

আমি বলিলাম—"না, তিনি নীরবে সাহিত্য চর্চ্চা করেন, কাহারও সঙ্গে মেশেন না।"

মিঃ সেন বলিলেন—"এবার সত্যভূষণ এখানে নাই, কে গান করবে ?"

আমি বলিলাম—"শরৎ বাবুকেই ধরব, তবে তিনি বড় লাজুক, সভা সমিতিতে আসতে চান না।"

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুচিন্তিত অভিনন্দন পত্র লিখিয়া দিলেন এবং উদ্বোধন সঙ্গীতখানি গাহিতে রাজী হইলেন।

আমি শরৎচন্দ্রের লিখিত অভিনন্দন পত্রখানি মিঃ সেনকে দেখাইতে তিনি উহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলেন।

কবি সম্রাটের আগমন সংবাদ সহরে পৌঁছিবামাত্র বিপুল জনতা দলে দলে জাহাজ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাঁহাকে লইয়া একটি শোভাযাত্রা সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্' 'রবীন্দ্রনাথ কী জয়' ধ্বনি করিতে করিতে মিঃ সেনের বাটিতে পৌঁছিল।

পরদিন নগরবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা

করিবার জন্য বিপুল উৎসাহ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জন-সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই সভায় বহু ইংরেজ, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, চীনা, জাপানী ও বর্ম্মিজ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় শরৎচন্দ্রের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাব-জাত দৌর্ব্বল্য বশতঃ তিনি শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া গান করিতে অস্বীকার করিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করায় তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন হে? আবশ্যক হয় তোমার কবি সম্রাট নিজেই একখানা গেয়ে নেবেন এখন।"

সৌভাগ্যক্রমে সভায় কলিকাতার ডাক্তার সুন্দরী-মোহন দাশের পুত্র ডাঃ পি, দাশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি গাহিয়া সভার মুখ রক্ষা করিলেন।

এই সভায় মিঃ এ, কে, এস, জামাল সি, আই, ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-কমিটির পক্ষ হইতে আমি কবি সম্রাটকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার পর, সভাপতি মহাশয় ব্রহ্মদেশের লাট সাহেবের প্রেরিত নিম্নলিখিত টেলিগ্রামখানি পাঠ করেন। "In

welcoming you to the beautiful province of Burma I only regret that my absence from Rangoon prevents me from offering you my hospitality."

ব্যারিষ্টার মিঃ ইউ, বাথিন ইংরেজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিবার পর কবি সম্রাট ইংরেজী ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করেন।

তাহার পর কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্র লিখিত নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন,—

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুত সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি, লিট্,

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট্—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গহৃদয়কে এক নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য-হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্য-বীণায় সহস্র অনির্ব্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অনু পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্ত্বার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ

করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল মানব-হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্য বীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন, ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ	ভবদীয় গুণমুগ্ধ— রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ।

কবিবর বাঙ্গালা ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানের পর বলেন—"আমার কবি-খ্যাতি সমস্ত বাঙ্গালা দেশ পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যতদিন না ইউরোপের সাহিত্য-রসিক সমাজের বিচারে আমি অগ্রগণ্য কবি বিবেচিত হইয়া নোবেল পুরস্কার লাভ না করিলাম, ততদিন আমার দেশ আমাকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।"

তিনি একই সভায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করিয়া সভার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইবার পর মিঃ জে, আর, দাশ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার সঙ্গে এই সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য রেভারেণ্ড সি, এফ্, এন্‌ড্রুজ সাহেবের অশেষ গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকেও ধন্যবাদ দেন।

সভায় অসম্ভব জনতা হইয়াছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র

কথার ঠিক রাখিতে না পারায় লজ্জায় এ সভায় উপস্থিত হন নাই।

তিনি সন্ধ্যার পর আমার বাটিতে আসিলে আমি বলিলাম,—"শরৎ দা, আজ জুবিলী হলে তোমার গুরুদেবকে দেখবার জন্য সহর শুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়েছিল, শুধু তুমি অনুপস্থিত, এই কি তোমার গুরুভক্তি ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"ভাই, তুমি ত জান যে সভা-সমিতির হাওয়া আমার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। নির্জ্জনে খাণিকক্ষণ বসে রবিবাবুর কথাবার্ত্তা শুনতে ভারী ইচ্ছা হয়। উনি যাবেন কবে ?"

আমি বলিলাম,—"কাল দুপুরেই ওঁর ষ্টীমার ছাড়বে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"তোমার ত মিঃ সেনের বাটিতে অবাধ গতিবিধি আছে, চল না কাল তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে আসি।"

আমি বলিলাম,—"বেশ, কাল সকালে নিয়ে যাব, কিন্তু তুমি রবিবাবুর কাছে যেতে পারবে ত ? না মিঃ গোখেলের সঙ্গে দেখা করার মত ঘরে ঢুকেই দৌড় দেবে !"

পরদিন সকালে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মিঃ সেনের বাটিতে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার ড্রয়ইং রুমে মিঃ সি, এফ্, এনড্রুজ, মিঃ পিয়ারসন, প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বসিয়া আছেন, কিন্তু রবিবাবু সেখানে নাই।

এত অপরিচিত লোককে একত্র দেখিয়া শরৎচন্দ্রের মুখ শুখাইয়া গেল। আমি অতি কষ্টে তাঁহাকে মিঃ সেনের সম্মুখে লইয়া গিয়া, 'ইনিই বাঙ্গালা অভিনন্দন পত্রখানির লেখক শরৎ বাবু' বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে মিঃ সেন তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

আমি রবিবাবুর সন্ধানে উপরে যাইতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে বৌমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি মিঃ সেনের পুত্রবধূ, হাইকোর্টের জজ মিঃ এস্, এন, সেনের স্ত্রী ও স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতা দেবী।

সেন পরিবারের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় বৌমা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কোমল মধুর স্বভাব ও সদা হাস্যময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইত। ইঁহার সদ্‌গুণরাশি মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কন্যার উপযুক্তই ছিল। ইনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া রবিবাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

কবির ধ্যান ভাঙ্গান একটি অপরাধ জানিয়া মনে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গিয়া দেখিলাম, রবিবাবু একাই উপরের হল ঘরে পায়চারী করিতেছেন।

তাঁহার রচিত সাহিত্য ও কাব্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে

বহুদিন জানিতাম, রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের মুখে বহুদিন তাঁহার কবিতার আবৃত্তি ও ব্রহ্ম সঙ্গীত শুনিয়াছি, কিন্তু এই সত্য শিব সুন্দরের পূজারী বিশ্বকবির সহিত ব্যক্তিগত জীবনে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় যে, কত মধুর জীবন্ত তাহা আজ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইলাম, তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি, ও অসীম দেশ প্রীতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিলাম।

সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে, রেঙ্গুনে আমরা কতগুলি বাঙ্গালী আছি, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি কিরূপ, কয়টি ক্লাব ও লাইব্রেরী আছে, সাহিত্য চর্চ্চা কিরূপ হয়, তিনি এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এমন সময় বৌমা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নীচে একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফার আসিয়া আমাকে খুঁজিতেছে।

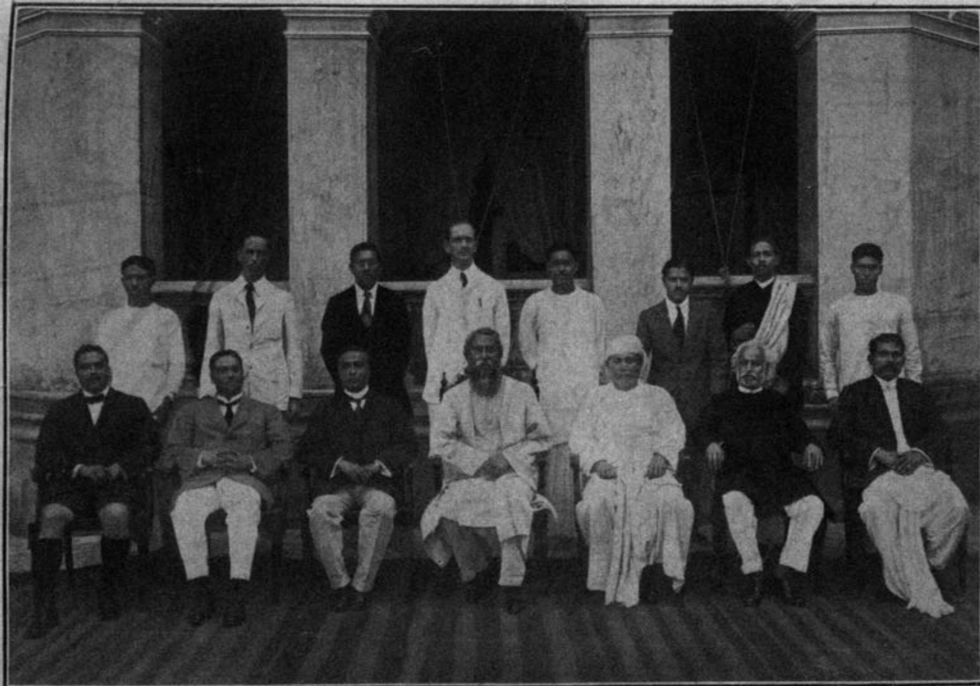
আমি রবিবাবুকে বলিলাম—"নীচে আমরা আপনার সঙ্গে একটি গ্রুপ ফটো তোলবার বন্দোবস্ত করেছি।"

রবিবাবু বলিলেন—"আমার আবার ফটো তোলা কেন?"

এই সময় বৌমা বলিলেন—"গিরীন বাবু যখন এসেছেন তখন ছাড়বেন না, আপনাকে যেতেই হবে।"

রবিবাবু বলিলেন—"আচ্ছা সুজাতা, তুমি যখন ব'লছ তাই হবে।" এই বলিয়া রবিবাবু বেশ পরিবর্ত্তনের

ব্রহ্মদেশে রবীন্দ্রনাথ



মিঃ এস,এন,সেন, মিঃ এন,সি,সেন, মিঃ পি,সি,সেন, কবি সম্রাট, মিঃ বা-থিন, মিঃ কে,বি, ব্যানার্জ্জী, মিঃ জি,এন, সরকার

দণ্ডায়মান :—রেভারেণ্ড সি, এফ্, এণ্ড্রুজ, মিঃ মেঠা, মিঃ পিয়ার্সন, মিঃ মুকুল দে, মিঃ এন, এন, সেন প্রভৃতি

দেখিয়া সমালোচনা করিয়া বলেন—"তুমি যখন এ কাজের মোড়ল ছিলে, তখন রেভারেণ্ড এনড্রুজ ও পিয়ারসন সাহেবকে পিছনে দাঁড়াতে দিয়ে তোমার চেয়ারে বসা উচিত হয় নি।" আমি বলিলাম—"কি ক'রব শরৎদা, রবিবাবুর সাজসজ্জা করতে খুব বিলম্ব হওয়ায় ফটোগ্রাফার ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল, আমি রবিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসবামাত্রই এনড্রুজ সাহেব আমাকে তাঁহার চেয়ার খানিতে বসিয়ে দিলেন, দুজনে কিয়ৎক্ষণ 'আপ বৈঠিয়ে, আপ বৈঠিয়ে' করতে করতেই ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছিল।" ইহা শুনিয়া শরৎচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন এবং এক কপি ফটো লইয়া গেলেন।

রবিবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আমি এক কপি এই ফটো তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ও আর একখানি প্রবাসী আফিসে পাঠাইয়া ছিলাম। ঐ সময় প্রবাসী পত্রে আমার লিখিত 'ব্রহ্মদেশে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

কবি সম্রাট কয়েক মাস পরে আমেরিকা হইতে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলে আর একদিন আমি ও বৌমা মিঃ এস, এন, সেনের বাটিতে বসিয়া তাঁহার নিকট আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। ঐ দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি সন্ধ্যার পর

আমাদের বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব গৃহে আসিয়া একটি প্রীতি-ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্লাবের সভ্যদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র আমাদের ক্লাবের মেম্বর না হইলেও আমি তাঁহাকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করায় তিনি আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ স্তবক

কবিতায় শরৎচন্দ্র

বহুদিন পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের সহিত প্রথম আলাপের সময় তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বাল-সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বাল্যজীবনে কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেইগুলি এখন পাওয়া যাইবে কিনা, তাঁহার বাল্যবন্ধুরা বলিতে পারেন। আমি **বাল্যকালে ব্রহ্মদেশে** আসিয়া স্বদেশের স্মৃতি-বিজড়িত একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র কবিতাটির স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। কবিতাটি "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ব্রহ্ম-প্রবাসে

মাঝেতে গভীর সিন্ধু কল্লোলিয়া চলে
এক পারে তুমি তার অন্যপারে আমি ;
তবুও মনের গতি দূরত্বে কি রোধে ?
প্রিয়জন করে দেখা হৃদয়মন্দিরে।
আমি এই ব্রহ্মদেশে দূর সিন্ধু পারে
ভাসমান কালস্রোতে মানব-বুদ্বুদ !

দিবসান্তে একদিন বসি' সন্ধ্যারাতে
হেরিতেছি নগরীর শোভা ; হাসিতেছে
পূর্ণিমার চাঁদ ; তরল কিরণ-স্নেহে
চুমিতেছে ধরণীর প্রফুল্ল আনন।
পথে চলিয়াছে যত ব্রহ্মের রমণী
সুন্দর সুঠাম কায়া, সুবেশে ভূষিতা,
স্বর্ণগিরি প্যাগোডার সুবর্ণ মন্দিরে,
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবে পুষ্পাঞ্জলি দানে।
অদূরে শোভিছে হোথা ইরাবতী-তীরে
ব্রহ্মরাজধানী ঐ মাণ্ডালা নগরী,
অপরূপ রাজপুরী দুর্গ অভ্যন্তরে,
শত শত রম্য হর্ম্ম্য কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত
সুমণ্ডিত কলেবর মণি ও কাঞ্চনে।
ব্রহ্মের সে আধিপত্য শাসন ভীষণ,
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন,
চির স্বাধীনতা ধন নয়নের মণি,
এইস্থানে হারায়েছে মাতা ব্রহ্মভূমি।
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কায়া ধায় ইরাবতী
উছলি পুলকভরে অম্বুনিধি মুখে ;
পার্শ্বে শোভে অভ্রভেদী উচ্চ শৈলরাজি
দীর্ঘ তরুরাজি কত বক্ষেতে ধরিয়া ;
বিবিধ কুসুম রাশি স্তবকে স্তবকে

ফুটিছে অচল গাত্রে, মন্দ সমীরণ
"অহিংসা পরমধর্ম্ম" করিছে ঘোষণা।
ধীরে ধীরে জনস্রোত হতেছে বিলীন
সুবিস্তীর্ণ রাজপথে, আসিতেছে কাণে
বিদেশী-পথিককণ্ঠ-সঙ্গীতলহরী
রজনীর মৃদুকণ্ঠ পবনহিল্লোলে।
সুষুপ্তির পূর্ব্বরাগ নগরীর মুখে
ভাসিছে কোমল স্নিগ্ধ মধুর আভায়।
আমি এই সব শোভা দৃশ্যাবলী মাঝে
সুদীর্ঘ রজনী ব্যাপি রহিনু বসিয়া,
জীবনের কত কথা ভাবিতে ভাবিতে।
কত রাগ অনুরাগ, কত সুখ দুঃখ,
ধরণীতে এতদিন সঙ্গী যাহাদের
তাহাদের কত কথা, স্নেহ প্রীতি স্মৃতি
মানস-বীণার তন্ত্রী ধ্বনিল মধুরে।
এই সুখ দুঃখ মাঝে ভাসায়ে জীবন
নাহি জানি চলেছি কোথায়? নাহি জানি
কোথায় ভিড়িবে তরি—কোথা তার শেষ?
হায় এই মানব জীবন বিধাতার
সৃষ্টির চরম! অবরুদ্ধ আঁধারের
বুকে বায়ুস্তরে ঢাকা ধরণীর সম!
আছে কি আলোক এই আঁধারের পারে?

যুগান্তর হ'তে সে সেতু বাঁধিছে সুধী,
জীবনের পরলোক দেখাতে মানবে
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম উপাদানে রচি, হায়
তাহাও ত সীমাবদ্ধ শক্তির প্রয়াস,
কল্পনার মোহজালে সজ্জিত সুন্দর !
জানিনা জানিনা আমি কোথা আছ তুমি,
হে অজ্ঞাত, হে অনন্ত, অচিন্ত্য রহস্য !
ধারণা করিতে তোমা শক্তি নাই মম ;
লীলাময় তুমি, না জানি কি খেলা প্রভু
খেলিছ, বিরলে বসি শিশুটির মত
আপনাতে আপনি ভুলিয়া ! কি কারণে
এ মহা অপূর্ব্ব-সৃষ্টি রচনা তোমার !
অনন্ত কালের সিন্ধু কল্লোলিয়া চলে
পুরোভাগে ; আমরা বসিয়া তার কূলে
করিতেছি খেলা, বিজ্ঞান-দর্পিত শিশু
বাহুবলে জ্ঞানহীন। ভাঙ্গিতেছি কত
পুরাতন কথা, রচিতেছি বালুকার
স্তরে নবীন কাহিনী কত ! ধর্ম্মাধর্ম্ম
মনোমত করিতেছি কতই সৃজন !
পূজিতেছি অর্থে, স্বার্থে তব নামান্তরে !
দয়াময় যদি তুমি—মমতা ও দয়া
থাকে যদি হৃদয়ে তোমার, তবে কেন

নাহি দাও মুক্ত করি মোহ আবরণ ?
দেখাইয়া দাও কোথা আছে ধ্রুব পথ,
চির জ্যোতি জ্বলে কোন দেশে ? এ দুঃখের
ধরণী হইতে তবে নাহি কেন দাও
দূর করি দীনতা, কলুষ ব্যাধি ? কেন
প্রাণী-কুল কাঁপে অন্তিমেতে মরণের
ভয়ে ; ভাবে কোথা যাই এই রবি শশী
আলোকিতা মেদিনী ছাড়িয়া ? আশৈশব
কোন্ কাজে সাঙ্গ হ'ল জীবনের লীলা
ধীরে নেমে এস প্রাণ ! এ মহান গীতি
হবে না'ক শেষ কভু মানব কণ্ঠেতে।
ওই দেখ হাসে চন্দ্র, হাসিছে অবনী
মুগ্ধ হোয়ে মিশে যাও এ শোভার বুকে।
সিন্ধু-পরপারে ওই শোভে বঙ্গদেশ
চির প্রিয় জন্মভূমি সুজলা সুফলা,
আবৃত সুতনু যার স্বর্ণ শস্যাঞ্চলে।
কনক কিরীট শিরে অভ্রভেদী গিরি
হিমালয় হৃদি মাঝে সুরধুনী হার,
মুখর মঞ্জীর রূপে কল্লোলিছে সিন্ধু
চরণেতে। চিরপ্রিয় স্বদেশ আমার !
ভাসে মনোনেত্রে তোমার মূরতি আজি
কতদিন দেখি নাই যাহা। হেরিতেছি

গিরি নদী দ্রুমরাজি তড়াগ-প্রান্তর
মন্দির নগর পল্লী, স্বদেশ আমার।
বিমল গঙ্গার জল উথলিছে প্রাণে
আত্মীয় বান্ধব স্মৃতি করিছে আকুল।
যে স্নেহবন্ধনে মাগো! বাঁধিয়াছ তুমি,
পারি কি ভুলিতে তাহা জীবন থাকিতে ?
যদিও জননী আমি অবসন্ন মনে
জীবিকার অন্বেষণে এসেছি প্রবাসে,
তবুও তবুও তুমি জন্মভূমি মম
স্বর্গাদপি গরীয়সী! ও চরণে যেন
শত ডোরে বাঁধা থাকে হৃদয় আমার,
কায়মন মিশে থাকে তোমার রেণুতে।
হাস মা দীনের প্রতি সুপ্রসন্ন হাসি
একবার, ওই দেখ হাসিতেছে উষা
রাজলক্ষ্মীরূপে তনয়ের অভিলাষ
পুরাও জননী; এই সাধে নিবেদিনু
তপ্ত হৃদয়ের এই রক্ত অশ্রুধারা!
কেন এ দুঃখের গান এ সুখ নিশীথে ?
হাসে আমোদিনী মহী জলে স্থলে কিবা!
শারদ উৎসবে মত্ত স্বদেশ আমার
ধরারাণী সাজিয়াছে সুন্দর বসনে
রূপে দিক্ আলো ক'রে; নররনারী প্রাণে

আনন্দ উৎসাহধারা বহিছে হিল্লোলে।
প্রবাসে দৈবের বশে নির্ব্বাসিত আমি
সেই সুখ মনে আনি, ভাবিতেছি আজ
অতীতের কত শত মধুর কাহিনী,
তোমাদের প্রীতিভরা মুখ, স্নেহবাণী।
প্রবাসীরে মনে কোর এ সুখের দিনে
যবে আলিঙ্গিবে পরস্পরে ; ক'রো মনে
আর সেও তোমাদের ভাবিছে প্রবাসে
কবে তোমাদের পুনঃ সম্ভাষিবে হেসে।

চতুর্দ্দশ স্তবক

গল্পপ্রিয় শরৎচন্দ্র

ইংরেজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমি ও আমার বন্ধু পেগুর উকিল মিঃ অবিনাশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে রেঙ্গুনের বন্ধু বান্ধবগণ মিঃ পি, সি, সেনের সভাপতিত্বে বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব গৃহে একটি সভায় আমাদিগকে অভিনন্দিত করেন। ঐ দিন আমার ভূ-পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি একটি বক্তৃতা করি ও বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত সকল দেশের দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, ডাক টিকিট ও অত্যাশ্চর্য্য বস্তুগুলি (Souvenir collection) প্রদর্শন করি। শরৎচন্দ্র আসিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে এই জিনিষগুলি দেখিয়া যান এবং পরে মধ্যে মধ্যে আমার বাটিতে ভূ-পর্য্যটনের গল্প শুনিতে আসিতেন।

সৌন্দর্য্যপ্রিয় শরৎচন্দ্র প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন—"কোন দেশের মেয়েরা সব চেয়ে সুন্দরী দেখলে ?" উত্তরে আমি বলিলাম—"ইটালী দেশের মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ব'লে মনে হয়।"

শরৎচন্দ্র—'তোমরা কোন্ কোন্ দেশে গিয়াছিলে ?'

আমি বলিলাম—"এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার প্রধান প্রধান সহরগুলি দেখে এসেছি।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"এত টাকা খরচ ক'রে কি লাভ হ'ল ?"

আমি বলিলাম—"বিভিন্ন দেশে নানা জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, বেশ-ভূষা, চাল-চলন, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার ও শিক্ষা থেকে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"এই অভিজ্ঞতার মূল্য কি দিলে ?"

আমি উত্তর করিলাম—"পূরা এক বৎসর সময় ও নগদ দশ হাজার টাকা।"

শরৎচন্দ্র কহিলেন—"তোমরা নিশ্চয়ই নবাবী-চালে খরচ পত্র ক'রেছ। যদি কেউ গরীবয়ানা ভাবে যেতে চায়, তাহার কত আন্দাজ খরচ পড়বে ?"

আমি বলিলাম—"খুব মিতব্যয়ী হ'লে ৬।৭ হাজারে হ'তে পারে।"

শরৎচন্দ্র তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব চেয়ে কোন্ দেশটি তোমার ভাল লেগেছে ?"

আমি বলিলাম—"জাপান ও আমেরিকা।"

শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—"জাপান থেকে আমেরিকা যেতে ক'দিন লাগে ?"

আমি উত্তর করিলাম—"ইয়কোহামা বন্দর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে সানফ্রান্সিসকো আঠার দিনের পাড়ী। দূরত্ব ৫২০০ মাইল।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তোমরা কাদের জাহাজে আমেরিকা গিয়েছিলে?"

আমি বলিলাম—"আমরা N. Y. K. কোম্পানীর জাহাজে গিয়েছিলাম। পৃথিবীর অনেক বড় বড় কোম্পানীর জাহাজে চ'ড়েছি, কিন্তু জাপানী জাহাজের মত আদর যত্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ওদের জাহাজের কাপ্তেন, অফিসার ও নাবিক সকলেই জাপানী ও খুব ভদ্র। প্যাসেঞ্জারের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি, জাহাজের ব্যবস্থাও খুব সুন্দর। দরাজ উপর ডেকে সুন্দর কামরার মত দরজা জানালা বিশিষ্ট কেবিন; প্রত্যেক কেবিনে টেবল, চেয়ার, খাট বিছানা, আহার বিহার সকল রকমের বন্দোবস্ত অত্যুৎকৃষ্ট; দিনের বেলা ডেকের উপর নানা-বিধ খেলা, লাইব্রেরীতে বসে কত গল্প-গুজব ও পড়া, রাত্রে সেলুনে নাচ, গান, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়, কিছু টের পাওয়া যায় না।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কত জন প্যাসেঞ্জার ছিলে?"

আমি বলিলাম—"প্রায় দু'শ জন। তার মধ্যে ত্রিশ জন মাত্র প্রথম শ্রেণীর, বাকী সকলে অন্য শ্রেণীতে ছিল। এই ত্রিশ জনের মধ্যে চার জন আমেরিকান ছাড়া অন্য 'সকলে জাপানী। এরা খুব সরল প্রকৃতির ও

আমোদপ্রিয় লোক। সকলেই ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সান্‌ফ্রান্সিসকোতে যাচ্ছে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"এই আঠার দিনের মধ্যে জাহাজ আর কোথাও দাঁড়ায় না ?"

আমি বলিলাম—"বার দিন পরে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে হনলুলু দ্বীপে কয়লা নিতে দাঁড়ায়। এই দ্বীপটি অতি মনোহর, এখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। লোকে এই দ্বীপটিকে (Paradise of the Pacific) বলে। হনলুলুতে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকোয়ারিয়াম (Acquarium) আছে। এখানে পৃথিবীর নানা জাতীয় অসংখ্য জীবন্ত মাছ কাচের চৌবাচ্ছার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতকগুলি মাছ দেখতে ঠিক নানা রংএর বড় প্রজাপতির মত সুন্দর। আমরা এ গুলি ও কয়েকটি মৃত আগ্নেয়-গিরি দেখে জাহাজে ফিরে এলাম।

"প্রশান্ত মহাসাগর নামেও প্রশান্ত কাজেও খুব প্রশান্ত ; ঝড় তুফান প্রায়ই থাকে না।

"এই জাহাজে একটি সম্ভ্রান্ত জাপানী পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তাদের একটি কিশোরী সুন্দরী মেয়ে ছিল। তার নাম 'তমিয়াসেন'। তাহার শিশুসুলভ সারল্য আমাকে আকৃষ্ট ক'রেছিল। সে প্রত্যহ সকালে আমার কেবিনে এসে 'গুড্ মরণিং' বলে অভিবাদন ক'রত ও ইংরেজী ভাষায় কথা বার্ত্তা ক'ইতে শিখত।

"একদিন শুক্রবার সন্ধ্যা বেলা তমিয়াসেন এসে আমায় বলল—'জাহাজের সেলুনের নোটিশ বোর্ডে কাপ্তেন ইংরেজী ভাষায় কি লিখে দিচ্ছে পড়ে আমাকে বুঝিয়ে দিন।' গিয়ে দেখলাম, বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'We shall cross the Meridian to-night. To keep uniformity with the American day and dates, Saturday will be observed for 48 hours.' আজ রাত্রে আমরা পৃথিবীর মধ্য রেখা পার হব। আমেরিকার দিন ও তারিখের সঙ্গে মিল রাখ্‌বার জন্য আট চল্লিশ ঘণ্টাই শনিবার ধরা হ'বে।

কি হিসাবে দুই দিনে এক তারিখ গণনা হবে বুঝতে না পেরে সে তার বাপ মিঃ সীমা সাটোকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এল। তিনি সপরিবারে ও দু' একটি বন্ধুর সঙ্গে আমার কাছে এসে একথা জিজ্ঞাসা করায় আমি ১৮০° ডিগ্রীতে (Parallel of Longitude) হিসাবে এইটি গণনা হয় বুঝাইয়া দিতে মিঃ সীমাসাটো বললেন —'কত যুগ যুগান্তর ধরে কত মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করে গেছে, কিন্তু ক'জন এই সৌর জগতের বা সূর্য্য-মণ্ডলের খোঁজখবর রাখে। আদিতে এই পৃথিবী কি ছিল, কি ভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে, সূর্য্য কি, চন্দ্র কি, কি ভাবে পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিধারে ঘুরে বেড়ায় এই সব জ্যোতিষ ও ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান

আমাদের মোটেই নাই। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা জানেন বললে বাধিত হব!'

"আমি বুঝিয়ে দিলাম—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন আদিতে সূর্য্য এবং সমস্ত গ্রহগণ মিলিত হ'য়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছিল; কোন বিশেষ কারণে ইহার দেহ থেকে খানিকটা খানিকটা টুকরা বাহির হ'য়ে গেল, যা অবশিষ্ট রইল তার চারি ধারে টুকরাগুলিও ঘুরতে লাগল; ঘুরতে ঘুরতে তাহারা জমাট বেঁধে হল এক একটি গ্রহ; আমাদের পৃথিবী এরূপ একটি গ্রহ এবং যাকে বেষ্টন করে সকলে ঘুরতে লাগল, সেইটাই সূর্য্য। সূর্য্যের চারিধারে যখন পৃথিবী ঘুরছিল তখন পৃথিবীর দেহ থেকে খানিকটা অংশ ছুটে গিয়ে এই পৃথিবীর চারধারে ঘুরতে থাকে; ইহাই হল চন্দ্র। চন্দ্র বা গ্রহগুলির নিজস্ব কোন দীপ্তি নাই, ইহারা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। নক্ষত্রদিগের তুলনায় চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র।

"তমিয়াসেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সূর্য্য কত বড়। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, সূর্য্যের দেহ পৃথিবীর আয়তনের তের লক্ষ গুণ বড়; অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবী একত্র করে তাদিগকে গোল আকৃতি দিলে যত বড় হবে সূর্য্য তত বড়। সূর্য্য পৃথিবী থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে ও চন্দ্র মাত্র ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল

দূরে অবস্থিত। একটা এরোপ্লেন ঘণ্টায় ৯০০ শত মাইল বেগে ১০৫ বৎসরে সূর্য্যে পৌঁছুতে পারে।

"জাপানী কিশোরী আমাকে পৃথিবীর বয়স কত তাও জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছিলাম, 'বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করেছেন আড়াই শত কোটি বৎসর।'

"তারপর পৃথিবীর লোক সংখ্যা ২ শত কোটি শুনে তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। পৃথিবীর শেষ কোথায় তাও সে প্রশ্ন করেছিল। যখন সে শুনলে যে, ভগবানের এ রাজত্বের শেষও নাই আরম্ভও নাই, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনাদি, অনন্ত ও অসীম, তখন তার মুখে যে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি দেখেছিলাম, তা কখন ভুলতে পারব না।

"আমাকে তাঁরা একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা মনে করে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'এখন বুঝতে পারলাম, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট বলেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি আমাদের সম্রাট মিকাডো আমাদের জাতীয় পতাকায় এই বিরাটের প্রতীক উদীয়মান সূর্য্য (Rising Sun) অঙ্কিত করেছেন।'

"তমিয়াসেন কেবিন থেকে তার নোট বই বাহির করে এনে প্রশ্নগুলির সমস্ত উত্তর আবার জিজ্ঞাসা ক'রে লিখে নিল। তারপর সে তার ছবি আঁকার সরঞ্জাম এনে জাহাজের একপাশে ব'সে অস্তগামী সূর্য্যের অসম্পূর্ণ ছবিখানি আঁকতে বসল। তার রক্তিমাভাযুক্ত গণ্ডস্থল

সূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল ও তাহার মাথার ঘন কেশগুলি সমুদ্র বাতাসে বুকে ও পিঠে উড়ে পড়তে লাগল। দেখলাম তার সুন্দর হাতের ছবিখানিও খুব সুন্দর।

"আমি তার পাশে একখানি ডেক চেয়ারে শুয়ে অস্ত-গামী সূর্য্যের অপূর্ব্ব শোভা দেখতে লাগলাম। আকাশটি মনে হল যেন পটে আঁকা। প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্র বক্ষে অস্তাচলগামী সূর্য্যের এই শোভা দর্শন যার ভাগ্যে ঘটে তাহার জীবন ধন্য। এ দৃশ্য কবি কল্পনার বহির্ভূত। চিত্রকরের তুলি এখানে পরাস্ত। আমেরিকার বিশাল আর্ট গ্যালারীতে একটি এই অয়েলপেন্টিং ছবির দাম লেখা আছে পঞ্চাশ হাজার ডলার অর্থাৎ দেড়লক্ষ টাকা।

"দেখতে দেখতে সূর্য্যদেব প্রশান্তের শান্ত জলে গা ডুবিয়ে দিলেন, সন্ধ্যা হল এবং ক্ষণপরেই পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল কিরণে সমুদ্রবক্ষ যেন রজত-মার্জ্জিত হ'য়ে উথলে পড়ল। তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মন নেচে উঠ্‌ল! পূর্ণিমা তিথিতে সীমাহীন সাগর শোভা দেখে তন্ময় হ'য়ে গেলাম। দেখ্‌লাম সকলই বিস্তীর্ণ—সকলই মহান—সকলই আনন্দময়! মনে হ'ল কি অনন্ত তাঁহার রূপ, কত সুন্দর সেই বিশ্বস্রষ্টা; কত অসীম তাঁহার মাহাত্ম্য!

"আজ পৃথিবীর মধ্যরেখা পার হয়ে কলম্বাসের আবিষ্কৃত নূতন পৃথিবীতে প্রবেশ করছি ভেবে অপার

আনন্দে প্রাণ ভরে প্রার্থনা করলাম—'ঠাকুর! তুমি আমার কূপমণ্ডূকত্ব ঘুচিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছ? ধন্য তোমার মহিমা!' এই দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস জীবনের একটি চিরস্মরণীয় দিন।

পরদিন সকালে গভীর কামান গর্জ্জনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জাহাজের কোন বিপদ-সূচক চিহ্ন মনে করে তাড়াতাড়ি কেবিনের বাইরে এসে দেখলাম, সমস্ত কুয়াসায় আচ্ছন্ন, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ভীষণ কুয়াসার অন্ধকারে পাছে বিপরীতগামী জাহাজ এসে ধাক্কা লাগায়, সেই সতর্কতার জন্য জাহাজের বাঁশী গাঁ গাঁ শব্দে বাজতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে কামান দাগা হয়।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"কামান দাগে কেন?"

আমি বলিলাম—"তুমি ত কেল্লায় দেখেছ, কামানের মুখে একটা উজ্জ্বল অগ্নিশিখা বের হয়, সেটা দেখে ও শব্দ শুনে পথিভ্রষ্ট জাহাজগুলি সতর্ক হয়।"

"নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদের জাহাজ সানফ্রান্সিসকো বন্দরে পৌঁছিল। এই বার বিদায়ের পালা। যে জাহাজে আমরা ১৮ দিন একাদিক্রমে বাস করেছি, যে জাহাজ থেকে এ কয়দিন প্রত্যহ সূর্য্য ও চন্দ্রদেবকে জলের মধ্য থেকে গা ভাসাতে ও ডুবতে দেখেছি, যে অনন্ত জলরাশি দেখে পৃথিবীর ৩ ভাগ জল ও ১ ভাগ স্থল এই সত্যটি মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে, যে স্থানে কত বিভিন্ন

জাতীয় নরনারী একত্রে এক পরিবারের মত এ কয়দিন আহার-বিহার ও আমোদ প্রমোদে কাটিয়েছি, আজ সেইটি ছেড়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যেতে হবে।

পরস্পর বিদায় প্রার্থনা কালের দৃশ্য বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। মনে হল, এই পৃথিবীতেও আমরা এই রকম মায়াবদ্ধ হয়ে পড়ি। পরমায়ু শেষ হলে চির-পরিচিত ঘর দুয়ার, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে যেতে না জানি কত কষ্টই না হয়।

"তমিয়াসেন ও তার বাপ মা আমার কাছে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে বিদায় নিতে এল। আমি সুদূর ভবিষ্যতে আর একবার জাপানে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করব বলায় তারা জাপানী পদ্ধতিতে আমায় প্রণাম করে বিদায় নিল।

"বন্দরে নামবার পূর্ব্বে ইউনাইটেড ষ্টেটের ইমিগ্রেসন অফিসার ও পোর্ট হেলথ অফিসার এসে আমাদিগকে অনেক প্রশ্ন করলেন। আমরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী বোলে একখানি ফরম সই করে দিয়েই নিষ্কৃতি পেলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর ও এসিয়াটিক ষ্টীয়ারেজের যাত্রীদের শরীরে কোন খোস পাঁচড়া আছে কিনা, হুক্ ওয়ার্ম আছে কিনা, চোখের দৃষ্টি ঠিক আছে কিনা এ সব পরীক্ষা দিতে হল ও তাহারা যাতে Stranded হয়ে যুক্ত রাজ্যের গলগ্রহ না হয়, সে জন্য তাহাদের ৩০ ডলার অর্থাৎ এক শত টাকা মজুত আছে কিনা দেখাতে হল।"

গল্পপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু শরৎচন্দ্র আমেরিকার সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি যুক্ত রাজ্যের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববৃহৎ, সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম আমার ডায়েরী দেখিয়া তাহাই বলিলাম :—

সান্‌ফ্রান্সিসকো সহরে পৌঁছিয়াই প্রথম আগন্তুকের কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—এ দেশে মালবাহী মুটে মজুর নাই, সকলেই নিজ নিজ জিনিষ পত্র বহন করিতেছে ; রাস্তাগুলি আধুনিক ধরণে নির্ম্মিত—সুপ্রশস্ত, সরল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তায় থুথু, দিয়া-শলাইয়ের কাঠি, চুরুট, লেবুর খোসা বা কাগজপত্র ফেলা নিষিদ্ধ। বাড়ীগুলি ৭ তলা হইতে ৭০ তলা পর্য্যন্ত উচ্চ, এগুলিকে, Sky Scrapers বলে। প্রত্যেক বাড়ীতেই লিফ্‌ট, টেলিফোন, রেডিও ও ইলেকট্রিক আছে। প্রত্যেক পাঁচজন অধিবাসীর মধ্যে একজনের একটি মোটরকার আছে। পদাতিক লোকজন, গাড়ী ঘোড়া ও মোটর প্রভৃতি রাস্তার বাঁদিকের পরিবর্ত্তে ডানদিক দিয়া চলে।

রাত্রে আমাদের দেশে রাজা বা রাজপুত্র আসিলে বিশাল নগরীসমূহ দীপাবলী মণ্ডিত করিয়া যেরূপ সুসজ্জিত করা হয়, এখানে প্রত্যহ বিরাট সৌধ-শ্রেণীর

গবাক্ষ পথে সেইরূপ শোভা দৃষ্ট হয়। তাহার উপর নীল আকাশের নীচে বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোক সংযুক্ত ফ্রেমে আঁটা বিজ্ঞাপনের চলন্ত ছবিগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে।

দেখিলাম, চারিদিকে লোক-সমুদ্র যেন বৈদ্যুতিক বেগে ছুটাছুটি করিতেছে। সকলেরই সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ, সুস্থ দেহ ও উৎসাহভরা মন দেখিয়া কবি হেমচন্দ্রের কথা মনে পড়িল—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়।
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়॥"

গ্রাস করিবার বাকি কিছুই দেখিলাম না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী, কোটিপতি ও বহু কোটিপতির সংখ্যা সব এই দেশে! সমগ্র পৃথিবীর মোট সোনার অর্দ্ধেকের বেশী আমেরিকায় পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। নিউইয়র্ক সহরের এক 'ওয়াল ষ্ট্রীটে' যে ধন আছে, সমস্ত ইউরোপে তাহা আছে কিনা সন্দেহ। ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত রাজন্যশক্তি আমেরিকার নিকট বিপুল ঋণজালে আবদ্ধ, সকলের মাথার টিকি এখানে বাঁধা।

বুদ্ধি বিজ্ঞানের আলোকে দীপ্ত মার্কিনবাসিগণ নব নব আবিষ্কার-বুদ্ধি ও বিস্ময়কর প্রতিভার দ্বারা কৌশলে সমস্ত জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া যেন সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমাকেও বিপন্ন করিতে বসিয়াছে!

প্রকৃতি-দত্ত বৈভবে এ দেশ অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও আমেরিকার লোকের মতে তাহাদের দেশে যেখানে যাহা আছে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—সমস্তই সুপারলেটিভ ডিগ্রীর !

(১) সর্ব্ববৃহৎ গভীর মহাসমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর ৬,৮৬,৩৪,০০০ বর্গ মাইল। গভীরতা ৩৪,২১০ ফুট।

(২) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী—মিসিসিপি ৩১৬০ মাইল।

(৩) সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষ—ক্যালিফোর্ণিয়ার মারিপোসা অরণ্যের মধ্যে 'ওয়াওনা' বৃক্ষ প্রত্যেকটি ২৭৫ ফুট উচ্চ, বেড় প্রায় ৪০ ফুট। গাছের মধ্যে যে সুড়ঙ্গ কাটা আছে তাহার ভিতর দিয়া আমাদের টুরিষ্টকার (জুড়ী গাড়ী) অনায়াসে চলিয়া গেল। এখানে পনর মাইল-ব্যাপী এরূপ বৃক্ষের গভীর জঙ্গল আছে।

(৪) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পদ্ম ফুলের গাছ 'ভিক্টোরিয়া রিজিয়া', এক একটি পাতার বেড় প্রায় দশ ফুট। জলে ভাসমান এই পাতার উপর একটি বালিকাকে বসাইয়া ফটো তুলিতে দেখিলাম।

(৫) সর্ব্ব বৃহৎ পানামা খাল আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যোগ করিয়াছে।

(৬) পৃথিবীর সর্ব্ব বৃহৎ ফেরী বোটের উপর আমরা ইঞ্জিন ও সমস্ত ট্রেণ শুদ্ধ চড়িয়া সান্‌ফ্রান্সিসকো উপসাগর পার হইয়া 'সাক্রামাণ্টো' গিয়াছিলাম।

(৭) সর্ব্ব বৃহৎ সস্‌পেন্সন ব্রিজ (Brooklyn Suspension Bridge) এই শ্রেণীর সেতুর মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, দেড় পোয়া প্রস্থ জলের উপর ৫৯৮৯ ফুট দীর্ঘ, মধ্যভাগে ১৫৬৩ ফুটের এক 'স্প্যান'। দেড় কোটি ডলার ব্যয়ে নির্ম্মিত।

(৮) পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা—এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং ১২৫০ ফুট উচ্চ; উল্‌ওয়ার্থ বিলিন্ডং ৭৫০ ফুট উচ্চ, ৫৭ তলা। লিফ্‌টে করিয়া এই বাড়ীর উপর উঠিয়া নীচে কিছু দেখিতে পাইলাম না।

(৯) স্থাপত্য বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—অট্টালিকা স্থানান্তরিত করিবার কৌশল আমেরিকানদের মত কেহই জানে না। ইহারা বড় বড় ইমারত বাটীর তলা কাটিয়া সম্পূর্ণ বাড়ীটিকে রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া অনায়াসে বহুদূরে বসাইয়া দিতেছে। আমরা এরূপ একটি বাটীর উপর দাঁড়াইয়া ফটো তুলিলাম।

(১০) চাষ বাসের বহু অভিনব যন্ত্রপাতির মধ্যে একত্রে ৩৩টি অশ্বের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিতে দেখিলাম। এইরূপে দৈনিক ৬০ হইতে ১২৫ একার জমি চষা হয়।

(১১) চলাচলের জন্য রাস্তার উপর ট্রাম, ট্যাক্সি, বাস্, প্রাইভেট কার ভিন্ন মাটির ১৪ ফুট্ নীচে 'সবওয়ে কার' ও ১০০ ফিট্ নীচে 'টনেল কার' রেল আছে। এই

সকল রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিতে লিফ্‌ট (Lift) ও ঘূর্ণমান সিঁড়ির (Revolving Stairs) এর সাহায্য লইতে হয়।

(১২) মাটির নীচে আমাদের দেশের হাওড়া ও শিয়ালদহের অপেক্ষা বড় বড় ষ্টেশন আছে। নিউ ইয়র্ক সহরের 'গ্রাণ্ড সেন্‌ট্রাল্‌ টারমিনেল,' পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় রেলওয়ে ষ্টেশন, ইহাতে ৪৭টি প্লাট্‌ফরম আছে।

(১৩) (Elevated Rail Road) পথচারীদিগের মাথার উপর দিয়া ২৫ হইতে ৭০ ফুট্‌ পর্য্যন্ত উচ্চ রাস্তার পুলের উপর রেল চলিতেছে। ষ্টেশন প্রভৃতি সমস্তই উপরে, যাঁহারা ৪।৫ তলা বাড়ীতে বাস করেন তাঁহাদের রাস্তায় নামিতে হয় না, বারাণ্ডার সম্মুখেই ষ্টেশন।

(১৪) পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ থিয়েটারের ষ্টেজ্‌—'সিকাগো হিপোড্রাম থিয়েটার'। এই ষ্টেজে একত্রে এক হাজার অভিনেতা অভিনেত্রীকে অভিনয় করিতে দেখিলাম।

(১৫) স্বাধীনতা দেবীর বিরাট মূর্ত্তি (Statue of Liberty) ১৫১ ফুট উচ্চ। ইহা ফ্রান্স দেশের উপহার। একটি দ্বীপের উপর স্থাপিত, মূর্ত্তির শিরোদেশে বৈদ্যুতিক আলো আছে। পেটের ভিতরকার সিঁড়ি দিয়া মাথার উপর উঠিয়া দেখিলাম, সহরের দৃশ্য অতি মনোহর।

(১৬) নিউ ইয়র্ক সহরে প্রায় এক সহস্র সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৫০ খানি দৈনিক ও ৫।৭ খানি দিনে তিন বার প্রকাশিত হয়। 'নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড' দৈনিকখানি প্রত্যহ দশ লক্ষ বিক্রয় হয়। এই কাগজের পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধিক কাটতি!

(১৭) পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধনী 'জন ডি রক-ফেলার হইতে 'ভাণ্ডরবিল্ড', 'উইলিয়ম এষ্টর', 'কার্ণেজি' ও 'হেনরী ফোর্ড' প্রভৃতি দশ বার জন বহু-কোটি-পতির বাস এই দেশেই। 'রকফেলারের' দৈনিক আয় হিসাব করিয়া দেখিলে প্রায় আমাদের দেশের এক লক্ষ টাকা। এই প্রাতঃস্মরণীয় দানবীরগণের দান শুধু নিজ দেশ ও সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে। বহু দেশ বিদেশের কল্যাণের জন্য ইঁহারা মুক্ত হস্তে কোটি কোটি টাকা দান করিয়া থাকেন। যুক্তরাজ্যে এমন বড় সহর নাই, যেখানে রকফেলার ও কার্ণেজির সাহায্যপুষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় নাই। ইঁহাদের স্থাপিত অবারিত পাঠাগারে লক্ষ লক্ষ লোক গ্রন্থপাঠের সুবিধা লাভ করিয়া থাকে।

(১৮) এদেশের ধনীরা খেয়ালের বশে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের দুষ্প্রাপ্য ছবি, অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ও ডাক্ টিকিট ক্রয় করা ইঁহাদের একটি প্রধান খেয়াল (Hobby)। সময় সময় এগুলিকে নীলামে শত গুণ বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রীত

হইতে দেখিয়াছি। আমার বিশ্বাস যত্তপি কেহ একপাটি চটি জুতা দিল্লীর সম্রাট ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তবে সেটি এদেশে অনায়াসে লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে।

(১৯) সিকাগো সহরে কংগ্রেস হোটেলে আমরা মাত্র তিন দিন ছিলাম। হোটেলটি মিসিগান হ্রদের ধারেই অবস্থিত। বাড়ীটি মোট ১৭ তলা, মাটির নীচে ৩ তলা ও উপরে ১৪ তলা। রাস্তার সম্মুখভাগ ৩৭০ ফুট লম্বা। বাড়ীটির মূল্য ৭০,০০,০০,০০০ (?) সত্তর কোটি ডলার, তাঁহার বিচিত্র সাজ সজ্জা ও আসবাব পত্রের মুল্য ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটি ডলার। এই হোটেলে ১২০০ শত প্রকোষ্ঠ আছে। দৈনিক চার্জ্জ ১০ ডলার হইতে ১০০ ডলার পর্য্যন্ত। এই হোটেলে ব্যবহারের জন্য মাটির নীচে সর্ব্ব নিম্নতলায় পুষ্করিণীতে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মাছ, কচ্ছপ, ও শামুক প্রভৃতি রক্ষিত আছে, তাহার উপর তলায় ভেড়া, শূকর, হাঁস মুরগী প্রভৃতি পশু পক্ষী প্রতিপালিত হয়, তাহার উপর তলায় রান্না হয় এবং প্রতি ঘরে কলের সাহায্যে আহার্য্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। 'চেম্বার মেড', 'ভ্যালেট', 'ওয়েটার' প্রভৃতির আবশ্যক হয় না। আহার্য্য সামগ্রী, আরাম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের রাজকীয় ব্যবস্থা দেখিয়া হোটেলটিকে ইন্দ্রপুরী বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ আমোদ

প্রমোদ ও রাজ সম্ভোগ এই আমেরিকান হোটেল-গুলিতেই সম্ভব। যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে এই হোটেলে দিন যাপন করিতে চান, তাঁহারা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই দেখিবেন, কক্ষতল ভেদ করিয়া নীচে হইতে যন্ত্র সাহায্যে একটি আধারের উপর এক কাপ চা, টোষ্ট ও একখানি সংবাদ পত্র আসিয়াছে। ভোজনাগারে টেবলের উপর সস্ত্রীক খাইতে বসিলে দেখিবেন, যন্ত্র সাহায্যে খাদ্যের ডিস্‌খানি সর্ব্বাগ্রে আপনার স্ত্রীর নিকট আসিবে পরে আপনি পাইবেন। খাইতে খাইতে কোন খাদ্য দ্রব্যের পুনরায় আবশ্যক হইলে, সেই খাদ্যদ্রব্যের ডিসখানিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ মাত্র, যন্ত্র সাহায্যে আর এক ডিস আসিয়া উপস্থিত হইবে। খাওয়া শেষ হইলে সমস্ত ডিস্ একটি আধারে রাখিবামাত্র যথা স্থানে চলিয়া যাইবে। স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে এই আশ্চর্য্য কলকারখানার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সহজে বুঝা যায় না। ছাদের উপর প্রমোদোদ্যান, জলের ফোয়ারা, ভিতরে মিউজিক হল, সিনেমা, ব্যায়ামাগার, পম্পিয়ান বাথ, ডাইনিং হল, ধোবাখানা, হেয়ার ড্রেসিং সেলুন, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা, রেডিও, প্রতি কক্ষে টেলিফোন প্রভৃতি মনোমুগ্ধকারী ব্যবস্থাগুলি দেখিবার জিনিষ। সাধারণকে এই হোটেল শুধু দেখিবার জন্য দশ ডলার দর্শনী দিতে হয়।

(২০) সিকাগো সহরে জগতের সর্ব্বপ্রধান গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর ক্রয় বিক্রয় ও বধ্য-ভূমি দেখিলাম। এটিকে (Union Stock-yard) বলে। এখানে প্রতিদিন গড়পড়তা ৬০,০০০ ষাট হাজার ভেড়া, ৭,০০০০০ সাত লক্ষ শূকর ও ৫০,০০০ গরু বধ করা হয়। রেফরিজেটারে এখানে মাংস অনেক দিন রাখা হয় এবং হস্তস্পৃষ্ট না হইয়া কলের সাহায্যে টিনের কৌটায় ভরিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান যায়। জীবজন্তুর চর্ম্ম, শৃঙ্গ, হাড়, চর্ব্বি ও রক্ত হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় যত দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার একটি প্রদর্শনী করিয়া এখানে রাখা হইয়াছে।

(২১) বাল্যকালে লণ্ডনের টেমস্ টনেল সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম—

"উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,
অপরূপ আর কিবা আছে অতঃপর।"

এখন নিউইয়র্ক সহরে প্রায় দেড় মাইল প্রস্থ হাড্‌সন নদীর মাটির তলায় (Silt) এক শত ফুট নীচে টনেল কাটিয়া তাহার মধ্য দিয়া ইলেকট্রিক রেল নিউজার্সি সহরে গিয়াছে। এখন 'টেমস টনেল'কে কেহই আর পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম বলিয়া গণ্য করে না।

(২২) এখন আমেরিকার শক্তি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইংলণ্ডের শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা শত

শত আবিষ্কার দ্বারা বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর রূপ নানাভাবে বদ্‌লাইয়া দিয়াছে। প্রথম এরোপ্লেন, টেলিফোন, গ্রামোফোন, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, ফটোফিল্মস্ ও রিভলভার প্রভৃতি সমস্তই আমেরিকায় আবিষ্কৃত।

(২৩) আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান কয়েকটি ইউনিভারসিটি দেখিয়াছি। এগুলিতে প্রকৃতই শিক্ষা দেওয়া হয়, শুধু কেরাণী ও উকিল তৈয়ার হয় না। শিক্ষার্থীর পক্ষে আমেরিকার মত সুবিধাজনক স্থান পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। এখানকার ছাত্ররা যে কোন প্রকারে হউক পৃথিবীর ভিতর তাহাদের আপন পথ পরিষ্কার করিয়া লইবে ইহা সুনিশ্চিত।

(২৪) ইউনিভারসিটি ও কলেজ ছাড়া এ দেশে আরও অনেক প্রকার নৈশ-বিদ্যালয় দেখিলাম, যেখানে সংবাদপত্র পরিচালনা, উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি রচনা, বক্তৃতা শিক্ষা, ইনসিওরেন্স, দালালী, ধোবা, নাপিত, মুচি ও পাচক প্রভৃতির কর্ম্ম, এবং নৃত্যগীত ও অভিনয় শিক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। আত্মোন্নতির সুবিধা সুযোগ এখানে এত বেশী যে, যে কেহ আপনার দারিদ্র্য স্বীয় পরিশ্রমের ফলে দূর করিতে পারে।

(২৫) পৃথিবীর সর্ব্বাশ্চর্য্য আমোদ-প্রমোদের স্থান নিউইয়র্ক সহরের উপকণ্ঠে 'কোনি আইল্যাণ্ড।' এই স্থানে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে একটি বিরাট প্রদর্শনী হয়।

নয়ন তৃপ্ত করিবার দৃশ্য, প্রাণ জুড়াইবার বস্তু, নানাবিধ বিলাস দ্রব্য ও আমোদ-প্রমোদের এরূপ বিরাট সংগ্রহ আর কোথাও নাই। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত এটিও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান। এই বিরাট প্রদর্শনীতে যে কত কাণ্ডকারখানা আছে, শুধু তাহার তালিকা দেওয়াও সাধ্যাতীত ব্যাপার। মোটামুটি কয়েকটির নাম উল্লেখ করিলাম ঃ—

(ক) প্রবেশ করিয়াই একটি ফটোগ্রাফারের কলের উপর দাঁড়াইয়া একটি মুদ্রা ছিদ্রপথে ঢুকাইয়া দিবামাত্রই ফ্রেম সমেত একখানি নিজের ফটো পাইলাম।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন তাঁবুর মধ্যে পৃথিবীর বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ও পালোয়ান, প্রসিদ্ধ বাজীকর ও ঐন্দ্রজালিক, সুবিখ্যাত গায়ক, নর্ত্তকী ও সাঁতারু, অত্যাশ্চর্য্য হাস্যরসিক ও জ্যোতির্বিবদ একত্র সমবেত হইয়া তাঁহাদের ক্রীড়াকৌশল ও অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে।

(গ) একটি বিরাট হোটেলের মধ্যে চারি হাজার লোক একত্র বসিয়া ডিনার খাইলাম।

(ঘ) একটি তাঁবুর মধ্যে ৮ ফুট লম্বা দীর্ঘকায় এক বিরাট পুরুষ ও মাত্র ২ ফুট লম্বা ক্ষুদ্রকায় পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রীলোক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

(ঙ) একস্থানে বিচিত্র আতসবাজী প্রদর্শন ও অন্য

স্থানে সবমেরিণ, টর্পেডো বোট, মাইন প্রভৃতি জলযুদ্ধের সরঞ্জাম সংগৃহীত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

(চ) একটি মহিলা অল্প সময়ের মধ্যে আমার আকৃতির 'পেন্সিল স্কেচ্' করিয়া দিলেন। মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে ইঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। হাসিমুখ বদ্লাইয়া কান্নামুখ করাইতে হইলে আধ ডলার বেশী দিতে হয়।

(ছ) একজন জ্যোতিষী আমার কপাল দেখিয়া নাম ও ভাগ্যফল বলিয়া দিল।

(জ) এক ভদ্রলোক দাঁড়ী পাল্লা খাটাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে যাইবামাত্র তিনি লোকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দেহের ওজন কত বলিয়া দিতেছেন। ওজন হইয়া দেখিলাম তাঁহার অনুমান সত্য।

এই স্থানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। তাহারা ভোগ সুখের, চূড়ান্ত আমোদ আহ্লাদের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে।

(২৬) এ দেশে কাজ খুঁজিলেই পাওয়া যায় এবং সকল কাজেরই নির্দ্দিষ্ট মজুরী আছে। মজুরীর মূল্য খুব উচ্চ-হারে ধার্য্য। সামান্য মজুর দৈনিক দু'ডলার অর্থাৎ ৬৷৹ রোজগার করে। ছুতর মিস্ত্রির মজুরী চার ডলার, রাজমিস্ত্রী ও ছাপাখানার কম্পোজিটার প্রত্যেকে পাঁচ ডলার পায়।

মজুরী দুর্মূল্য বলিয়া অধিকাংশ কাজই কলে সম্পন্ন হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা ব্রুস করা, পোষ্টাফিসে চিঠি পাঠান যায় এবং কলের সাহায্যে (Slot Machine) রাস্তায় গরম চীনা বাদাম, সোডা লেমনেড্ ও জলযোগের সমস্ত জিনিষ পত্র পাওয়া যায়। কোন অফিসে গিয়া শিক্ষানবিশ (Apprentice) থাকিবার প্রস্তাব করিলে তাহারা পাগলা গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। কাজের কোনরূপ বাছ বিচার নাই অবস্থা বিশেষে সকলে সব কাজই করে।

"Honour and shame from no condition rise
Act well your part, there all the honour lies."

এ কথাটির মর্ম্ম আমেরিকানরাই বোঝে।

ভারতীয় স্বাবলম্বী ছাত্ররা এ দেশে ভদ্র পরিবারে গৃহস্থালীর কাজ, হোটেলে পরিবেষণ ও বাসন পত্র ধুইবার কাজ, রেলওয়ে কুলীর কাজ, ফলের বাগানে ফল সংগ্রহের কাজ, ডায়েরী ফার্ম্মে দুধ বিতরণের কাজ, সংবাদপত্র বিলির কাজ ও মনোহারী জিনিষ পত্র ফেরি করিয়া দৈনিক দু'তিন ডলার রোজগার করে।

কয়েকটি মেধাবী বাঙ্গালী যুবকের সহিত আলাপ হইল, তাহারা লোকের বাড়ী ছোট খাট মজলিসে গল্প বলিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে।

ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, রীতিনীতি ও ভারতীয় কৃষ্টি

সম্বন্ধে ভাল বক্তৃতা দিতে পারিলে এ দেশে যথেষ্ট রোজগার হয়। আমেরিকায় সাধারণ লোকে এক ডলার বা আধ ডলার মূল্যের টিকিট কিনিয়া বক্তৃতা শুনিতে যায়। শুনিয়াছি স্বামী বিবেকানন্দের অজ্ঞাতসারে কোন চতুর লোক প্রথমে তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ১৩টি বক্তৃতা দিয়া তের হাজার ডলার পাইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের আত্মীয় বসন্তকুমার ব্যানার্জি সিক্যাগোতে বক্তৃতা ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া 'রেভারেণ্ড ব্যানার্জি' উপাধি পাইয়াছিলেন এবং এক ধর্ম্মযাজকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া একখানি বাড়ী উপঢৌকন পাইয়াছিলেন।

(২৭) জগদ্বিখ্যাত নায়েগ্রা জলপ্রপাত আমেরিকার গৌরব। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক দিগ্‌দিগন্তর হইতে আসিয়া এই মহাতীর্থে সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তির পূজা করিয়া শত মুখে নায়েগ্রার প্রশংসা করিয়া যায়। কবিরা বলেন—"Nature has many Waterfalls and Cataracts, but only one Niagara. The power and majesty of the All-Mighty is here more grandly exhibited and realized than in any other scene on earth."

সিকাগো হইতে রেলপথে এখানে আসিতে চৌদ্দ ঘণ্টা সময় লাগে। এই প্রপাতটি দুই দিক দিয়া দেখিতে হয়। আমেরিকার দিক হইতে ও অপর পার্শ্বে ক্যানাডা হইতে। আমেরিকান প্রপাত ১৬৪ ফুট্ উচ্চ ও ৬০০ ফুট্ প্রস্থ। ক্যানাডীয় প্রপাতের খাড়াই ১৫০ ফুট, পরিসর (এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত সোজাভাবে) ১৮০০ ফুট্। যে গর্ত্তে জল পড়িতেছে তাহার পরিসর ১০০০ ফুট্। পতনশীল জলের চাদর ২০ ফুট্ পুরু। জলের ভীষণ বেগ। নীচে তাকাইলে বোধ হয় যেন আমাদিগকে এখনই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

এখান হইতে অল্প দূরে ১৩২ ধাপের সিঁড়ি দ্বারা ৮০ ফুট্ নীচে নামিয়া বর্ষাতি-কোট্ গায়ে দিয়া পবন গুহায় (Cave of winds) প্রবেশ করিলাম, এই গুহার খাড়াই ১০০, পরিসর ১০০ ও ব্যাস ৬০ ফুট্, সম্মুখে স্বচ্ছ চাদরের মত প্রপাত ৪০ ফুট্ ব্যবধান, জলের ছিটাতে (Spray) সর্ব্বদাই পাশাপাশি ২।৩টি রামধনু বর্ত্তমান। কি বিচিত্র, কি মহান, কি উদার সে দৃশ্য—দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের একটি বিরাট রূপ।

সস্‌পেনসন ব্রিজ পার হইয়া ওপারে ক্যানাডা যাইবার সময় পুলের উপর ক্যানেডীয় গবর্ণমেণ্টের অফিসে আমাদিগকে একখানি ফরম সই করিয়া দিতে

হইল যে, "আমরা পর্য্যটক, আজই ফিরিয়া আসিব, ক্যানাডায় বাস করিব না" এবং গ্যারাণ্টীর জন্য ১০ ডলার জমা রাখিতে হইল।

অশ্বনাল প্রপাত (Horse shoe-fall) দেখিবার জন্য 'টেবেল রক' নামক একটি পাহাড়ের ভিতর টনেলে প্রবেশ করিলাম। টনেলে প্রবেশ পথে লিফটের ভাড়া একটি রবার স্যুট ও একজন পথিপ্রদর্শকের মজুরী সমেত সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০ সেণ্ট দিতে হইল। টনেল পার হইয়া প্রপাতের সম্মুখেই লৌহ রেল বেষ্টিত স্থান, নীচেই ভীষণ ব্যাপার, সর্ব্বদাই ঝড় বহিতেছে, জল ও বায়ুর শব্দে প্রকৃতি মহানন্দ ভরে এখানে যে গান ধরিয়াছেন মানবের সাধ্য কি যে সে গান বুঝে!

এইখানে বর্ষাতি-কোট ও টুপি পরিহিতা একটি ভদ্রমহিলা দর্শককে পুরুষ মনে করিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলাম।

(২৮) নায়েগ্রার স্রোত (Water power) শক্তিতে চালিত হইয়া এখানে এক প্রকার রেলগাড়ী ও কয়েকটি কাগজের ও এলমুনিয়ম ফ্যাক্টারীর কাজ অতি সুন্দররূপে চলিতেছে দেখিলাম।

(২৯) প্রপাতে দক্ষিণ ফটকের সম্মুখে একটি জ্বলন্ত প্রস্রবণ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইলাম। ইহা পৃথিবীর অভ্যন্তরীন স্তর হইতে উৎপন্ন ফুটন্ত জলের অফুরন্ত

ফোয়ারা। প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ ইহা আবিষ্কার করিয়াছিল।

(৩০) সানফ্রান্সিসকো হইতে সিকাগো আসিবার পথে রেলে ক্রমাগত চৌষট্টি ঘণ্টা কাটাইতে হয়। আমরা 'পুল্‌মান কার' বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাড়ীতে ছিলাম। এই গাড়ীতে বাদশাহী আরামের ব্যবস্থা। দিবাভাগে প্রত্যেক দুই জনের দুইখানি গদি-আঁটা আসন ও একটি টেবল স্থাপিত, রাত্রিকালে কলের দ্বারা ঐ স্থানে দুই থাক দুইটি শয্যা প্রস্তুত হয়, উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত পর্দ্দা ফেলা; উৎকৃষ্ট বালিশ, গদি, ওয়াড় ও চাদর প্রত্যহ পরিবর্ত্তিত। এই পর্দ্দার ভিতর একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আমার নীচের থাকে এক অপরিচিতা স্ত্রীলোককে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কোন ষ্টেশনে উঠিয়াছেন জানিতে পারি নাই। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার গায়ের উপর দিয়া উপরের থাক হইতে নামিতে পারিলাম না।

এই গাড়ীতে অতি সুসজ্জিত ড্রইং রুম, ধূমপানের কামরা, নাপিতের দোকান, স্নানের ঘর, খানার-গাড়ী প্রভৃতি সুখ-স্বচ্ছন্দতার চূড়ান্ত বন্দোবস্ত। পার্শ্বে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ব্যবস্থা থাকায় ইচ্ছামত কর্ম্মচারী বা ভৃত্যদের ডাকিতে পারা যায়। আমেরিকার রেলে ইঞ্জিন হইতে গার্ডের গাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াতের বন্দোবস্ত আছে।

ট্রেণের সব শেষ গাড়ীখানিকে পর্য্যবেক্ষণ-গাড়ী বা (Observation Car) বলে। এখানে ভেলভেট্ মোড়া আরাম চেয়ারে বসিয়া সকলে চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী দেখিয়া থাকে।

একদিন অপরাহ্নে পর্য্যবেক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলাম, হঠাৎ সহযাত্রী স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন, "Look here, 'Mirage', 'Mirage' ! How wonderful it is ! দেখ, দেখ মরীচিকা ! কত সুন্দর !" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

আমরা এ সময়ে একটি মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে-ছিলাম, এই লাইনটি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী জন, ডি, রকফেলারের। পাছে যাত্রীদের চোখে ধূলিকণা বা পাথর কুচি উড়িয়া পড়ে, সেইজন্য তাঁহার সমস্ত রেলওয়ে লাইন তৈলসিক্ত করিয়া রাখা হয়।

উঠিয়া দেখিলাম—মরুভূমি মধ্যে মরীচিকা। দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি—সীমা নাই, ব্যবধান নাই—কখন আপন ভাবে আপনি স্থির কখন চঞ্চল, কখন উদ্বেলিত—নয়নাভিরাম মহাসমুদ্র, ছায়া সমন্বিত দু' একটি বৃক্ষ ও পর্ণ কুটীর ! যেন ঐন্দ্রজালিক মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি ! যেন ছায়া চিত্রের একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ! অপ্রত্যাশিত ভাবে এই দৃশ্যটি দেখিয়া মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

(৩১) এই পথে মেক্সিকোর নিকটবর্ত্তী আরিজোনা প্রদেশে বর্ত্তমান শতাব্দীর নবাবিষ্কৃত অত্যাশ্চর্য্য গভীর পার্ব্বতীয় উপত্যকা (Grand Canyon of Arizona, Nature's grandest play-ground) প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি দেখিবার জন্য গাড়ী বদল করিলাম।

আরিজোনা উপত্যকার উপরে পর্ব্বত শৃঙ্গে ব্রাইট এঞ্জেল হোটেলে পৌঁছিয়া এখানে তিন দিন মাত্র ছিলাম। এই একটি মাত্র হোটেল ব্যতীত এই জনমানব শূন্য গিরি-সঙ্কটে অন্য বাসস্থান নাই বলিয়া প্রত্যহ ৯ ডলার হোটেল খরচ দিতে হইত। এই হোটেলে পৃথিবীর চারিদিকের যাত্রী সমবেত। ইহার অধিকাংশ আমেরিকান স্ত্রীলোক।

এই গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত হোটেল হইতে উপত্যকার অপর পার্শ্বের গিরিশৃঙ্গের ব্যবধান ১২ মাইল, মধ্যে এক মাইল গভীর ভীষণ খাদ। এই খাদটির পরিধি প্রায় ২৪ মাইল। ব্রাইট্ এঞ্জেল হোটেল হইতে খাদটির চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার সুন্দর পার্ব্বত্য পথ আছে। হোটেলের কয়েকখানি 'টুরিষ্টকার' প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে এই পথের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দর্শকদিগকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পর্ব্বত গাত্রের শোভা ও গভীর খাদ মধ্যে প্রকৃতির স্বহস্তে রচিত বিবিধ কারুকার্য্য দেখাইয়া থাকে।

এই খাদের সর্ব্বনিম্ন তল দিয়া ভীষণ বেগে কলারডো নদী প্রবাহিত। উপর হইতে জলের রেখা একগাছি

রূপার সূতার মত বোধ হয়। এই খাদটি গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদন সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে একটি সমুদ্র বিশেষ হ্রদ ছিল, কালের গতি প্রভাবে ইহার জল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং যাইবার সময় বৃহদাকার নগ্ন পর্ব্বতগাত্রের পাদদেশে স্থানে স্থানে কোথাও ভারতবর্ষের শিবমন্দির, কোথাও বর্ম্মিজ প্যাগোডা, কোথাও চীন দেশীয় সিনাগগ, কোথাও বহু দেবদেবীর অবিকল প্রতিকৃতি রাখিয়া গিয়াছে! হিমালয় দেখিয়াছি, কাঞ্চনজঙ্ঘার তুহিন-উষ্ণীষে অরুণ কিরণের বর্ণ বিন্যাস দেখিয়াছি, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য ও মনুষ্য রচিত শত শত আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়াছি, কিন্তু আরিজোনা উপত্যকায় মুক্ত-প্রকৃতির চির-বৈচিত্র্যময় লীলানিকেতনে প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত এই বিরাট দেবমন্দিরগুলি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম! কল্পনায় ভাবিয়া এ স্থানের ছবি আঁকা যায় না, প্রত্যক্ষ ব্যাপার দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কত যুগযুগান্তর হইতে এই খাদ এইভাবে বিদ্যমান আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

শুনিলাম, কয়েক বৎসর মাত্র এই স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে সান্‌ফ্রান্সিসকো বেদান্তমন্দিরের স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ ব্যতীত অন্য কোন ভারতবাসী ইতিপূর্ব্বে এস্থানে আগমন করেন নাই।

কালে এই স্থানটি যে পরিব্রাজকদিগের প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

একদিন এই হোটেল কর্ত্তৃপক্ষের বন্দোবস্ত মত আমরা ৮০ জন যাত্রী অতি প্রত্যুষে অশ্বতর পৃষ্ঠে কলারডো নদী ও আমেরিকার আদিম নিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদিগের বাসস্থান দেখিবার জন্য এই উপত্যকার এক পার্শ্বে অবতরণ করিলাম। পথ এত বিঘ্ন-সঙ্কুল ও আঁকা বাঁকা যে, এক মুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক হইলেই অশ্বতর শুদ্ধ আরোহিগণ একেবারে এক মাইল নীচে পড়িয়া যাইবে, কাহারও চিহ্ন মাত্র থাকিবে না।

পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া অতি কষ্টে গলদঘর্ম্ম হইয়া যাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এখানে একটি অভিনব দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। এই বিশাল পর্ব্বত গহ্বরে বিদ্যুতের আলোক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া একটি জ্বলন্ত আতস বাজীর ন্যায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় করিয়া দিল। পর্ব্বত গাত্রে সচরাচর যে দৃশ্য দেখা যায়, এখানে দেখিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! সম্মুখে পশ্চাতে ও পার্শ্বে বৃহদাকার বৃক্ষহীন পর্ব্বতগুলি লাল, নীল, হরিত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ভাবুকের "এই

বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।" গানটি মনে পড়িল। ভাবিলাম প্রকৃতির খেলা ভগবানেরই লীলা বিশেষ।

মধ্যাহ্নে কলারডো নদী তীরে পৌঁছিয়া সকলে তাঁবুতে আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। দেখিলাম, ভীষণ প্রচণ্ড বেগে নদীর জল কলতানে চারিদিক মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যেখানে বাধা পাইয়াছে, সেখানেই ফেনিল উচ্ছ্বাসে তাহার উদ্দাম গতিবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। বুঝি বা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে—সংসারে বাধা বিঘ্ন যদ্যপি আসে, ভগ্নোদ্যম হইও না, এই রূপ পূর্ণোদ্যমে প্রাণপণ চেষ্টা করিলে শত বাধা বিঘ্ন তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

সহযাত্রী মহিলাগণ মনের আনন্দে বালির চড়ায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর পর্ব্বত গাত্রে আদিম নিবাসীদিগের গ্রাম, তাহাদের বিচিত্র বেশ ও কুটীরাদি দেখিলাম। জনসাধারণের দৃষ্টিতে এই দেশ চিরকৌতূহলোদ্দীপক ও চির-রহস্যময়। ইহাদের স্ত্রীপুরুষের মূর্ত্তি বিকট, অনেকটা মোঙ্গলীয় জাতির চেহারা, কদর্য্য ভাবে বিকশিত।

দেখিলাম এ প্রদেশের লোকও অনেক বিষয়ে ভারতীয় ভাবাপন্ন। কয়েক জন কৌপীনধারী পুরুষ স্নান করিয়া একটি গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া আমরাও

তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেখিলাম এই গুহাটিকে তাহারা দেবমন্দিরে পরিণত করিয়াছে। একটি বেদীর উপর নানা বিচিত্র দেব দেবীর মূর্ত্তির সহিত মধ্যস্থলে জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। পুরীধামে জগবন্ধু মন্দিরে যেমনটি দেখিয়াছি ঠিক সেই রূপ কৃষ্ণবর্ণের হস্তপদ বিহীন দারুময় মূর্ত্তি, মুখের উপর বিশাল গোলাকার চক্ষুদুটি দ্বারা ভক্তের মন আকৃষ্ট করিতেছে। আমি এই মূর্ত্তির একখানি রঙ্গীন ছবি সংগ্রহ করিয়াছি।

মন্দির দেখিলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে,—উদ্দীপন হয়, বিশেষতঃ সহস্র যোজন দূরে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পর্ব্বত গুহায় নিহিত ভারতবর্ষের গৌরবের সামগ্রী দারু ব্রহ্মের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

দুই বন্ধুতে এই মূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিতেছি এমন সময় ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ আমাদের সহযাত্রী দুটি জার্ম্মাণ ভদ্রলোক আমাদিগকে পৌত্তলিক মনে করিয়া ঐ মূর্ত্তিটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের দেবতার হাত নাই কেন?" আমি উত্তর দিলাম—"মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং সেই কর্ম্মফল নিজ কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষয় করিতে হয়, ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কোন 'হাত' নাই। এই বিষয়টি স্মরণ করিয়া আমরা উপাস্য দেবতার 'হাত'

রাখি না !” এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি শুনিয়া তাহারা বড়ই প্রীত হইল। তাহার পর মূর্ত্তি পূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁবুতে ফিরিয়া লঞ্চ খাইয়া আবার যাত্রা করিলাম। এবার সটান খাড়াই উঠিয়া ফিরিতে হইল, জ্যোৎস্না রাত্রে সন্ধ্যার পর বহুকষ্টে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে আহারাদির পর হোটেল প্রাঙ্গনে বড় তাঁবুর মধ্যে রেড ইণ্ডিয়ানদের নাচের বন্দোবস্ত ছিল। দেখিলাম অনেকটা সাঁওতালী নাচের মত। হোটেলের দোভাষীর সাহায্যে ইহাদের সহিত কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম ভূত, প্রেত, ডাইন প্রভৃতির উপদ্রবের ত কথাই নাই, যাদু, মন্ত্র ও টোটকা ঔষধের প্রচলনও ইহাদের মধ্যে খুবই আছে।

ইহাদিগের বসবাসের জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র পার্ব্বত্য জঙ্গল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

গভীর রাত্রে দূরে ভীষণ দাবানল জ্বলিতেছে দেখিলাম। শুনিলাম বৃক্ষের সংঘর্ষণে এই অগ্নি উৎপন্ন হইয়া একাদিক্রমে কয়েকদিন জ্বলে ও আপনা হইতেই নিভিয়া যায়।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ‘পিমা পয়েণ্ট’ হইতে সূর্য্যোদয় দেখিবার আশায় তাড়াতাড়ি ‘টুরিষ্টকারে’ যাত্রা করিলাম। কয়েকটি আমেরিকান মহিলাও আমাদের সহযাত্রী হইলেন।

একটি বাঁকের মুখে উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বৃহদাকার একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র রক্ষিত আছে দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ঐ দূরবীক্ষণ সাহায্যে অনতিদূরে খাদের মধ্যে দেখিলাম, রেঙ্গুন সোয়েডাগন প্যাগোডার সদৃশ একটি বিরাট মন্দির। আশ্চর্য্য হইয়া চ্যাটার্জ্জিকে ইংরাজিতে বলিলাম—"দেখ, দেখ, Exactly like our Shwedagon Pagoda, ঠিক বর্ম্মা দেশের ফয়ার মত।"

আমার মুখ হইতে কথা কয়টি বাহির হইবামাত্র দেখিলাম, হঠাৎ আমার পিছন দিক হইতে একটি প্রৌঢ়া আমেরিকান মহিলা আমার পিঠে হাত দিয়া আনন্দে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"Are you from Burma, Have you seen the Rangoon Shwe Dagon Pagoda? আপনারা কি বর্ম্মা হইতে আসিতেছেন, সেখানকার সোয়েডাগন প্যাগোডা দেখিয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম—"হঁা, আমরা রেঙ্গুনের লোক, ঐ প্যাগোডা দেখিয়াছি।"

মহিলা—"May I enquire how many are you in a party? জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনারা দলে ক'জন আছেন?"

আমি—"আমরা মাত্র দুজন, আমি আর মিঃ চ্যাটার্জ্জি।"

মহিলাটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"Only two! Only two! pity. What is the pleasure there unless you are in a big party. We were 400 in a party and chartered a big steamer when we visited the East. মাত্র দু'জন! বেশী দলবদ্ধ হইয়া বাহির না হইলে আমোদ হয় না। আমরা যখন পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণে গিয়াছিলাম তখন একখানি জাহাজে একসঙ্গে চারিশতজন ছিলাম।"

আমি বলিলাম—"আপনারা ধনী লোক, ইচ্ছা করিলে সবই পারেন।"

তিনি বলিলেন—"It is no question of riches, one must have a strong desire to acquire knowledge by travelling. The mighty and wonderful world is the best testimony to All-Mighty God. Travel will reveal to you how amazing are His creations. ইহাতে অর্থ-প্রাচুর্য্যতার কোন কথা নাই, দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রবল ইচ্ছা থাকা চাই। বিস্ময়কর পৃথিবীই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম প্রমাণ। তাঁহার সৃষ্টি যে কত অদ্ভুত, দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বুঝা যায়।"

তাহার পর মহিলাটি বলিলেন—"I believe no

education is complete unless one makes a tour round the World. আমার বিশ্বাস একবার ভূ-পর্য্যটন না করিলে মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।" আমি বলিলাম—"দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা অনেকের আছে, কিন্তু সকলের অর্থ স্বচ্ছলতা নাই।"

মহিলাটি বলিলেন—"I know many rich men in India who have natural aversion for travelling. আমি ভারতবর্ষের অনেক ধনী লোকদের জানি যাঁহাদের দূর দেশ ভ্রমণের মোটেই ইচ্ছা নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা ভারতের কোন্ কোন্ স্থান দেখিয়াছেন ?

তিনি বলিলেন—"After landing at Bombay we been to Delhi, from Delhi we went to see the great Taj-Mahal, the dream in marble and the greatest wonder of the world. From Agra we visited Benares, Calcutta and Darjeeling. We had been to Belur Math also where we met Swami Brahmananda and noticed the greatness of that personality which the Swami's life embodied. বম্বে হইতে আমরা দিল্লী যাই, সেখান হইতে আগ্রায় মার্ব্বেলের স্বপ্নরাজ্য ও জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের শ্রেষ্ঠ তাজমহল দেখিয়া

বেনারস, কলিকাতা ও দার্জিলিঙ দেখিয়াছি। আমরা বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছি।"

আপনি আর কতদিন এখানে থাকিবেন জিজ্ঞাসা করায় মহিলাটি উত্তর দিলেন—"I have finally settled to leave Arizona by to-night, before I do I shall give you a list of places of interest you are to visite in this Country. আমি আজ রাত্রেই এখান হইতে চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির একটি তালিকা আপনাকে লিখিয়া দিয়া যাইব।"

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ায় তিনি পুনরায় বলিলেন—"To be plain and frank, don't be tempted by naughty Chicago girls, they will try to dupe you. They are very mischievous. সোজা কথায় আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, সিকাগো সহরের দুষ্ট মেয়েদের প্রলোভনে পড়িবেন না, তাহারা আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সুন্দরী একটি ভগিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া আমাদের সম্মুখে আনিয়া বলিলেন—"Here is a speciman of Chicago girl. এই একটি সিকাগো বালিকার নমুনা

দেখুন।" এই ব্যাপারে স্ত্রীলোক মহলে হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

অপরাহ্নে আমার হোটেলের টেবলের উপর ঐ ভদ্র মহিলা লিখিত একখানি দশ পৃষ্ঠা নির্দ্দেশ পত্র পাইলাম। তাহার মধ্যে সিকাগোর কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে আমাদিগকে সাহায্য করিবার অনুরোধ ও তাঁহার নিজের ঠিকানা দেওয়া আছে। বিদেশে এরূপ শিষ্টাচারসম্পন্না সদালাপী মহিলা বন্ধু পাইয়া নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিলাম।

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বার বার এই পার্ব্বত্য উপত্যকার অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা আরিজোনা প্রদেশ পরিত্যাগ করিলাম। বিদায়ক্ষণে ভাবিলাম,—"হে চির সুন্দর! তোমার ক্ষুদ্র পৃথিবীতে এত কাণ্ড, না জানি অক্ষয় বিশ্বভাণ্ডারে আরও কত নূতন নূতন শোভা রহিয়াছে।"

(৫২) সিকাগোর হোটেলে অবস্থান কালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহার মহান ত্যাগ, স্বদেশানুরাগ ও নির্য্যাতনের কথা পূর্ব্বেই জানা ছিল, এখন এই সুদূর বিদেশে তাঁহাকে পাইয়া কতদূর সুখী হইলাম তাহা বলিবার নহে। মিঃ দত্ত সহৃদয়তা গুণে বিশেষ আপন ভাবে আমাদের সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অনর্থক এই ব্যয়সাধ্য হোটেলে

থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি জানাইয়া তাঁহার সহিত এক আইরিশ পরিবারের মধ্যে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এই পরিবারের গৃহস্বামী সৈনিক কর্ম্মচারী বলিয়া বিদেশে থাকেন। গৃহকর্ত্রী দুইটি যুবতী কন্যার সহিত একটি দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করেন। তাঁহাদের নগদ টাকা কড়ি কিছু ছিল, অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্ততঃ বাড়ী ঘর ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ একা থাকিতে ভালবাসে না, সঙ্গী চায়, তাঁদের তাহারই অভাব ছিল, তাই ডাঃ দত্ত তাঁহাদের বাড়ীতে একটি ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন, এখন আমরা দুই বন্ধুতে মিলিয়া আর একটি ঘর লইয়া কিছুদিন এখানে রহিলাম।

ডাঃ দত্ত গৃহ-কর্ত্রীর সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটি প্রৌঢ়া হইলেও মুখখানি প্রসন্ন এবং দৃষ্টিতে সহৃদয়তা পরিস্ফুট। বিদেশী লোকের সহিত অকপট চিত্তে আলাপাদি করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না।

তাঁহার যুবতী কন্যাদ্বয়ের স্বভাব ও আচার ব্যবহার অতিশয় মধুর ছিল, তাহারা খোলা প্রাণে আমাদের সহিত মেলামেশা করিত। আমাদের দেশের মেয়েদের মত পরপুরুষের সহিত সমীহ করিয়া চলা-ফেরা করিতে অভ্যস্ত নয়।

ভদ্র-পরিবারের মধ্যে 'পেইং গেষ্ট' (Paying guest) হইয়া থাকার অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। এখানকার ভদ্র পরিবার, বাস্তবিকই সরল প্রেমময় স্বর্গের ছবি। সকলে সারাদিন এক বাড়ীতে এক সঙ্গে বাস, একত্র আহার, একত্র ভ্রমণ, এক বৈঠকখানায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ ও নানাবিধ গল্প গুজবে কাটাইয়া রাত্রে যে যাহার কক্ষে শয়ন করিতে যাইতাম। এই পরিবারের সংস্রবে আসিয়া এরূপ সুন্দর ও ভদ্র ব্যবহার পাইয়াছিলাম যে প্রবাসেও স্নেহময়ী জননী ও ভগিনীদিগের আদর যত্ন অনুভব করিতাম।

একদিন আমাদের কিছু জিনিষ পত্র কিনিবার প্রয়োজন হওয়ায় গৃহকর্ত্রীর ঐ যুবতী কন্যা দুইটি আমাদের পথিপ্রদর্শক হইয়া সিকাগোর ষ্টেট্ ষ্ট্রীটে মার্শাল ফিল্ড কোম্পানীর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দোকানে লইয়া গেল। পথে তাহারা গর্ব্ব করিয়া বলিয়া ছিল—"যে মানুষের পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে সমাধি কাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই কোম্পানীই তাহা সমস্ত সরবরাহ করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না। উহাদের এক লক্ষের উপর খরিদ্দার আছে যাহারা কখন দোকানে আসে না, শুধু ক্যাটালগ দেখিয়া টেলিফোন সাহায্যে ঘরে বসিয়া মাল পায়। এই সরবরাহ কার্য্যের সুবিধার জন্য এই কোম্পানীর

শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য মাটির নীচে ৬০ মাইল রেলপথ আছে।”

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাস্তবিক একটি কল্পনাতীত বিরাট ব্যাপার! যেন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। প্রায় শত বিঘা জমির উপর ষোল তলা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। তাহার মধ্যে মাটির নীচে চার তলা অবস্থিত। সর্ব্বশুদ্ধ সাত হাজার কর্ম্মচারী ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিতেছে, তাহার মধ্যে ৬৫০০ স্ত্রীলোক ও ৫০০ জন মাত্র পুরুষ। ১২টি লিফট্ খরিদ্দার লইয়া ক্রমাগত উঠা নামা করিতেছে, মুহূর্ত্তের বিরাম নাই! ২০০ শত বালিকা ফোনে অর্ডার সংগ্রহ করিতেছে, ১০০ শত বালিকা সেইগুলি টাইপ করিয়া নীচের তলায় সর্টিং বিভাগে পাঠাইয়া দিতেছে এবং সেখান হইতে বিভিন্ন বিভাগের সাহায্যে জিনিষপত্রগুলি প্যাক হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইতেছে।

দোকানের মধ্যে হোটেল, হেয়ার ড্রেসিং সেলুন ও ধোবীখানা ব্যতীত বিশ্রামাগার, লাইব্রেরী, সাধারণ পাঠাগার, প্রমোদোদ্যান, ফোয়ারা, ব্যাণ্ড, বায়স্কোপ, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ও টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবহার সকলেই বিনা ব্যয়ে করিতে পারে।

নানা বিভাগে নানাবিধ শাকশব্জী, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, মাখন, পণির, রুটী, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি

মিষ্টান্ন, পোষাক, পরিচ্ছদ, শয্যাদ্রব্য, জুতা, ছাতা, মনোহারী দ্রব্য, পুস্তক, সংবাদ পত্র, ছাপাখানার সরঞ্জাম, টাইপ রাইটার, বাদ্য যন্ত্র, মদ, চা, চুরুট, ঘড়ি, সোনা রূপা ও হীরা জহরতের অলঙ্কার, মোটর গাড়ী ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রভৃতি মানবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্তরে স্তরে সাজান আছে। বিভিন্ন বিভাগের মুদ্রিত ক্যাটালগ সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে বহন করা অসম্ভব।

এখানে অল্প জিনিষপত্র কিনিয়া ছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম ঐ জিনিষগুলি বাড়ীতে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

পার্শেলে বিদেশে পাঠাইবার জিনিষপত্র থাকিলে ইহারা তাহা প্যাক করিয়া নিজেদের পোষ্ট অফিস মারফত পাঠাইয়া দেয়।

ভারী জিনিষপত্র হইলে তাহা রেলে বুক করিয়া বাড়ীতে রসিদ পাঠাইয়া দেয়।

কোন খরিদ্দারের বিপদ আপদ ঘটিলে ফোন করিবা-মাত্র ইহারা ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী নার্শ ও ঔষধপত্র পাঠাইয়া থাকে।

বাড়ীতে আহারের সময় কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে ফোনে সংবাদ দিলে তাহা দশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পৌঁছায়।

বাটীতে বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ দিবার বন্দোবস্ত

করিলে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ভোজের মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁবু, চেয়ার, টেবল, প্লেট, গ্লাস, চামচ, কাঁটা ও তৈয়ারী আহার্য্য-সামগ্রী আনিয়া নিমন্ত্রিতদের খাওয়াইয়া চলিয়া যাইবে।

মৃতের সমাধির আবশ্যক হইলে ফোন করিবামাত্র শববাহী মোটরকার আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে শব লইয়া সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। সেখানে গিয়া দেখিবে সমাধি-খাদ প্রস্তুত ও ধর্ম্মযাজক সম্মুখে দণ্ডায়মান! ধন্য! আমেরিকার ব্যবসা-বুদ্ধি! বলিহারী তাহাদের কর্ম্ম-কৌশল!

এখানে সকলে একটি মোটা রকম লঞ্চ খাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিলাম। পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম এই যে, সঙ্গে লেডী থাকিলে রাস্তায় তাহাদের সমস্ত খরচপত্র সঙ্গী পুরুষদের বহন করিতে হয়।

(৩৩) এই সিকাগো সহরে অবস্থানকালে কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্রের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক। এই যুবকদলের মধ্যে কেহ কেহ পড়া-শুনা ক্ষতি করিয়া কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল তাঁহাদের নাম ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মিঃ এস, এম, বসু। এই যুবকদলের নিঃস্বার্থ প্রীতি ও ভালবাসার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা

একদিন সিকাগো-প্রবাসী সমুদয় ভারতীয় ছাত্রকে একটি প্রীতি-ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

ডাঃ সিংহের ল্যাণ্ড-লেডী অতি মধুর স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার গুণে ভারতীয় ছাত্রগণ এই প্রবাসেও বাড়ীর সুখ অনুভব করিতেন। ডাঃ সিংহ এই মহিলাটির সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিলে তাঁহার বাটিতেই ভোজের আয়োজন হইল এবং তিনি সকল বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিলেন।

আমার সঙ্গে ভারত হইতে আনীত কিছু চাল, ঘি, তেল, মুগের ডাল, চিঁড়া, কারি পাউডার ছিল এবং এখানে যতদূর সম্ভব অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সকলে মিলিয়া ইলেকট্রীক ষ্টোভে রান্না আরম্ভ করিলাম।

আমাদের গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার কন্যাদ্বয় ও ডাঃ সিংহের প্রতিবেশিনী কয়েকটি মহিলা আমাদের এই অভিনব ভারতীয় ভোজের ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি ক্যামেরা ছিল, তাঁহারা রান্নাঘরে আমাদের নানা অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ফটো তুলিয়া লইলেন, পার্লারে বসিয়া ভারতবর্ষের অনেক গল্প শুনিলেন। আমরা তাঁহাদের প্রত্যেককে প্লেটে করিয়া দু'এক চামচ পোলাও, কারি ও চিঁড়ার পায়স খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলাম।

তাহার পর সকলে মিলিয়া ডাইনিং রুমের সমস্ত

আসবাবপত্র সরাইয়া মেজের উপর কাগজ পাতিয়া অনেক দিনের পর সম্পূর্ণ দেশী ভাবে ঘির দ্বারা প্রস্তুত পোলাও কালিয়া আহার করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের আত্মীয় রেভারেণ্ড ব্যানার্জি ওরফে বসন্তকুমার ব্যানার্জি আসিয়াছিলেন। তিনি 'হোষ্ট' হিসাবে আমার প্রশংসা করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ইনি বার বৎসর আমেরিকায় বাস করিয়া দেশজ অধিকার লাভ করিয়া (Naturalised American) হইয়াছেন এবং বক্তৃতা ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এদেশে স্বচ্ছল জীবিকা অর্জ্জন করেন।

এই বসন্তকুমার ব্যানার্জি কোন বিশিষ্ট ধনীর সন্তান এবং শরৎচন্দ্রের মেসো অঘোরবাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা। ইনি প্যারিশ এক্জিবিশন্ দেখিবার জন্য পিতার অজ্ঞাতে তাঁহার তহবিল হইতে ১৫,০০০ হাজার টাকা লইয়া রেঙ্গুনে আসিয়া কয়েক দিন শরৎচন্দ্রের সহিত অঘোর বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। তাহার পর টমাস্ কুক কোম্পানীর অফিসে ১০,০০০ হাজার টাকা জমা রাখিয়া বাকি টাকা লইয়া প্যারিশ যাত্রা করেন।

প্যারিশ হইতে লণ্ডনে পৌঁছিয়া ব্যানার্জি জানিতে পারেন যে, তাঁহার কৃপণ পিতা অর্থশোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন এবং অঘোর বাবুর দ্বারা কোর্টের সাহায্যে

টমাস কুক কোম্পানীর অফিসের গচ্ছিত টাকাগুলি আটক করিয়াছেন। হাতের টাকাগুলি নানা প্রকার বিলাসিতায় নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ব্যানার্জি লণ্ডনে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। কিছুদিন স্বাবলম্বী অবস্থায় দৈনিক মজুরের কাজ করিয়া দিন যাপনের পর, তিনি বিশেষ কষ্টে পড়িয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের উত্তরে তাঁহার পিতা লিখিলেন —"তুমি আগে টমাস কুক কোম্পানীর নিকট লিখিয়া ঐ দশ হাজার টাকা আমায় ফেরত দাও, তাহার পর তোমার পত্রের জবাব পাইবে।"

মিঃ ব্যানার্জি অগত্যা তাহাই করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর পিতা ঐ টাকা ফেরত পাইয়াও তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি বিলাত হইতে অঘোরবাবুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এ সময় আমি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলাম এবং পেগুতে একটি চাকরী করিয়া দিয়াছিলাম। প্রায় এক বৎসর এই চাকরী করিয়া মিঃ ব্যানার্জি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং আমেরিকায় চলিয়া যান।

তিনি আমেরিকা হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ কাহিনী লিখিয়া আমাকে পত্র দিতেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর সানফ্রান্সিসকো হইতে তাঁহার আর কোন চিঠিপত্র না পাইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম ঐ বৎসরের ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে ব্যানার্জির নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে।

এইদিন সিকাগো ইউনিভারসিটির ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিবার সময় এদেশে আর কোন বাঙ্গালী আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, ডাঃ দত্ত বলিলেন—"রেভারেণ্ড ব্যানার্জি বলিয়া একজন আছেন কিন্তু তিনি বড়ই অহঙ্কারী, সম্প্রতি জনৈক আমেরিকান মিশনারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া কাহারও সহিত মেলামেশা করেন না।"

ডাঃ দত্তের মুখে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনিই আমার পুরাতন বন্ধু বসন্ত বাবু হইতে পারেন ভাবিয়া Y. M. C. A. সেক্রেটারীর নিকট তাঁহার ঠিকানা সংগ্রহ করিলাম।

বহু অনুসন্ধানের পর সিকাগো সহরে পথের দুই পার্শ্বে সুরম্য বিরাট অট্টালিকা শ্রেণীর সারি ও সুসজ্জিত অফুরন্ত দোকান পার হইয়া একটি ছোট বাড়ী—ততোধিক ছোট একটি সংসারের গৃহকর্ত্রীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটি কি রেভারেণ্ড ব্যানার্জির বাড়ী?" এই রূপলাবণ্য সম্পন্না যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কাহাকে চান?"

উত্তরে যেমন আমি বলিয়াছি রেভারেণ্ড ব্যানার্জিকে চাই, অমনই পিছন হইতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে ব্যানার্জি কহিলেন—"Hallo ! Girin Babu, what brought you here in this country ! গিরীন বাবু ! আপনি এই দেশে হঠাৎ কি জন্য এলেন ?"

কোথায় ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন সহর আর কোথায় আমেরিকার সমৃদ্ধিশালী সিকাগো নগরী ! এই সুদূর বিদেশে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ব্যানার্জি বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। আমি পরিহাসচ্ছলে বলিলাম— "Girin Babu is dead and gone long ago, it is his evil spirit standing before you. গিরীন বাবু অনেকদিন মারা গিয়াছেন, তাঁহার মৃত আত্মা এখন আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

ব্যাপার দেখিয়া মিসেস ব্যানার্জি অবাক হইয়া স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিতে ব্যানার্জি বলিলেন—"He is my very intimate friend of Rangoon. ইনি আমার রেঙ্গুনের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।" "Is that so ? তাই নাকি ?" বলিয়া তিনি অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

দেশে ব্যানার্জির বিবাহিতা পত্নী থাকা সত্ত্বেও তিনি এদেশে আবার পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে

তিনি বিপদগ্রস্ত হন এই ভয়ে তাঁহার পত্নীর সহিত আমার আলাপ করিয়া দিতে পারিলেন না বলিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া সিকাগো পাবলিক লাইব্রেরীতে বসিয়া তাঁহার প্রবাস জীবনের বহু সুখ দুঃখের কথা বলিলেন।

দেখিলাম, এই লাইব্রেরীতে প্রায় চারি লক্ষ পুস্তক সংগ্রহ আছে ও শত শত বিদুষী মহিলা সারি সারি বসিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে পুস্তক অধ্যয়নে রত আছেন। তাঁহারা কেহ আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না।

পরদিন রাত্রে একটি হোটেলে ভোজ দিয়া মিঃ ব্যানার্জি আমাদিগকে সিকাগোর নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই ষ্টেশনটি যুক্তরাজ্যের সমস্ত রেলওয়ে লাইনের সংযোগ স্থল। এখান দিয়া প্রত্যহ আড়াই লক্ষ লোক যাতায়াত করে। ষ্টেশন বিল্ডিংটি নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় হইয়াছে ২০০,০০,০০,০০০ ডলার।

মিঃ ব্যানার্জি বাঙ্গালীর সন্তান হইয়া কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে আপন প্রতিভা, উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে যুক্তরাজ্যের একটি প্রধান সহরে কিরূপ পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।”

(৩৪) শরৎচন্দ্র তাঁহার আত্মীয় রেভারেণ্ড ব্যানার্জির

কথা ও আমেরিকার সমস্ত আজব কাণ্ড কারখানার গল্প শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওদেশের মেয়ে পুরুষদের বিশেষত্ব কি দেখলে?"

আমি বলিলাম—"ওদেশে বিদ্যা বুদ্ধি বা অন্য কোন গুণ বিকায় না; ওদেশের সকল প্রকার মান মর্য্যাদার মূল্য ডলার। People are always busy after mighty Dollars. ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধন বৃদ্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই অত্যন্ত প্রবল। প্রবাদ আছে, আমেরিকানরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিতে চায়। They want to be born quick, their education to be finished quickly, they want to earn money quickly, they want to die quickly and they want to be buried quickly.

ইহারা এক মুহূর্ত্ত সময়ের অপব্যবহার করে না। বলে Time is ready money. সময়ের সদ্ব্যবহারই ধনবান হইবার প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহারা ট্রেণ ছাড়িবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনে যায়, অভিনয় আরম্ভ হইবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে থিয়েটার হলে প্রবেশ করে, সভা সমিতির নিমন্ত্রণে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়

নিতান্ত দরিদ্র সন্তানও প্রতিভা-বলে রাজ্যের

প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। এ সুবিধা আমেরিকার মত অন্য কোন দেশে নাই।

ইংলণ্ডের স্থায় এখানে নামের শেষে কেহ 'স্কোয়ার' শব্দ ব্যবহার করে না, কাহারও স্যার, ব্যারন, লর্ড প্রভৃতি উপাধি নাই, সকলে 'মিষ্টার', সকলেই সমান।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অতিরিক্ত স্ত্রী স্বাধীনতার কুফল স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিয়াছে, স্ত্রীলোকরা পুরুষের মত উন্নত হইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার ফলে গৃহস্থালীর প্রতি, সংসারের প্রতি তাহারা বড়ই উদাসীন। কর্ত্তা, গৃহিণী, পুত্র, কন্যা সকলেই আপন আপন খেয়ালে থাকে, সকলেই স্বাধীন ও উপার্জ্জনশীল। স্ত্রীলোকরা বলে—"দেশের যুবকরা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকুক, দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার করুক, জাহাজে নাবিক বা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক হইয়া দেশ রক্ষা করুক। অফিসের কাজ, কেরাণীগিরী কাজ আমাদের জন্য, তাহা আমরাই করিব।"

দেশের শতকরা নব্বই ভাগ কেরাণীগিরী ও দোকান-দারীর কাজে (Shop girls) স্ত্রীলোকরাই নিযুক্ত।

অবিবাহিত অবস্থায় আমোদ প্রমোদে, হাসি তামা-সায় বুক ফুলাইয়া বেড়ানই মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য। ইহারা গৃহধর্ম্মকে অবান্তর বলিয়া মনে করে।

যাহারা স্বপ্নের খেয়ালে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহা-

দের মধ্যে শুনা গিয়াছে এদেশে গড়পড়তা প্রতি চারি মিনিটে একটি করিয়া ডাইভোর্স হয়। এত ডাইভোর্স মামলা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। এ বিষয়েও তাহারা অন্যান্য দেশকে হার মানাইয়াছে।

(৩৫) একদিন নিউইয়র্ক সহরে বেড়াইতে বেড়াইতে পথে মিঃ চক্রবর্ত্তী নামক একটি যুবকের সহিত আলাপ হইল। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিবার সময় রেঙ্গুনে আসিয়া একবার আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়া বিশেষ আদর যত্ন পাইয়াছিলেন বলিয়া পরদিন তাঁহার বাসায় আমাদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

পরদিন তাঁহার বাসায় গিয়া দেখিলাম, মিঃ চক্রবর্ত্তী ও মিঃ সিকুনা নামক জনৈক জার্ম্মান ভদ্রলোক একসঙ্গে থাকেন। উভয়েই বিশেষ শিক্ষিত ও অবিবাহিত। মিঃ সিকুনা ব্যবসা করেন এবং মিঃ চক্রবর্ত্তী কোন রসায়নাগারে মাসিক দুইশত ডলার বেতনে চাকরী করেন। তাঁহারা উভয়ে একটি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া থাকেন। ঘরের আসবাব পত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার পারিপাট্য দেখিয়া মনে হইল, তাঁহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

কয়েকদিন যাতায়াতে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর মিঃ চক্রবর্ত্তীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে একটি সুন্দরী যুবতীর কয়েকখানি বিভিন্ন অবস্থায় গৃহীত ফটো

সুন্দরভাবে বাঁধান রহিয়াছে দেখিলাম। রূপসী কখনও ফুটন্ত ফুলবাগানের মধ্যে মোহিনী বেশে শায়িতা, কখনও পর্ব্বত পৃষ্ঠে বিচিত্র সজ্জায় দণ্ডায়মানা, কখনও মোটরকারে নিদ্রিতা, কখনও নদীবক্ষে ক্রীড়ারতা, কখনও সমুদ্র-সৈকতে বিশ্রামরতা। আপনার কক্ষের চতুর্দ্দিকে ঐগুলি কাহার ছবি জিজ্ঞাসা করায় মিঃ চক্রবর্ত্তী নৈরাশ্য-ভরা দৃষ্টিতে ছবিগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার ব্যর্থ প্রেমের একটি নিরাশ কাহিনী বলিতে লাগিলেন—"নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্ক একটি দেখিবার যোগ্য স্থান, বৈকালে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমাগমে ইহা খুব গুলজার হয়। একদিন সন্ধ্যাকালে ঐ পার্কে একটি বেঞ্চে একাকী বসিয়াছিলাম, হঠাৎ এই অসামান্যা সুন্দরীটি আসিয়া নিঃসঙ্কোচে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অযাচিতভাবে আলাপ সুরু করিয়াছিল। তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আমি বিস্মিত হইলাম। মুগ্ধবিস্ময়ে ঐ রূপ-লাবণ্যময়ীকে দেখিবামাত্র চুম্বুকের আকর্ষণে লৌহের ন্যায় আমি উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। গভীর নিঃস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে উভয়ে বসিয়া বহুক্ষণ কথা-বার্ত্তা হইল। এই চতুরা রমণী হাবভাব ও নানা রসিকতা দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। কুহকিনী রমণীর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি এবং মধুর প্রলোভন বচনে আমি বিচলিত হইয়া পড়িলাম।

এই রাত্রের বন্ধুত্ব স্থায়ী করিবার জন্য পরস্পরে কার্ড বিনিময় করিয়া সে রাত্রের মত বিদায় লইলাম। কার্ডে দেখিলাম উহার নাম 'বিউটি'।

বিউটি পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান, সম্পূর্ণ স্বাধীনা। একদিন রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিতে অযথা বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া সে মাতার মৃদু ভৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া একাকী স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া থাকে। সে স্বাধীনা হইলেও স্বেচ্ছাচারিণী নহে।

বিউটি একজন পরিচ্ছদ-শিল্পী। অভিজ্ঞ দর্জ্জির সাহায্যে পোষাক পরিচ্ছদে আর্ট ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সে সিদ্ধহস্তা। সহরের বিখ্যাত ফ্যাশন্ হাউসে সে মোটা বেতনে চাকরী করে। প্রত্যহ অপরাহ্নে সে নূতন নূতন পোষাক পরিয়া সহরের প্রসিদ্ধ পার্ক, থিয়েটার, মিউজিক হল প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে কখনও মোটরকারে কখনও পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন। শত শত বিচিত্র বস্ত্রের সাজসজ্জা শুধু খরিদ্দার ভুলাইবার জন্য।

বিউটি শুধু সুশ্রী নয়, অপরূপ সুন্দরী, অমন রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাহার সহকর্ম্মী আর যে কয়টি রূপসী নারী এই কাজে নিযুক্ত আছে বউটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী।

অনেকে এই অনিন্দ্য-সুন্দরী মায়াবিনীর অনুসরণ

করে ও অনেক রূপ-ধ্যান-মগ্ন যুবক যুবতী পতঙ্গের মত তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

নিত্য নূতন সৌখিন পোষাক-পরিচ্ছদের মোহে মুগ্ধ বিলাসিনী নারীগণকে বিউটি তাহাদের ফ্যাশন্ হাউসের ঠিকানা দিত এবং কামান্ধ যুবকের দল যাহারা তাহার রূপের ফাঁদে পড়িয়া প্রেম নিবেদন করিত সে তাহাদের ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করিত, বা উপযুক্ত মূল্য পাইলে দু'একটি চুম্বন দিয়া বিদায় করিয়া দিত। সে অনেকের মন লইয়া ছেলেখেলা করিয়াছে বটে, কিন্তু কাহাকেও দেহ লইয়া যথেচ্ছাচার করিতে দেয় নাই।

আমি বহুকাল বিউটির রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া-ছিলাম। সেই মুখ, সেই নাসা, সেই বর্ণ, সেই চক্ষু, সেই ভ্রূ, সেই ভঙ্গী ও সেই হাসি আমাকে পাগল করিয়াছিল। আমি তাহার হাসিতে মোহিত ও কথায় আত্মবিস্মৃত হইতাম, কখনও তাহার ব্যক্তিগত খেয়ালের দিকে বিন্দু-মাত্র লক্ষ্য করি নাই সে নিজের স্বেচ্ছামত কতদিন অফিসের ভ্রাম্যমান কারে আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, আমিও কতদিন অন্ধভাবে তাহার মন তুষ্টির জন্য বায়-স্কোপে, থিয়েটারে, বল নাচে, হোটেলে খানা পিনা ও রঙ্গ তামাসায় তাহার পিছনে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দেশ ভ্রমণ, চক্ষুর অন্তরালে বিরহ, সারা বৎসর ধরিয়া কত প্রেম পত্রের ছড়াছড়ি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বিউটি যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি কি বিবাহিত ?" আমি তখনই বুঝিলাম আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে ; বিউটি আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে, নতুবা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিত না। এক অসীম আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলাম।

বিউটির সংস্পর্শে আসিয়া আমি তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখন আমার উদ্বেলিত হৃদয়ে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আমি আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিলাম।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া বিউটির মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সেই হাসিতে আনন্দ বা স্ফূর্ত্তির কোন চিহ্ন প্রকাশিত হইল না। মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া সে মৌখিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিল "সে ত ভাগ্যের কথা।"

পরদিন প্রাতর্ভোজনের সময় বিউটির একখানি চিঠি পাইলাম, নির্জ্জন সাক্ষাৎ ও সান্ধ্য ভোজনের সাদর নিমন্ত্রণ। ভাবী-মিলনের স্বপ্নসুখে আনন্দে অধীর হইয়া সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পত্রখানি তাহার স্বহস্ত লিখিত বলিয়া দুইবার মনে মনে পাঠ করিয়া অবশেষে সেটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রফুল্ল চিত্তে তাহার বাড়ীতে পৌঁছিবামাত্র সে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ড্রয়িং রুমে

কথাবার্ত্তা সুরু করিয়াছে, এমন সময় দরজায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিউটি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম আগন্তুক একজন অনুগ্রহপ্রার্থী সৌম্যদর্শন যুবা পুরুষ। তিনি বসিতে না বসিতে আবার ঘণ্টাধ্বনি, আর একজন যুবকের প্রবেশ! আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এই প্রেম ব্যাপারে এত প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া ঈর্ষানলে প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল।

কক্ষাভ্যন্তরে আমাদের সকলেরই পরিচিত দুইটি পূর্ণ যৌবনা তরুণী লুকাইয়া ছিল, পানাহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা হঠাৎ বাহির হইয়া আহ্লাদে গদ্‌গদ্ ভাবে সকলের পিঠ চাপড়াইয়া নাচিতে লাগিল ও আমাদের সকলের লিখিত প্রেম পত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে ঠাট্টা বিদ্রূপ সুরু করিয়া দিল।

প্রত্যেকের চিঠিতেই প্রেমের চূড়ান্ত ব্যাপার ও ভাল-বাসার ছড়াছড়ি! সকলেই একটি জীবনসঙ্গিনী লাভের জন্য লালায়িত। বিউটি আমার কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িয়া এক গাল হাসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মিঃ চক্রবর্ত্তী, উইলসন, রেডমণ্ড! আমাদের মধ্যে কে আপনাদের কাহার প্রণয়িনী? আপনাদের কটা প্রাণ? কতবার সেই প্রাণ কাহাকে সমর্পণ করেছেন জানতে পার্‌লে আমরা স্বয়ম্বরা হয়ে এখুনি গির্জ্জায় যাব।"

দুষ্টা কুহকিনীদের এই নির্ম্মম হৃদয়হীন কৌতুক আমাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করিল, লজ্জায়, অপমানে ও ক্ষোভে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃথা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া যে কল্পনা জাল রচনা করিয়াছিলাম তাহা ছিন্ন হইয়া গেল।"

মিঃ চক্রবর্ত্তীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

গল্পটি শুনিয়া শরৎচন্দ্র খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মেয়েগুলি বেশ চতুর, ভণ্ডকটাকে বেশ জব্দ করেছিল!"

(৩৬) কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বলিলাম আমার আর একটি আমেরিকান মহিলা বন্ধুর আশ্চর্য্য গল্প আছে শুন—"আমরা একদিন নিউ-ইয়র্কের একটি প্রধান ক্যাথলিক ভজনালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন উপাসনা হইতেছিল। দেখিলাম, এখানকার চার্চ্চগুলি ভদ্রমহিলাদিগের ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া বাহার দিবার স্থান। চার্চ্চের ধর্ম্ম ব্যারাকের সৈন্যগণের ড্রিলের মত হাত তোলা, হাঁটু গাড়া, বই হাতে করা—সব যেন ধরা বাঁধা। দু' মিনিট্ ভক্তি, দু' মিনিট্ প্রার্থনা—সব পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট।

এই গীর্জ্জার সুবিস্তৃত আয়তন, চারিদিকের গাম্ভীর্য্য, দর্শকগণের ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ, দেওয়ালে বড় বড়

খৃষ্টীয় ছবি, বেদীর উপরে মোটা লম্বা মোমবাতি, এই সকল একত্র হইয়া আমার মনে প্রকৃত ঐশ্বরিক ভাব আনয়ন করিয়াছিল।

উপাসনা শেষে দেখিলাম, প্রকাণ্ড হলের এক পার্শ্বে একটি ছোট কামরার মধ্যে সম্ভ্রমোৎপাদক পরিচ্ছদ পরিয়া একজন পাদরী বসিয়া আছেন। এই কামরাটির নাম 'কনফেশন্ গ্যালারী' (Confession Gallary)। তুমি যতই কেন দোষী হও না—পাপে যতই কেন তাপী হও না, এইখানে বসিয়া পাপ স্বীকার করিলে সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া যাইবে, সাধারণের এই বিশ্বাস।

এই সময় একটি অসামান্যা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক হল ঘরে ঢুকিয়া সটান এই গ্যালারীর সম্মুখে নতজানু হইয়া কিছুক্ষণ বসিবার পর সজলনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

"Hear Gracious God, a sinner's cry,
    For I have nowhere else to fly,
I make my humble suit to thee,
    O God, be merciful to me !
To Thee I come, a sinner weak,
And scarce know how to pray or speak;
From fear and weakness set me free,
    O God, be merciful to me !

To Thee I come, a sinner vile,
Upon me, Lord, vouchsafe to smile ;
Mercy alone I make my plea,
O, God, be merciful to me !
To Thee I come a sinner great,
And well Thou knowest all my state ;
Yet full forgiveness is with Thee,
O God, be merciful to me !"

তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত এই করুণ প্রার্থনাটি আমার হৃদয় স্পর্শ করিবামাত্র আমি চুপে চুপে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী আর কোথাও দেখি নাই, যেন শাপভ্রষ্টা দেবী! তাঁহার চেহারাতে আমাকে দিশাহারা করিল, ওরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই।

সে মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই হৃদয়ে এককালে নানাভাবের উদয় হইল! এরূপ সৌন্দর্য্যের আধার ধর্ম্মশীলা মহিলার কি আক্ষেপ ও মনের কষ্ট থাকিতে পারে জানিবার বিশেষ কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া তাঁহার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে মনে কত কি আন্দোলন করিতেছি, এমন

সময়ে হঠাৎ তিনি কোমল কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কে, কি চান ?”

আমি বলিলাম—“আমি জনৈক পর্য্যটক, আপনার ঐ করুণ মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনাটি আমার নোট বুকে লিখিয়া লইতে চাই।”

মহিলাটি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি আমার মত পাপী ও অনুতপ্ত ?” আমি কহিলাম—“অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মনে হয় জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভারতের ধর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ যিনি আপনাদের দেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি জগতবাসীকে শুনাইয়াছেন—“Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, Yea, divinities on Earth, Sinners ? It is a sin to call a man so. Come up, Oh lions ! and shake off the delusion that you are sheep.”

মহিলাটি কহিলেন—“মানুষ যদি নিষ্পাপ ও জন্মশুদ্ধ, তবে এত অসৎ প্রবৃত্তি কেন ?”

আমি কহিলাম—“ইহার কারণ আত্মবিস্মৃতি। যখনই আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমরা অমৃতের সন্তান, তখনই আমাদের পতন আরম্ভ হয়, অসৎপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। মহাত্মা যীশু খৃষ্টেরও ইহাই শিক্ষা। তিনি

কাহাকেও 'পাপী' বলিয়া কদাচ ঘোষণা করেন নাই। "Ye are the temples of God, the kingdom of heaven is within you" ইত্যাদি মহা বাক্যই উহার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

মহিলাটি আমার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনাকে পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। অনুগ্রহ করিয়া আমার কার্ডখানি রাখুন, কাল দয়া করিয়া আমার বাটিতে আসিবেন ; সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া উভয়ে ধর্ম্মালোচনা করিব। অপরাহ্নে আমার ওখানেই লঞ্চ খাইবেন।"

কার্ডে তাঁহার নাম দেখিলাম 'মিস্ ভায়লেট'।

হর্ষ বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া এই রহস্যময়ী নারীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। তিনি যে কোন ভদ্রকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

পরদিন গিয়া দেখিলাম, তিনি একটি মূল্যবান বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করেন। অট্টালিকার যে কক্ষে তিনি বসিয়াছিলেন, তাহা বহুমূল্য সুদৃশ্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত। নানাবিধ মর্ম্মর মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড দর্পণ, চীনদেশ হইতে আনীত আসবাব-পত্রগুলির শিল্পনৈপুণ্য, দেওয়ালে ইতালীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর হস্তে প্রস্তুত নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পুষ্পাধারে বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ তাঁহার বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

মিস্ ভায়লেট আমাকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া সম্মুখে একখানি কোচে বসিতে দিলেন। তাঁহার সরল মুখের সুন্দর হাসিটুকু দেখিয়াই হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইল এবং তাঁহার পরিধানে সাধারণ পরিচ্ছদ দেখিয়া শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহার কথাবার্ত্তা, শিষ্টাচার আগাগোড়াই ভদ্র, মিষ্ট ও সরল। যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তদপেক্ষা কিছুই কম দেখিলাম না।

অভ্যর্থনাদির পর উভয়ে উভয়ের আসন গ্রহণ করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোন দেশ হইতে আসিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম—"আমি ভারতবাসী, যে দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন।"

মিস্ ভায়লেট জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতবর্ষের সহিত আমাদের দেশের কি পার্থক্য দেখিলেন ?"

আমি বলিলাম—"স্বামীজী যাহা দেখিয়াছিলেন, আমিও তাহাই দেখিলাম—ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, পাশ্চাত্যের প্রাণ-শক্তি প্রধান ; ভারতের গভীর চিন্তা, পাশ্চাত্যের অদম্য কার্য্যকারিতা ; ভারতের মূল মন্ত্র 'ত্যাগ', পাশ্চাত্যের 'ভোগ' ; ভারতের সর্ব্ব চেষ্টা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্যের বহির্মুখী ; ভারতের সর্ব্ব বিদ্যা অধ্যাত্ম, পাশ্চাত্যের অধিভূত ; ভারত মুক্তিপ্রিয়, পাশ্চাত্য স্বাধীনতাপ্রাণ ; ভারত ইহলোক কল্যাণ-লাভে নিরুৎসাহ,

পাশ্চাত্য এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ সচেষ্ট ; ভারত নিত্য সুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করে, পাশ্চাত্য নিত্য সুখে সন্দিহান হইয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখ লাভে সমুদ্যত।"

তাহার পর মিস্ ভায়লেট বলিলেন—"স্বামীজীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুন্দর মুখ আমি ছবিতে দেখিয়াছি এবং ঐ শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই সিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও শুনিয়াছি। আপনি সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত কিছু বলিবেন কি ?"

আমি স্বামীজীর শিক্ষা দীক্ষা, ত্যাগ, স্বদেশানুরাগ, পাশ্চাত্য ভ্রমণ, সিকাগো বক্তৃতা ও পরমহংসদেবের অমূল্য উপদেশাবলীর কয়েকটি উল্লেখ করিলাম।

দেখিলাম পরমহংসদেবের জীবনীকথা তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। উভয়ের মন প্রাণ ক্ষণকালের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে আকৃষ্ট হইল। তিনি অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। একটি তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইবার পর তিনি আবেগকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"অবৈধ প্রেমের বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া আমার হৃদয়ের পরতে পরতে বিষের প্রবলাগ্নি জ্বলিতেছে,

এই অশান্তি অনল কিসে নিভাইব বলিতে পারেন? এখন বুঝিয়াছি ভোগে তৃপ্তি নাই, আছে কেবল বাসনার তীব্র প্রদাহ।"

প্রাণের মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব যাতনায় তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে তাঁহার দুঃখে আমার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিলাম—"আপনি গীর্জ্জাতে অনুতাপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে যে ভাবে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছিলেন তাহাই পাপ হুতাশন-দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বারি সেচন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। অনুতপ্ত প্রাণে শান্তি পাইতে ভগবানের কৃপা-ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

এই সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে লঞ্চ তৈয়ার হইয়াছে। উভয়ে ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিলাম। টেবলের উপর বহুমূল্যের আচ্ছাদন বস্ত্র, রূপার বাসনের চাকচিক্য, খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, বিলাসিতার বাহুল্য দেখিয়া আমার বাঁশ-বনে ডোম কাণার' অবস্থা হইল। পূর্ব্বে ভাল হোটেলে থাকিয়া কোন্ জিনিষের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতে হয় জানা না থাকিলে এই আদব-কায়দা-দুরস্ত ধনী পাশ্চাত্য মহিলাগণের নিকট সম্মান বজায় রাখা সম্ভব হইত না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিয়ম এই যে সঙ্গে কোন মহিলা থাকিলে তাঁহার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অসভ্যতা; কোন না কোন প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে এবং তিনি কোন জিনিষ দেখিয়া How lovely! How pretty! বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'হ্যাঁ' দিতে হইবে।

এই সময় লঞ্চ খাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া মিস্ মেরী নামক জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। ইনি একজন বিদূষী মহিলা, মিস্ ভায়লেটের প্রতিবেশিনী। মিস্ ভায়লেট আমাকে একজন ধার্ম্মিক ভারতবাসী বন্ধু বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। খাইতে বসিয়া মিস্ মেরী আমাকে বলিলেন—"মিঃ সরকার, যদ্যপি কিছু মনে না করেন, আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—"স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন, আমি আনন্দের সহিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিব।" মিস্ মেরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিক কেমন করিয়া তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিল?" আমি বলিলাম—"দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতা অভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।"

মিস্ মেরী—"ভারতের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা কেন ?"

আমি—"ভারতেও এক রাম কিন্তু তাঁহার সহস্র নাম। ঈশ্বরের অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব, অনন্ত লীলা। সেই জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব, অনুভূতি ও রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী তাঁহার অনন্ত নাম কল্পনা করিয়াছেন।"

মিস্ মেরী—"আপনাদের বেদ কাহার দ্বারা প্রচারিত ?"

আমি বলিলাম, "বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মের ন্যায় ইহা কোন অবতারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নয়। ইহা শ্রুতি। ভারতের তপোবনে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পবিত্র হৃদয়ে যে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই অপৌরুষেয় বেদ নামে অভিহিত। ইহাই জগতের প্রাচীনতম এবং মূল ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগঋষি স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈদিক ধর্ম্মের কথাই আপনাদের দেশে বলিয়াছিলেন।"

মিস্ মেরী—"আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?"

আমি—"বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইতেছে —সে সবই ব্রহ্মের প্রকাশ। জীবও ব্রহ্মেরই অংশ। স্বামীজী বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।"

মিস্ মেরী—"হিন্দু ধর্ম্মের মূলনীতিগুলি বেশ সুন্দর, কিন্তু আপনাদের সামাজিক দেশাচারগুলি ওরূপ নিষ্ঠুর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন ?"

আমি—"কি বলুন ?"

মিস্ মেরী—"আপনারা স্ত্রীলোকদের জীবনের চিরসঙ্গী পতি নির্ব্বাচনের অধিকার দেন না কেন ?"

আমি—"পাশ্চাত্য জাতির অবৈধ প্রেম ও অবাধ মিলনের বিষময় ফল দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হয়। আমাদের দেশে ডাইভোর্স আইন আদালত কিছুই নাই। যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই আমাদের সমাজে প্রচলিত। নারীর সতী-ধর্ম্মের মহিমা যে কত গৌরবান্বিত তাহা হিন্দু মহিলারাই ভাল বোঝেন।"

তাহার পর মিস্ মেরী ভারতের দেশাচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কথা কি সত্য যে, ভরণ পোষণের সংস্থান না থাকিলেও আপনাদের দেশের লোক বিবাহ করে ? এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে ? পঞ্চম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার না কি পত্যন্তর গ্রহণে অধিকার নাই ? অপুত্রক লোকরা আজীবন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অর্জ্জিত অর্থ জনহিতকর কার্য্যে দান না করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ? বিবাহে যৌতুক দিতে কন্যার পিতাকে দেউলিয়া হইতে হয় ? একবারমাত্র গঙ্গা স্নানেই

সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়? এখনও জাতিভেদ, ছুৎমার্গ ও 'দৃষ্টিদোষ' বর্ত্তমান?"

এই বিদূষী মহিলা আমাদের দেশের চিরাচরিত জঘন্য রীতিগুলির উল্লেখ করায় বিশেষ লজ্জিত হইলাম এবং আমাদের সমাজ সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র নহে বলিয়া চুপ করিয়া হাসিতে লাগিলাম।

বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করা কঠিন হইলেও ঈশ্বর-অনুকম্পায় আমার সেদিনকার কথা-বার্ত্তায় তাঁহারা বিশেষ প্রীত হইলেন। আমি মিস্ ভায়লেটের সৌজন্য ও শিষ্টাচারে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।

মিস্ ভায়লেট বিনয় বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনাটি আমায় লিখিয়া দিলেন ও তাহার সহিত নিউইয়র্ক সহরের একখানি সচিত্র এলবাম ও তাঁহার ফটো উপহার দিলেন।

আমি নিউইয়র্ক সহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একদিন চার নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া তাঁহাকে Life and Teachings of Sri Ramkrishna ও স্বামী পরমানন্দ প্রণীত "The way of Peace and Blessedness" নামক দুইখানি পুস্তক উপহার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

ঐদিন পথে দুইজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার কার্ড

দিয়া আলাপ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভারত হইতে আগত কোন প্রিন্স্ বা প্রসিদ্ধ বাগ্মী কিনা। আমি দুইটির মধ্যে কোনটিই নয় বলিয়া কোন মতে তাঁহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।"

আমেরিকার ডায়েরী শোনা শেষ হইলে শরৎচন্দ্র বলিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ তা হ'লে আমেরিকায় খুব নাম করে এসেছেন ?"

আমি বলিলাম, "স্বামীজীর নাম করে অনেক স্থলে আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা হ'ত। বিদেশীর পক্ষে আমেরিকায় গায়ের চামড়া কাল হওয়া একটি পাপের মধ্যে গণ্য, তার উপর চুল কোঁকড়ান হ'লে আর রক্ষা নাই। হাজার বিদ্বান বা ধনবান হ'লেও সহজে শেতাঙ্গদের সঙ্গে এক হোটেলে থাকবার স্থান পাওয়া যায় না। আমাদিগকে Coloured man মনে ক'রে কোন হোটেলে স্থান দিতে অস্বীকার করলে আমরা যখন বলতাম "We hail from East India from where Swami Vivekananda came" তখন আমাদের পথ পরিষ্কার হ'য়ে যেত।

"সানফ্রান্সিসকোবাসীদের উপর স্বামীজী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিকতার এরূপ প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন যে দেখলাম প্রতি রবিবার সকালে অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ তাঁদের নিজের গির্জ্জায় না গিয়ে আমাদের হিন্দুমন্দিরে

বক্তৃতা শুনতে আসেন ও বক্তৃতা শেষ হবার পর বুকষ্টল থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ছবি ও স্বামীজীর বই কিনে নিয়ে যান।

"এই মন্দিরটি স্বামীজীর পরিকল্পনায় স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর আজীবনের সাধনা-কেন্দ্র ও কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এই সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত মন্দির। তিনি এইখানেই দেহ রক্ষা করেন।

স্বামীজীর মুখে বেদান্তের বাণী শুনে ঐ দেশের অনেক ভোগ-সর্ব্বস্ব নরনারীর অবসন্ন প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হ'য়েছে। অনেক বিদূষী মহিলা আমাদের কাছে ভারতের আধ্যাত্মিকতার কথা শুনে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মভূমি—শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের জন্মভূমি ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।"

এই গল্পগুলি মনোযোগের সহিত শুনিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তুমি দেখছি দেশ ভ্রমণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছ। একখানি বই লিখে ছাপিও, বেশ সুন্দর হবে। এখন ইজিপ্টের পিরামিডের গল্প বল।

আমি বলিলাম—"পিরামিডের গল্প পরে শুন, এখন আমি ঐ পিরামিডের দেশে গিয়ে মরুভূমির উপর পিরামিড ও স্ফিঙ্কসের সামনে উটে চড়ে যে ছবি তুলে এনেছি সেটি দেখ।"

পঞ্চদশ স্তবক

শরৎচন্দ্র ও রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জি

ভূ-পর্য্যটন করিয়া আমি রেঙ্গুনে ফিরিবার পর প্রত্যহ আমার বৈঠকখানায় একটি সান্ধ্য-বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে প্রত্যহ বিশ পঁচিশ জন বন্ধুবান্ধব আসিয়া নানা গল্প গুজব করিতেন। এই সময়ে ইউরোপে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া অধিকাংশ সময় সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা হইত। শরৎচন্দ্র আসিয়া মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেন।

একদিন সংবাদ পাইলাম দেশভক্ত পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপার বর্ম্মার বিভিন্ন জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রেঙ্গুনে আসিতেছেন। ইহা শুনিয়া আমি ও শরৎচন্দ্র তাঁহা-দিগকে ষ্টেশন হইতে আনিয়া কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে লইয়া গেলাম এবং একদিন আমাদের ক্লাব গৃহে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমাদের উপর সি, আই, ডি, পুলিশের অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

তাহার পর একদিন সিঙ্গাপুর হইতে শরৎচন্দ্রের আত্মীয় রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জির একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম;

তাহাতে লেখা ছিল "পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমেরিকা হইতে জাপান হইয়া সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছি, ১লা তারিখে রেঙ্গুনে পৌঁছিব।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি ও শরৎচন্দ্র রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জিকে আনিবার জন্য জাহাজ-ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। সমস্ত যাত্রী নামিয়া গেলে দেখিলাম ব্যানার্জ্জির সহিত একজন পুলিশ অফিসারের বচসা হইতেছে। ঐ অফিসার তাঁহাকে বিপ্লববাদী সন্দেহ করিয়া তাঁহার স্যুটকেসের সমস্ত জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। ইহাতে অযথা বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, মিঃ ব্যানার্জ্জি প্রতিবাদ করায় ঐ অফিসার তাঁহাকে অবজ্ঞার সহিত বলিল—"I know you are an Anarchist, you are Banerjee, you are a Bengalee Babu." "আমি জানি তুমি বিপ্লববাদী, তুমি ব্যানার্জ্জি, তুমি একজন বাঙ্গালী বাবু।"

বার বৎসর স্বাধীনতার বাতাসে আমেরিকা বাসের পর একজন ফিরিঙ্গী পুলিশের মুখে এই অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি রাগে ক্ষেপিয়া উঠিলেন এবং গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"You brute ! You don't know how to behave with a gentleman. তুমি পশু! ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতে জান না।" এবং হাতের আস্তিন্ গুটাইয়া সজোরে তাহার নাকে প্রচণ্ড ঘুসী

লাগাইয়া মুখ রক্তাক্ত করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 'উড্রো উইলসনের স্বাক্ষরিত Naturilisation certificateখানি বাহির করিয়া বলিলেন—"See that I am an American. এই দেখ আমি আমেরিকার অধিবাসী।"

মিঃ ব্যানার্জ্জির চাল চলন, উদ্ধত ব্যবহার ও মুখে অনর্গল ইংরেজী কথা শুনিয়া পুলিশ সাহেব অবাক হইয়াছিল, তাহার উপর পার্চ্চমেণ্ট কাগজে আমেরিকার স্বাধীনতা চিহ্ন সমন্বিত ও প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত শীল-মোহর করা কাগজখানি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল।

ভারতের সাধারণ লোক হইলে জবরদস্ত পুলিশ এক্ষেত্রে তাঁহাকে যেরূপ নির্য্যাতন করিত তাহা সহজে অনুমেয়, কিন্তু এখানে পুলিশ সাহেবের সে সাহসে কুলাইল না। সে জেটীতে গিয়া পুলিশ কমিশনার সাহেবকে টেলিফোনে সমস্ত ঘটনা জানাইল এবং ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জিকে বলিল—"You will have to see the Commissioner of Police. আপনাকে পুলিশ কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি পুলিশের রোষকষায়িত লোচন অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—"Damn I care for your Commissioner of Police, I will see my own Consul if necessary. আমি তোমার পুলিশ কমিশনারের

তোয়াক্কা রাখিনা, যদি আবশ্যক হয় আমি আমাদের আমেরিকান কন্‌সলের সহিত দেখা করিব।"

বেগতিক দেখিয়া পুলিশ সাহেব তাহাতেই রাজী হইয়া মিঃ ব্যানার্জ্জিকে জাহাজ হইতে নামাইয়া আনিল এবং একখানি পুলিশ বেষ্টিত ভাড়াটিয়া গাড়ীতে রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনারের অফিসের সম্মুখে উপস্থিত করিল। আমরাও অন্য একখানি গাড়ীতে তাহাদের অনুসরণ করিলাম।

মিঃ ব্যানার্জ্জি গাড়ী হইতে নামিতে অস্বীকার করায় পুলিশ কমিশনার সাহেব তাঁহার কাগজ পত্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিলেন।

আমরা সকলে আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, বলা বাহুল্য সি, আই, ডি পুলিশের লোক সেটি লক্ষ্য করিল।

"Well done, Rev. Banerjee! Three cheers for your bravery! বেশ ক'রেছ রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জি, তোমার বীরত্বের জন্য ধন্যবাদ।" এই বলিয়া শরৎচন্দ্র মহা উল্লাসের সহিত মিঃ ব্যানার্জ্জির পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"আমি গিরীনের কাছে তোমার সমস্ত কথা শুনেছি, কর্ত্তা মারা গেলেন কিসে?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"By tram collision with our office ghari. আমাদের ঘরের গাড়ী ও

ট্রামের সংঘর্ষে।" শরৎচন্দ্র—"তোমায় তিনি ত্যাজ্যপুত্র ক'রবেন শুনেছিলাম।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি—"He could n't fulfil his desire. তাঁর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারেন নি।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তোমার আমেরিকান স্ত্রীর কি ব্যবস্থা ক'রবে ?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"I am going to inherit about five lacs of rupees, I shall fix her up. আমি প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা পাব। তার একটা বন্দোবস্ত করে দেব।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"সম্ভব হ'বে কি ?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"Oh ! Dollars can do miracle ! ওঃ ! টাকায় কি না হয় ?"

শরৎচন্দ্র ও মিঃ ব্যানার্জ্জি রাত্রে আমার বাড়ীতেই আহার করিলেন। বন্দরে জাহাজ ছিল, আমি ও শরৎচন্দ্র তাঁহাকে তুলিয়া দিলাম। রাত্রে শুইতে যাইবার সময় মিঃ ব্যানার্জ্জি আমাকে বলিলেন—"Girin Babu, take care ! The C. I. D. Police is shadowing us like anything. গিরীন বাবু, একটু সাবধানে থাকবেন, টিকটিকি পুলিশ আমাদের গতি বিধির উপর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।"

ইহার কিছুদিন পরে আমার জনৈক সরকারী উচ্চ-

পদস্থ কর্ম্মচারী বন্ধু আমায় চুপে চুপে সতর্ক করিয়া দিয়া সংবাদ দিলেন যে, "তাঁহার অফিসে একখানি D. O. আসিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—Mr. G. N. Sircar has made a tour round the world and visited almost all the important cities of the West without any specific object. Inspector Jenkin is to watch him. মিঃ জি, এন, সরকার উদ্দেশ্যহীন ভাবে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় সহরগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন। ইনস্‌পেক্টর জেঙ্কিন্স তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবেন।"

একেই আমার ক্ষুদ্র কর্ম্ম শক্তির উপর বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ছিল, তাহার উপর ভূ-প্রদক্ষিণের অছিলায় ও রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জি আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন বলিয়া আমার নাম তাঁহাদের পাকা খাতায় উঠিয়া গেল এবং গোয়েন্দা পুলিশের লোক ছায়ার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ আমার পশ্চাতে লাগিয়া রহিল।

এই সময় অনেক বন্ধু বান্ধব আমার বাটিতে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মোটেই সে ভয় ছিল না।

ষোড়শ স্তবক

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশ ত্যাগ

শরৎচন্দ্রের চাকুরীজীবন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতিতে সহিল না। একাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুসাঘুসি করিয়া তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই ঘটনায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই মনে করিল যে, এইবার শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টগগন কুহেলিকাচ্ছন্ন হইবে, এমন সরকারী চাকরী তাঁহার অদৃষ্টে আর জুটিবে না; কিন্তু এই ঘটনাই শরৎচন্দ্রের জীবন স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। জানিনা, ভগবান কাহাকে কোন্ পন্থা দিয়া কোথায় লইয়া তাহার সৌভাগ্যের বিধান করেন। কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে মানব-ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে?

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের কয়েকটি সাহিত্যিক বন্ধু স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাব গৃহে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এইদিন কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভরসাতেই তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

সপ্তদশ স্তবক

কলিকাতায় দেশবন্ধু গৃহে শরৎচন্দ্র

দেশে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্ব্বজনসমাদৃত উপন্যাসগুলি এক একখানি করিয়া বাহির হইতেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যশঃ খ্যাতি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল; দারিদ্র্যের কশাঘাতে যে প্রতিভা স্ফুরণের পূর্ণ অবকাশ পায় নাই, তাহা অনুকূল আবহাওয়ায় শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর পরে কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন শরৎচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম, শরৎচন্দ্র প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

শরৎচন্দ্র এখন দারিদ্র্য-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া এক-সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়পুত্র হইয়াছেন, তাঁহার চাল-চলন, পোষাক পরিচ্ছদ এখন নব্যতন্ত্রের অভিজাত সমাজের অনুরূপ হইয়াছে, ইহজীবনে যশঃ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি সমস্তই তিনি পাইয়াছেন দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—"শরৎচন্দ্র

এখন অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন, হয়ত তাঁহার মনে আত্মগরিমার ভাব আসিয়াছে, হয়ত তিনি আর আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মেলামেশা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন।" কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আমার সে ধারণা দূর হইয়া গেল।

শরৎচন্দ্র আমাকে দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাধারণ মানুষের মত আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাই, গিরীন, তুমি কবে এ'লে ?"

আমি বলিলাম—"প্রায় তিন বৎসর।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"এতদিন এসেছ জানলে আমি নিশ্চয় একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। এখানে তোমার বাড়ী কোথায় ?"

আমি বলিলাম—"খিদিরপুরে। তুমি ত শিবপুরে থাক ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"হ্যাঁ, আমি রূপনারায়ণের ধারে পাণিত্রাসে নিজের বাড়ী করেছি, বেশ সুন্দর নির্জ্জন স্থান, তোমার খুব ভাল লাগবে। একদিন যেতে হবে, যাবে ত ?"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয় যাব।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তুমি একেবারে রেঙ্গুন ছেড়ে এলে ? রেঙ্গুন যে অন্ধকার হয়ে গেল। সেখানে হুজুক করবে কে ?"

আমি বলিলাম—"ত্রিশ বৎসর হ'য়ে গেল, আর ভাল লাগে না, শরৎদা, তাই চলে এসেছি।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তোমার রামকৃষ্ণ মঠের কি হ'ল? প্রিয় বাঁড়ুয্যে বলে কি?"

আমি বলিলাম—"মঠের বুনিয়াদ ও প্লিন্থ পর্য্যন্ত হ'য়ে অর্থাভাবে ধীরে ধীরে কাজ হচ্ছে। সেই জমির এক পার্শ্বে শশীবাবুর নামে একটি ধর্ম্মশালা হ'য়েছে। স্বামী শ্যামানন্দ ইষ্ট রেঙ্গুনে এক বিরাট "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" হাঁসপাতাল খুলেছেন। সেখানে প্রত্যহ গড়পড়তা অন্তর্বিভাগে ১৫০ ও বহির্বিভাগে ৬০০ রোগীর চিকিৎসা ও সেবা হয়। সারা ভারতে মিশনের যত হাঁসপাতাল আছে এটি তার মধ্যে দ্বিতীয়।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তোমাদের এই স্বামীজীর কাছে আলাদীনের ল্যাম্প আছে নাকি? প্রত্যহ এত বুভুক্ষিত রোগীর খোরাক যোগান কোথা থেকে?"

আমি বলিলাম—"ভিক্ষা করে, শরৎদা, সবই ঠাকুরের মহিমা। তুমি চলে আসার পর স্বামী শ্যামানন্দ এসে দশমাস আমার বাড়ীতে থেকে আমহার্ষ্ট জেলায় (flood relief) বন্যাপীড়িতের সাহায্য করেন। এই কাজ চালাবার জন্য তিনি কুঞ্জবাবু, মিঃ দাশ ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় আঠার হাজার টাকা ও ৫০০ বস্তা চাল সংগ্রহ করেছিলেন। এই কাজে বর্ম্মা দেশে তাঁর

খুব সুনাম হয়। পরে তিনি বর্ম্মার লাট সাঁর হারকর্ট বটলার সাহেবের সুনজরে পড়ায় হাঁসপাতালের জন্য জমি সংগ্রহ করেন। এখন বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট এই হাঁসপাতালে বার্ষিক দশ হাজার টাকা সাহায্য করেন। তোমার বন্ধু প্রিয় বাঁড়ুয্যে রেঙ্গুনে মিশনের কাজের প্রসারতা দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছে।"

শরৎচন্দ্র অতঃপর প্রশ্ন করিলেন—"তুমি এখানে কি মনে করে?"

আমি বলিলাম—"তুমিও যে জন্য এসেছ, আমিও সেইজন্য। খিদিরপুর কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি ও বি, পি, সি, সির মেম্বার ব'লে মধ্যে মধ্যে আমায় এখানে আসতে হয়।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমায় হাওড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করেছে, বড় একটা আসি না। তবে এখন দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের তুমুল আন্দোলন চলেছে তাই এসেছি।"

আমি বলিলাম—"তুমি যে ঘরের কোণ্ ছেড়ে দেশের কাজে যোগ দিয়েছ, এ বড়ই আনন্দের কথা।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"শুনেছ বোধ হয় আমি কলিকাতায় এসেই রায় সাহেবের ঋণের টাকাটি শোধ করে দিয়েছি?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, রায় সাহেব আমায় তা বলে-

ছেন। আচ্ছা শরৎদা, এখানে সভা-সমিতিতে তোমায় চির-কুমার ব'লে উল্লেখ করলে তুমি তার জবাব দাও না কেন ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তামাসা দেখি, বেশ মজা লাগে।"

আর একদিন দেশবন্ধুর বাটীতে কংগ্রেস কমিটীর বৈঠক বসিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র ও আমি একখানি বড় কাউচে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। এমন সময় আমার প্রতিবেশী বন্ধু, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র সন্তোষকুমার বসু আমাকে ইসারায় ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি আমার জন্য দেশবন্ধুকে একটু বলতে ভুলবেন না।" এ সময় সন্তোষবাবু খিদিরপুর ২৫ নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং খিদিরপুরস্থ অধিকাংশ লোকই তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল। কংগ্রেস মনোনীত সভ্য ভিন্ন ইলেক্‌সনে নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ও সন্তোষ বাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি দেশবন্ধুকে বলিলাম—"আমার একটি নিবেদন আছে।"

দেশবন্ধু বলিলেন—"কি বলুন ?"

আমি বলিলাম—"আমার বাড়ী খিদিরপুরে, কিন্তু আমাদের ২৫ নং ওয়ার্ডের কমিশনার কালীঘাটের লোক, আলিপুরের উকিল বিজয়বাবু।'

ইহা শুনিয়া শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন খিদিরপুরে কি কমিশনার হবার উপযুক্ত লোক নেই ?"

আমি বলিলাম—"আছেন, সন্তোষবাবু, কিন্তু তিনি খিদিরপুরের বাসিন্দা নন বলে, আর খিদিরপুরে তাঁর বসত বাড়ী নেই বলে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে আছেন।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"যখন তুমি তাঁর স্বপক্ষে আছ তখন তাঁর জয় নিশ্চিত !"

দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কে ? এখানে আছেন কি ?"

আমি বলিলাম—"ঐ কোণে দাঁড়িয়ে আছেন, উনি একজন এম, এ, বি-এল, হাইকোর্টের কৃতবিদ্য উকিল, স্বদেশভক্ত ও প্রতিভাবান বক্তা।"

দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"২৫ নং ওয়ার্ড থেকে আর কয়জন দাঁড়িয়েছেন।"

আমি বলিলাম—"আরও দুজন।"

দেশবন্ধু বলিলেন—"আপনি মিটিংয়ের দিন আমায় ওঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন।"

রেঙ্গুনে আমাদের সহকর্ম্মী জনৈক গুজরাটী কংগ্রেস কর্ম্মীকে গবর্ণমেণ্ট অন্যায়ভাবে জেল দেওয়ার ফলে মিঃ জে, আর, দাশের অনুরোধে দেশবন্ধু বিনা ফিতে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যখন রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন সেই সময় হইতে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয়

ছিল। আমরা তাঁহাকে একদিন আমাদের ক্লাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম।

দেশবন্ধুর বাটীতে নির্ব্বাচন সভার দিন সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সন্তোষবাবুর কয়েকটি ছদ্মবেশী বন্ধু আসিয়া দেশবন্ধুর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। আমি তাঁহাদের মিথ্যাপবাদ খণ্ডন করিয়া দেশবন্ধুর মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের কথা শুনিয়া সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া সন্তোষ বাবুকেই নির্ব্বাচিত করেন।

এই সন্তোষবাবু পরে নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে কিরূপে দেশবন্ধুর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন এবং কলিকাতার মেয়রের পদে উন্নীত হইয়া নিজ গৌরবময় কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। শরৎচন্দ্র, এ ক্ষেত্রে আমার জয় হইয়াছে এবং সন্তোষবাবু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

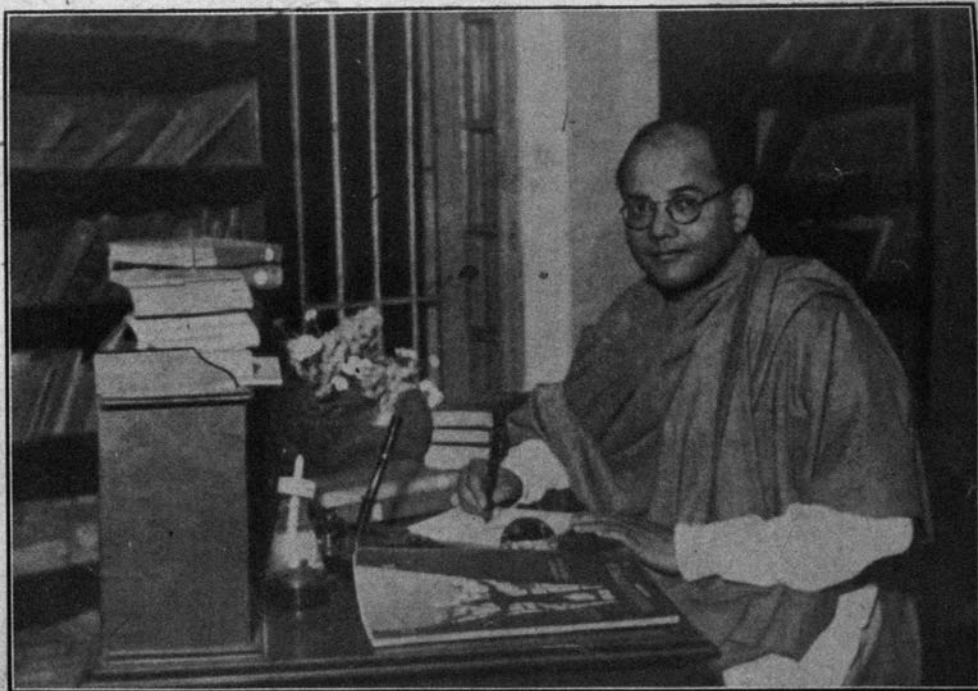
অষ্টাদশ স্তবক

বেলুড় মঠে শরৎচন্দ্র

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের দিন বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভা আহুত হয়। ঐ সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র সুভাষবাবুর সহিত একত্রে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকটে বসিয়া শরৎচন্দ্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। এই সময় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সভাপতিকে অনুরোধ করিলে শরৎচন্দ্র আমাকে দেখাইয়া সুভাষবাবুকে বলেন, —"এই গিরীনবাবু আমার রেঙ্গুনের পরম বন্ধু, ইনি এক জন গোঁড়া রামকৃষ্ণভক্ত ও ভূ-পর্য্যটক, বেশ বক্তৃতা করিতে পারেন।" তখন সভাপতি মহাশয় আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন;—"আশা করি আজিকার এই সভায় ভূ-পর্য্যটক গিরীনবাবু স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছু বলিবেন।"

আমি সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বামীজী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

আমার বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলের অনুরোধে



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু

শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত সন্ন্যাসিবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! সকলেই জানেন আমি বক্তা নই, বক্তৃতা আমি কোন দিনই দিতে পারি না; আমাকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করা বিড়ম্বনামাত্র। এটি ধর্ম্মসভা কিন্তু আমি ধার্ম্মিক নই, কোনদিন ধর্ম্ম চর্চ্চা করিনি, সে কথা আমার লেখার মধ্যে চাইলেই আপনাদের চোখে প'ড়বে। মঠের সন্ন্যাসীদের কাজকর্ম্মের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই, মঠের কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনতে পাই—সেগুলোকে মনে করে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হ'লে অনেক সময় লাগবে, আর তার দরকারও নাই। আমার বিশ্বাস উপস্থিত মঠের কাজগুলি ঠিক পরমহংসদেবের ভাবানুযায়ী বা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী কিছু হচ্ছে না।" শরৎচন্দ্র মিশনের আদর্শ ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার কথা না জানিয়া, নিজের মনগড়া যা-তা আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলায় শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ মুক্তকণ্ঠে, স্বল্প কথায় তৎক্ষণাৎ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শরৎবাবু বিশেষ প্রতিভাবান লেখক হইয়াও এবং তাঁহার অনুজ স্বামী বেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি এই মঠ ও মিশনের অভ্যন্তরীণ

কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুশৃঙ্খল বিরাট সেবা-প্রতিষ্ঠান বলিতে আজ একবাক্যে রামকৃষ্ণ মিশনকেই বুঝায়। মিশনের সম্মুখে যে বিরাট আদর্শ আছে, হৃদয়ে যে স্পন্দন আছে, কার্য্যে যে প্রাণ আছে, আমার বিশ্বাস তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা শরৎবাবুর নাই। আশা করি, তাঁহার সমস্ত ভুল ধারণা তিনি শীঘ্রই সংশোধন করিয়া লইবেন।"

সভা ভঙ্গের পর স্বামীজীদের অনুরোধে আমি সুভাষ বাবু ও শরৎচন্দ্রকে মঠের উপরের ঘরে লইয়া গেলাম। সেখানে বসিয়া প্রসাদ খাইতে খাইতে সুভাষবাবু স্বামীজী-দের বলিলেন,—"এই মঠে আসিলে আমার আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।"

উনবিংশ স্তবক

বিবিধ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

১

ইদানীং শরৎচন্দ্র সমস্ত মঠ মিশন বা আশ্রমের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিতেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, চার্টার্ড একাউন্‌টেণ্টের দৈব-দুর্ঘটনায় নৌকা ডুবিতে স্ত্রী বিয়োগ হইবার পর, তিনি আমার উপর তাঁহার বাটীর ভার দিয়া কিছুদিন পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সাধন আশ্রমে গিয়া বাস করেন। এই সময় আমি রাত্রে গিয়া তাঁহার বাটিতে শুইতাম।

একদিন রাত্রে যাইবার সময় হঠাৎ বালীগঞ্জ ট্রাম কারে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শরৎদা, তুমি ট্রাম কারে যে?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"মোটরখানা একটু বিগড়ে ছিল, ডকে পাঠিয়েছি। তুমি এত রাত্রে বালীগঞ্জে কোথায় চলেছ?"

আমি বলিলাম—"সত্যেন বাবুর বাড়ী।"

শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

আমি—"সত্যেন বাবু সেই দুর্ঘটনার পর প্রায় দু'মাস

হ'ল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আছেন। আমি প্রত্যহ রাত্রে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শুই। বেশ সুন্দর বাড়ী—নির্জ্জন স্থান।"

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন—"অ্যাঁ! সত্যেনবাবু বিলাত ফেরত হিসাবী লোক হ'য়ে এ বোকামি করলেন কেন? তোমাকে বেশীদিন আর ও বাড়ীতে শুতে হবে না।"

"কেন?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"ও বাড়ী অরবিন্দ শীঘ্রই গ্রাস ক'রবেন। যে কেউ ও আশ্রমে যায়, তার বাড়ী ঘরদুয়ার কিছুই থাকে না। দিলীপ বেচারী (শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়) কলকাতার বাড়ীখানা বেচে লাখ টাকার উপর দিয়েছে, তাতেও পেট ভ'রল না, তার কৃষ্ণনগরের বসত-বাটিখানাতেও টান দিয়েছে।"

আমি বলিলাম—"বড়ই আশ্চর্য্য যে, শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই, শরৎদা! তোমার গুরুদেব রবিবাবু তাঁকে কত সম্মান করেন জান? একস্থানে বলেছেন—'অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!' আর একস্থানে বলেছেন—You have the word and we are waiting to accept it from you. India will speak through your voice to the world'. ভারতের সর্ব্বোত্তম মহাযোগীকে মতলববাজ বলা তোমার উচিত হয়নি।"

শরৎচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"যে যাই বলুক, ভাই, আমার ধারণা, যেখানে যত আশ্রমধারী আছে, সবাই এক একটি মতলব-বাজ—ফাঁদ পেতে বসে আছে।"

২

রেঙ্গুনের কুঞ্জবাবু তিনটি বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া সপরিবারে আমার বাড়ীতে থাকেন। আমি উপর্য্যুপরি দুইরাত্রে বহুকষ্টে তাঁহার তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে তিনি রেঙ্গুন প্রত্যাগত সকল বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র শিবপুর হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া প্রথমে কুঞ্জবাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন, পরে রেঙ্গুনপ্রবাসী পরিচিত ও অপরিচিত বহুলোক সমাবেশ দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত সাদর আলিঙ্গন ও মিষ্টালাপ করিয়া শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় ও নম্রতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৩

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একটি নূতন প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য দুইটি আমেরিকান ভক্ত মহিলা প্রায় সাত লক্ষ টাকা দান করেন, কিন্তু ঐ

অর্থ মন্দির নির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া এই মহদনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য মঠ হইতে একখানি আবেদন পত্র বাহির হয়। আমি সাহেব মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

একদিন শরৎচন্দ্রের নিকট একখানি মঠের আবেদন পত্র লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন—"তুমি কলকাতায় এসেও চাঁদা তোলবার হুজুগে মেতেছ? রেঙ্গুনে তোমায় দেখলে ত লোকে ভয় পেত?"

আমি বলিলাম—"রেঙ্গুনে ত তোমার ভয় পাবার অবস্থা ছিল না—শরৎদা। এখন মা লক্ষ্মীর কৃপায় তোমার অবস্থা ভাল। তোমায় কিছু দিতে হ'বে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তুমি এখানে কত টাকা তুলেছ?"

আমি বলিলাম—"বার শত টাকা।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"কলকাতায় এত ধনী লোক থাকতে মাত্র বার শত টাকা!"

আমি বলিলাম—"ধনী লোকদের তুমি কি চেন না? ঠাকুর বলেছিলেন,—'কলির জীব বুকের এক ফোঁটা রক্ত দেবে, তবু একটি টাকা দেবে না।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের এই নূতন মন্দিরে সব শুদ্ধ কত টাকা খরচ হ'বে?"

আমি বলিলাম—"শুনেছি প্রায় দশ লক্ষ টাকা।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমার মতে একটি মন্দিরের জন্য এত টাকা নষ্ট করা বড়ই অন্যায়।"

আমি বলিলাম—"তোমার মতে চলবার লোক দুনিয়াতে বেশী নেই, শরৎদা। তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হ'চ্ছে না, ভগবান ভক্তের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তা না হ'লে দুটি আমেরিকান মহিলা সাত লক্ষ টাকা দিত না।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তুমি ত বহুকাল থেকে 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' ক'রছ, কিছু পেলে কি?"

আমি বলিলাম—"সৌভাগ্য বলে তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা-সহচরদের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি ও তাঁদের কৃপায় বুঝেছি—প্রাণের ধর্ম্মে ভগবান-লাভ হয় বাহিরের ধর্ম্মে নয়—প্রাণ কাঁদলে তবে।"

শরৎচন্দ্র তখন বলিলেন—"তোমাদের বড় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন! বেদানন্দের অসুখের সময় যখন তাকে আনতে গিয়েছিলাম কিছুতেই দিতে চান না।"

আমি বলিলাম—"শরৎদা! তুমি নিজের বুদ্ধির মাপ কাঠিতে মহারাজকে যতটুকু ভেবে রেখেছ, তিনি ততটুকু ছিলেন না। মহারাজ মঠের সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবন গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ভালবাসার ধারা ছিল অন্য

রকমের। আত্মীয় স্বজনের কোল ছেড়ে যারা মঠের আশ্রয়ে আসত, মহারাজ তাদের সেবাশুশ্রূষা সমস্ত নিজের তত্ত্বাবধানে করাতেন।”

শরৎচন্দ্র বলিলেন—“তোমাদের ঐ মন্দিরের চাঁদার খাতায় আমি কিছু দিতে পারলাম না বলে কিছু মনে করনা, ভাই। মিশনের আর্ত্তের সেবা কাজগুলোর উপর আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, মনে করে রেখেছি আমার উইলে ঐ বাবদে কিছু দিয়ে যাব।”

আমি বলিলাম—“ভাল প্রস্তাব, তোমার অসুস্থ শরীর, যত শীঘ্র উইল করে ফেল ততই ভাল। মনে আছে ত তোমার আত্মীয় রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জির বাপ হঠাৎ মারা যাওয়ায় ইচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে যেতে পারেন নি।”

শরৎচন্দ্র বলিলেন—“তুমি অত ব্যস্ত কেন? আজকাল কিছু কমিশন বন্দোবস্ত করেছ না কি।

আমি বলিলাম—“কিছু বন্দোবস্ত না থাকলে কি শুধু বেগার খাটা যায়।”

৪

গত পূর্ব্ব বৎসর স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজ যখন দিল্লী হইতে বেলুড় মঠে আসেন, আমি সেই সময় একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়াছিলাম

এবং অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর সহিত শরৎচন্দ্রকেও সে রাত্রিতে স্বামীজীর সহিত আমার বাটিতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী আসিয়া সন্ধ্যার পর আমার প্রতিবেশী বন্ধু শ্রীযুত শচীন্দ্রমোহন ঘোষের বাটিতে সমবেত দক্ষিণ কলি-কাতাবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে "শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগ-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। শরৎচন্দ্র এক ঘণ্টা কাল এই বক্তৃতা শুনিয়া, বক্তৃতা শেষ না হইতেই উঠিয়া পড়েন।

আমি তাঁহার সঙ্গে বাহিরে আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"স্বামী শর্ব্বানন্দ কি আমায় চিনতে পারেন ?"

আমি বলিলাম—"তোমার কথা তাঁর খুবই মনে আছে, আজই তোমার কথা হচ্ছিল।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি আমার সম্বন্ধে কি বলেন ?"

আমি বলিলাম—"বলেন, শরৎবাবু গল্প লেখেন খুবই সুন্দর, কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্রজীবনে সংযম শিক্ষা ও চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে শরৎ-সাহিত্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। গত পনর বৎসর থেকে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ঘটেছে, সেজন্য 'পচা-সিনেমা' ও ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত শরৎ-সাহিত্যই দায়ী। ইহারা ভোগের আগুনে ক্রমাগতই ইন্ধন যোগাচ্ছে।"

কথাগুলি শুনিয়া শরৎচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীর সহিত আহার করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না।

শরৎচন্দ্র বহুদিন আমার বাড়ীতে সানন্দে নিমন্ত্রণ খাইয়াছেন, আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে বড়ই দুঃখ হইল। ভাবিলাম ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি আজ উত্থাপন না করিলেই ভাল হইত।

৫

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে পঠদ্দশায় আমার কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষময় বেলগাছ হইতে পড়িয়া ভূতাবিষ্ট হয় এবং সেই সময় পুরী 'রাধা নিবাসে' আমার নয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যা কমলার উপর অলৌকিক দৈব শক্তির আবির্ভাব হয়। মানুষকে উপলক্ষ করিয়া অতি-মানুষ-শক্তি সময় সময় কি ভাবে লীলা খেলা করেন, তাহা কমলার তৎকালীন অত্যাশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তি, দিব্যদর্শন, দূর-শ্রবণ, পরোক্ষ-জ্ঞান ও চৈতন্য জগতের অদ্ভুত উপলব্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

'রাম' নামে ভূত পালায় এই বিশ্বাসে আমার পুরীর বাটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী একাদশীর দিন রাম নাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন

যে, ভূতও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া সমস্বরে "শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম, কালাত্মক পরমেশ্বর রাম" নাম গাহিতেছে! এই ব্যাপার দেখিয়া ও আমার মুখে এই ভৌতিক কাণ্ডে বহু অর্থনাশ হইতেছে এবং ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা, দৈবজ্ঞ, যাগযজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র, কবচ, মাদুলী প্রভৃতি সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের মুখেই এই আশ্চর্য্য সংবাদটি ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল।

আমি পুরী হইতে কলিকাতায় আসিলে, একদিন শরৎচন্দ্র কমলা ও সন্তোষময়কে দেখিতে আমার কালী-ঘাটের বাটিতে আসিয়া কহিলেন,—"তুমি শুধু বিলাত-ফেরত নও, দুনিয়া-ফেরত লোক, তুমি ভূত বিশ্বাস কর?" আমি বলিলাম,—"এখন ভূত মেরা পুত! শরৎদা, আমি আজ পাঁচ বৎসর ভূতের বাবা সেজে ব'সে আছি! এ আবার যে সে ভূত নয়, বেল গাছের ব্রহ্মদৈত্য!"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমলার ব্যাপারটি কি?"

আমি বলিলাম—"ওসব (Supernatural) অতীন্দ্রিয় শক্তির খেলা, দেবীমাহাত্ম্য!"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"ঘটনাটি আমি যা শুনেছি, চোখে না দেখলে সহজে বিশ্বাস হয় না বলে তোমার কাছে শুনতে এসেছি।"

আমি বলিলাম—"তুমি শুনলে কোথা থেকে? সে

সময় সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেন ছাড়া আর ত কেউ কলকাতার লোক পুরীতে উপস্থিত ছিল না।”

শরৎচন্দ্র বলিলেন—“যারা ঘটনাগুলো চোখে দেখেছে তারা সবই কি পুরীর লোক ?”

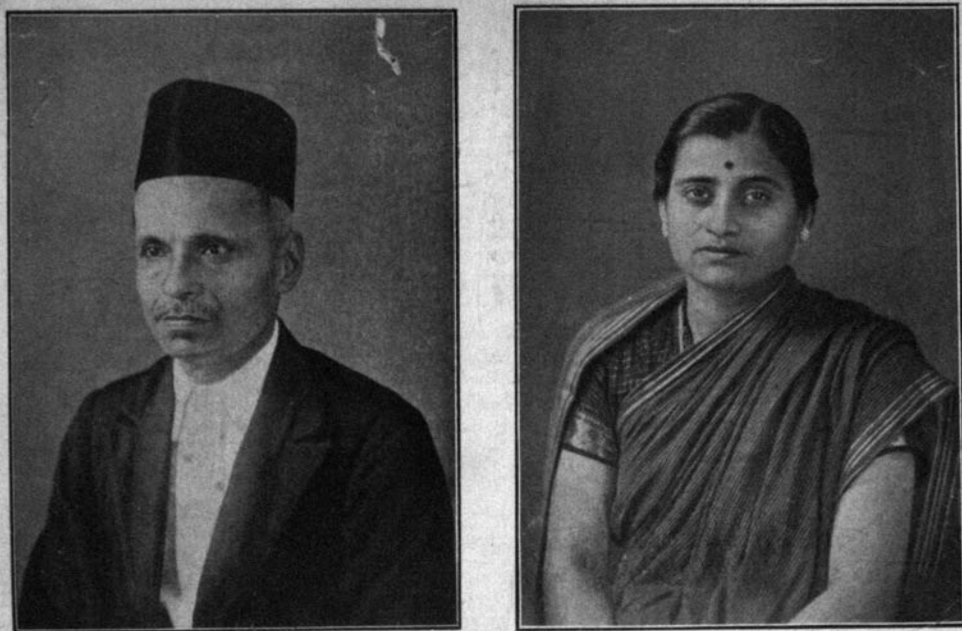
আমি বলিলাম—“না, সুভাষচন্দ্রের বাপ ও মা, পাটনা হাইকোর্টের জজ রায় বাহাদুর অমরনাথ চ্যাটার্জ্জি ও তাঁহার স্ত্রী, পুরীর কালেক্টর ও তাঁর স্ত্রী, পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মন্মথনাথ বসু, লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার রায় বাহাদুর ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে, সাধু অব্যক্তানন্দ, সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেন ও আরও অনেক বন্ধু বান্ধব এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন।”

শরৎচন্দ্র বলিলেন—“তুমি এ খবরগুলো খবরের কাগজে দিচ্ছ না কেন ?”

আমি বলিলাম—“সাধারণে প্রকাশ করে কি হবে। আজকাল লোকে দুনিয়াদারী ছাড়া অন্য কিছু শুনতে চায় না, যদি চাইত তা হলে তোমার নভেলের এত কাট্‌তি হত না।”

শরৎচন্দ্র বলিলেন—“যা বলেছ তা সত্য, কিন্তু এমন লোকও ঢের আছে যারা এই অলৌকিক কাণ্ডগুলো শুনলে গবেষণা করবার সুযোগ পেত।”

আমি বলিলাম—“আজ সকালে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ



মিষ্টার ও মিসেস্ ভি, ডি, ঋষি

পরলোকতত্ত্ববিদ্ মিঃ ঋষি ও মিসেস ঋষি কমলাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা শুনে বললেন—There are more things between Heaven and Earth than are dreamt in your philosophy. মিঃ ঋষি এই ঘটনাগুলি তাঁর Spiritual Bulletinএ ছাপাতে চান, আমি নিষেধ করেছি।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিঃ ঋষি লোকটি কে!"

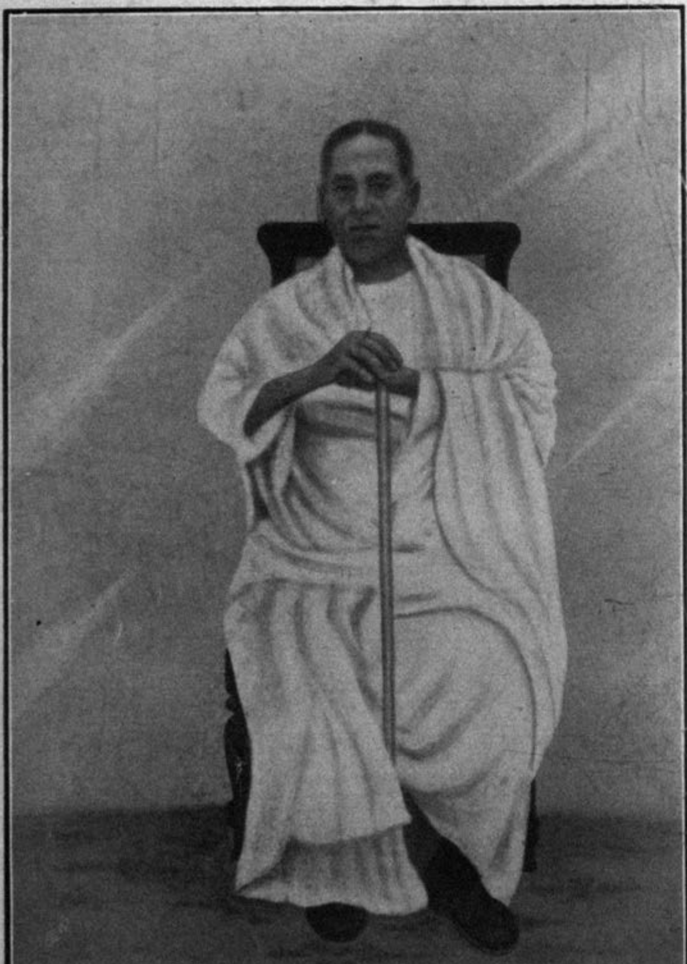
আমি বলিলাম—"মিঃ ভি, ডি, ঋষি বি, এ, এল, এল, বি, একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে উকিল ছিলেন, তারপর ইন্দোর রাজ্যে জুডিসিয়াল সার্ভিসে চাকুরী করতেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম স্ত্রী সুভদ্রা বাঈয়ের মৃত্যু হয়। মিঃ ঋষি পত্নী বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য, দেহ নষ্ট হলেও আত্মা থাকে এ সকল কথায় তিনি শান্তি পেলেন না। পাশ্চাত্য দেশে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল আধুনিক গবেষণা হচ্ছে, তার সন্ধান নিলেন ও Sir Oliver Lodge প্রভৃতি মনীষীদের সমস্ত বই পড়ে তাঁর ধারণা হল যে, মৃত্যুর পরও আত্মা বর্ত্তমান থাকে ও মৃত ব্যক্তির স্মরণ শক্তি, স্বভাব চরিত্র, জীব লোকের প্রতি দয়া, মায়া, ভালবাসা সব অটুট থাকে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ঋষি আবার বিবাহ করেন।

"বিবাহের পর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রভবতী বাঈ ও তিনি একদিন একত্রে ফটো তুলে দেখলেন যে, ঐ গ্রূপ ফটোর মধ্যে তাঁর মৃত স্ত্রী সুভদ্রা বাঈয়েরও ফটো উঠে গিয়েছে। এই অশরীরী আত্মার ফটো দেখে তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই যার পর নাই বিস্মিত হয়ে পড়েন।

"এই ঘটনার পর মিঃ ঋষি তাঁর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কয়েকবার ইউরোপের নানা স্থান ঘুরে এ বিদ্যাটি ভালরূপ আয়ত্ত করে এসেছেন। ভগবানের কৃপায় তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী বাঈ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিডিয়ম। তাঁর সঙ্গে সারকেলে বসলে নিমিষের মধ্যে যে কোন অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা যায়। এখন যেমন আমরা দূর দেশের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে টেলিফোনের সাহায্যে কথাবার্ত্তা বলি, সেই রকম মিডিয়ম সাহায্যে সারকেলে বসে পারলৌকিক সকল আত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে, তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে, ছায়ামূর্ত্তি দেখতে, এমন কি অশরীরী আত্মার ফটোগ্রাফ (Spirit Photograph) পর্য্যন্ত পেতে পারা যায়।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"বল কি? তুমি এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছ?"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই। আমি, আমার বন্ধু রায় সাহেব হরিসাধন মুখার্জি, মিষ্টার ও মিসেস ঋষি এই



স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু

চারজনে একদিন সারকেলে বসি। মিঃ ঋষি শান্তভাবে ইংরেজীতে একটি সুন্দর প্রার্থনা করার পর আমার হাতে কাগজ পেন্সিল দিয়া পরলোকগত কোন পবিত্র আত্মার চিন্তা করতে বলায় আমি কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে আমার আত্মীয় সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকী বাবুর মূর্ত্তির ধ্যান করি।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তা হলে সুভাষদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক আছে?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী সুভাষচন্দ্রের মায়ের সম্পর্কিত খুড়তুত বোন। জানকী বাবু ভায়রা-ভাই হলেও আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। পুরীতে গত পাঁচ বৎসর তাঁর সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়ান ও ধর্ম্মালোচনা করা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। অমন উদার, অমায়িক, জ্ঞানী ও প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত আত্মীয় পাওয়া ভাগ্যের কথা।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তারপর?"

আমি বলিলাম—"হঠাৎ টিপয়ের একটি পা শূন্যে উঠে বার বার শব্দ করায় আমি আশ্চর্য্য বোধ করলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও সারকেলে বসি নাই। মিঃ ঋষি উদ্দেশে বললেন—'বন্ধু! যদি আপনি এসে থাকেন, তবে দয়া করে গিরীন বাবুর সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।' আমি বাঙ্গালায় প্রশ্ন করলাম :—

প্রশ্ন—কে আপনি, আপনার নাম কি?

উত্তর—জানকীনাথ বসু।

প্রশ্ন—আপনি এখন কোথায় আছেন ?

উত্তর—সপ্তম স্তরে।

প্রশ্ন—কেমন আছেন ?

উত্তর—বেশ সুখে আছি।

প্রশ্ন—আমি কে বলুন ত ?

উত্তর—গিরীন্দ্র।

এই সময় মিঃ ঋষি আমাকে বলিলেন "Take proper identity of your relative."

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম :—

প্রশ্ন—কোথায় আপনার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ?

উত্তর—পুরীতে।

প্রশ্ন—এমন দু'একটি ঘটনার কথা বলুন যা থেকে সঠিক বুঝতে পারব যে, আপনিই স্বর্গীয় জানকীবাবু, অপর কোন আত্মা নয় ?

উত্তর—তুমি একবার আমার অসুখের সময় একজন ডাক্তার, কিরণ ও তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার দিদিকে পুরী থেকে কটকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আর একবার মন্মথবাবুর বাড়ীর গীতা ক্লাসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তুমি ইজিচেয়ারে শুইয়ে কাঁধে করে আমায় 'জগন্নাথধামে' এনেছিলে।

প্রশ্ন—সে সময় আপনার বাড়ীতে কে কে ছিলেন ?

উত্তর—তোমার দিদি ও সুনীল।

প্রশ্ন—আমার বাড়ীতে গান শুনতে শুনতে একদিন কার গলা জড়িয়ে কেঁদেছিলেন বলুন ত ?

উত্তর—পাটনার জজ অমর বাবুর।

প্রশ্ন – সেদিন কে গান করেছিল ?

উত্তর—আন্দুলের দীনেশ ভট্টাচার্য্য।

প্রশ্ন—ওখানে কি করে সময় কাটান ?

উত্তর—সাধন ভজনে।

প্রশ্ন—এ সংসারের মায়া কাটাতে পেরেছেন কি ?

উত্তর—সম্পূর্ণ নয়।

প্রশ্ন – কার জন্য মন কেমন করে ?

উত্তর—শরতের জন্য।

প্রশ্ন—শরৎ কবে খালাস পাবে বলতে পারেন ?

উত্তর—চার মাসের মধ্যে।

প্রশ্ন—সুভাষের খবর কি ?

উত্তর—সে অসুখে ভুগছে, শীঘ্রই ভাল হয়ে দেশে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন—আপনার সন্তোষময়কে মনে আছে কি ?

উত্তর—খুব মনে আছে, তোমার ছোট ছেলে।

প্রশ্ন—তার ঘাড়ের ভূত এখনও ছাড়েনি, কবে ছাড়বে বলতে পারেন ?

উত্তর—সেই Spirit কে জিজ্ঞাসা কর।

প্রশ্ন—ঐ Spirit বলেছে পাঁচ বৎসর complete না হ'লে সে যাবে না।

উত্তর—ও ভাল Spirit, কথার ঠিক রাখবে।

প্রশ্ন—কমলের ব্যাপারটি কি ?

উত্তর—ও দেবী-মাহাত্ম্য ! মায়ের খেলা।

প্রশ্ন—ওর উপর কার আবেশ হ'য়েছিল ?

উত্তর—আনন্দময়ী মায়ের।

প্রশ্ন—আনন্দময়ী কে ?

উত্তর—জগন্মাতা (Mother of the Universe)

প্রশ্ন—বড়ই আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়।

উত্তর—আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? মাটীর প্রতিমায় দেবীর আবির্ভাব হতে পারে, আর শুদ্ধ জীবাত্মায় হতে পারে না ? দেখেছি কমলের চোখে, মুখে, কথায় ও গানে মাকে পাবার আনন্দ ফুটে উঠেছিল। বহু জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে এসব হয়।

প্রশ্ন—আপনি আমায় খুব স্নেহ ক'রতেন, এখন ওখান থেকে কিছু উপদেশ দেবেন কি ?

উত্তর—উপদেশ দেবার মালিক ভগবান, তিনি বিবেক-রূপে সর্ব্বদা সদুপদেশ দিচ্ছেন। তোমরা মার কৃপা পেয়েছ, ভয় কি ? সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গ ক'রবে। ভক্ত-সঙ্গে সাধনার কাজ অনেক এগিয়ে যায়।

"পরলোকগত আত্মীয়ের কাছে পরজীবনের সত্তা ও নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে বড়ই আনন্দ হ'ল। কিছু-দিনের পর অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যসত্যই শরৎবাবু মুক্তি পেলেন ও নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্তোষময়ের ব্রহ্মদৈত্য তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশে অনেকেই এগুলিকে আজগুবি বলে মনে করেন, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের পরিচালিত প্রায় পাঁচ শত সভা-সমিতি ও সংবাদ পত্র আছে। সেথাকার বৈজ্ঞানিকরা পরলোক সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার এক একটি বিষয় চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যাবে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"এখন ত মিষ্টার ঋষি এখানে আছেন, ওঁর ঠিকানা কি?"

আমি বলিলাম—"উনি ভবানীপুর মহারাষ্ট্র ক্লাবে থাকেন, বৎসরে একবার কলকাতায় আসেন। ওঁর ঠিকানা Indian Spiritualist Society, No 51, Gudhandas Building, Girgaon, Bombay."

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আমার প্রথম স্ত্রীর ফটো নেই, দেখব ওঁকে বলে, যদি সংগ্রহ করতে পারি। ভাই, এর মধ্যে যদি কোথাও মিঃ ঋষির বক্তৃতার বন্দোবস্ত করতে পার আমায় খবর দিতে ভুলনা। আমি subjectটি study কর্ত্তে চাই।"

৬

শরৎচন্দ্র বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় ও আমার বন্ধু শচীন্দ্রমোহন ঘোষের অনুরোধে আমি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৯ মে তারিখে শচীন্দ্র বাবুর বাটিতে মিঃ ঋষির একটি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র অসুস্থ শরীরে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মিঃ দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় এইদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ ঋষির ছায়াচিত্রে বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহার সংগৃহীত বহু Spirit Photograph দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

মিঃ ঋষির বক্তৃতা শেষ হইবার পর সভাপতি মহাশয় বলেন—"আমি পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করি, এ বিষয়ে আমার বৈবাহিক স্বর্গীয় অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট বিলাতের অনেক গল্প শুনিয়াছি। আমাদের দেশে এ বিষয়ের চর্চ্চা ও আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যক।"

এই বক্তৃতাটি অমৃতবাজার প্রভৃতি বহু সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র মিঃ ঋষির সহিত পরলোক ও Spirit Photograph সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই দিন আমি স্বয়ং গিয়া মিঃ শরৎচন্দ্র বসুকে মিঃ

ঋষির বক্তৃতা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারেন নাই।

একদিন শরৎচন্দ্রের বাটিতে গিয়া শুনিলাম তিনি বড়ই পীড়িত, ডাক্তারের নিষেধে তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ করিবার উপায় ছিলনা। আমি এক টুকরা কাগজে নাম লিখিয়া দিতে তাঁহার লোকটি আমার পীড়াপীড়িতে সেখানি উপরে লইয়া গেল। মনে ভাবিতেছিলাম শরৎচন্দ্র সজ্ঞানে থাকিলে নিশ্চয়ই আমার ডাক আসিবে। হইলও তাহাই, লোকটি তাড়াতাড়ি আসিয়া সংবাদ দিল শরৎচন্দ্র উপরের ঘরে আমাকে ডাকিতেছেন।

উপরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি শয্যাশায়ী। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"ভাই তোমায় এতক্ষণ নীচেয় বসিয়ে রেখেছিল।"

তাহার পর রেঙ্গুনে তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে আমি তাঁহার মেসো স্বর্গীয় অঘোর বাবুর মৃত্যু সময়ে ও মৃত্যুর পর তাঁহার মাসীমা (বিচিত্রা সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগিনী) কে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলাম সেই পুরাতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—"ও লোকটি জানে না যে আমাদের সাঁইত্রিশ বৎসরের কিরূপ বন্ধুত্ব ও তোমার দ্বারা আমরা কত উপকার পেয়েছি।"

লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখে মৃত্যুর ম্লান ছায়াপাত হইয়াছে, মনের সে প্রফুল্লতা নাই।

আমি পকেট হইতে ঠাকুরের ফটোখানি বাহির করিয়া তাঁহার মাথায় ছোঁয়াইয়া দিতে তিনি হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর তিনি প্রাণ খুলিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"ভাই, এবার আর রক্ষা নাই। দিলীপ শ্রীঅরবিন্দের কাছে আগে দু'বার আমার অসুখের কথা জানিয়েছিল তার ফলে রক্ষা পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার আমার উপর যমের ওয়ারেণ্ট অনেক দিন বেরিয়ে গেছে। তার পাইক, বরকন্দাজরা মধ্যে মধ্যে এসে আমার খোঁজ নিচ্ছে। মৃত্যুকে ভুলে থাকলে মন্দ হয় না—কিন্তু ভোলবার ত উপায় নাই। প্রকৃতি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। দেখলাম, প্রাণের সব সাধ এখানে মিটে না, প্রাণ আশা করে আকাশের চাঁদ ধরতে, নক্ষত্র-গুলোর মত অনন্ত আকাশে ছুটাছুটি করতে, প্রাণ যা চায় এ সংসার তা দিতে পারে না। প্রাণের কত কি সাধ। যৌবনের প্রচণ্ড তেজে এই জগতকে যে চোখে দেখেছি, এখন যাবার সময় ঠিক তার বিপরীত ভাব! ভাই, বিছানা না নিলে এ পৃথিবীটা যে কি তা ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। এখন শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবি কি কাজে দিন-গুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল। এখন বুঝেছি আর বিলম্ব নেই, এবার নিশ্চয় যেতে হবে, মনের মধ্যে একটা 'হায় হায়' ধ্বনি উঠছে। তোমরা নানা ধর্ম্মাচরণ করেছ—হয়ত স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবে, আমার ধর্ম্মাচরণও

নেই—স্বর্গও নেই। নরক ভয়ই মৃত্যুভয়কে ভীষণ করে তোলে, আমার নরক ভয়ও নেই—যদি কখনও নরকে যেতে হয় তবে রিটার্ণ টিকিট কেটে যাবার ইচ্ছা প্রবল।"

আমি বলিলাম—"দেখ শরৎদা, মানুষ নিজেকে যতই কেন বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মনে করুক না, ভগবান ব'লে একজন আছেন, তাঁকে সম্পূর্ণ ঠিক ক'রে জানতে না পারলেও শেষ জীবনে অন্ততঃ সকলেই একবার তাঁর খোঁজ করে। তুমি কিন্তু সারা জীবন নাস্তিক সেজে বসে আছ! রেঙ্গুনে তোমার গানে ছাড়া আর কখনও তোমাকে ভগবানের নাম ক'রতে শুনি নাই। দেখ, তোমার রবিবাবুর ঈশ্বর-প্রীতি তাঁর কাব্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও প্রত্যেক চিন্তাধারায় কেমন ফুটে উঠেছে। তাঁকে ভুলে থাকাটাই সকল দুঃখের কারণ। তাঁর শরণাগত হ'য়ে ব্যাকুলভাবে দিনরাত ডাক, হাস্‌তে হাস্‌তে যেতে পারবে।"

সময়াভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন চলিয়া আসিতে হইল। এই আমার শরৎচন্দ্রের সহিত শেষ সাক্ষাৎ। পরে যেদিন শ্মশানে গিয়াছিলাম তখন শরৎচন্দ্রের আত্মা অমরধামে।

বিংশ স্তবক

পরলোকে শরৎচন্দ্র

গানে আছে—"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?
এই বাদানুবাদ করে সকলে ।"

মরিবার পরের পরিণতিটা কি তাহা জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহল অদম্য, অফুরন্ত ও চিরন্তন ।

শরৎচন্দ্রের সম্প্রতি জীবনাবসান হইয়াছে। লৌকিক জগতে তিনি অবলুপ্ত ।

যিনি সর্ব্বদাই সাহিত্যের রসানন্দে বিভোর থাকিতেন, বাণীর একোদ্দিষ্ট সাধনাকে যিনি জীবনের এক মাত্র ব্রত করিয়াছিলেন, যাঁহার সুধা কণ্ঠের স্বরলহরীতে পাষাণ হৃদয় গলিয়া যাইত, সেই একাধারে কথাশিল্পী ও সুর-শিল্পীর অমর আত্মা মৃত্যুর পরপারে কি অবস্থায় আছে, তাহা জানিবার কৌতূহল মনে জাগিবা মাত্র, গবর্ণমেণ্ট ফাইনান্স বিভাগের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ও কলিকাতা সাইকিক সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বন্ধুবর রায়সাহেব হরিসাধন মুখার্জ্জির নিকট প্রস্তাব করায় তিনি বলিলেন, "বেশ ত একদিন সিয়ান্সে বসা যাবে।"

হরিসাধন বাবু এক মাত্র উপযুক্ত পুত্র হারাইয়া বহুদিন শোক বিহ্বল হইয়াছিলেন, এখন মিডিয়ম

সাহায্যে সেই মৃত পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি অনেক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে একটি ভক্তিমতী বালিকা মিডিয়মের সাহায্যে আমি ও রায় সাহেব হরিসাধন মুখার্জি সারকেলে বসিলাম। যে স্থানে বসিলে মন বেশ প্রফুল্ল থাকে, এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলাম এবং তথায় গঙ্গাজল ছড়াইয়া ও ধূপ, ধূনা জ্বালিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিলাম। পরে নিবিষ্ট চিত্তে শরৎচন্দ্রের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম—"হে বিশ্বপতি! যে বন্ধুটির আত্মার সহিত সংযোগ কামনায় আজ এই চক্রে বসিয়াছি, তোমারই আহ্বানে কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ইহ জগতের কঠিন পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমারই নিকট গিয়াছেন। যে অজ্ঞাত দেশে মৃতেরা আহূত হন, যে অপরিচিত দেশের কথা মনুষ্য সমাজ এখনও ভাল করিয়া জানে না, তোমার কৃপায় সে দেশের বার্ত্তা কোন কোন জড়-দেহ-মুক্ত অশরীরী আত্মা আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনে। দয়াময়! তুমি পরলোক সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ঘনীভূত কর এবং দয়া করিয়া আমার স্বর্গস্থ বন্ধু শরৎচন্দ্রের আত্মাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"

প্রার্থনা শেষ হইবা মাত্র টিপয়ের শব্দে শরৎচন্দ্রের অশরীরী আত্মার উপস্থিতি অনুভব করিয়া প্রশ্ন করিলাম

—"যদ্যপি এখানে কোন আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা আমাদের অবগত করুন।"

উজা-বোর্ডে লেখা হইল "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" আমি বলিলাম—শরৎদা, কেমন আছ?

উত্তর পাইলাম—"এখানে সুখ শান্তি অনির্ব্বচনীয়।"

আমি—"তুমি কবে জড় দেহ ত্যাগ করেছ?"

উত্তর—"১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮ রবিবার, বেলা দশটা।"

আমি—"কোথায়?"

উত্তর—"পার্ক নার্শিং হোমে।"

আমি—"তোমার আত্মীয় স্বজন কে কে আছে?"

উত্তর—"স্ত্রী, ভাই, ভগিনী ও ভাইপো?"

আমি—"বিষয় আসয় কাকে দিয়ে গেলে?"

উত্তর—"স্ত্রীকে?"

আমি—"এখানকার কাহারও জন্য মন কেমন করে কি?"

উত্তর—"স্ত্রীর জন্য।"

আমি—"ওখানে পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে?"

উত্তর—"বাপ, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অনেক মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি।"

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ওখানে কিরূপে চলাফেরা করেন?"

উত্তর—"ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বাতাসে চলাফেরা করি।"

রায় সাহেব—"ওখানে মাঠ, নদী, জলাশয়, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা প্রভৃতি আছে কি ?"

উত্তর—"সমস্তই আছে, তবে ও পৃথিবী হ'তে ভিন্নরূপ।"

রায় সাহেব—"থাকেন কোথায় ?"

উত্তর—"সুন্দর ফুলের বাগানের মধ্যে একটি কুটীরে।"

রায় সাহেব—"আপনারা ওখানে কি খান ?"

উত্তর—"এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই ও নিদ্রার আবশ্যক হয় না।"

রায় সাহেব—"আপনি মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন, বেশ গুছিয়ে লিখতে পারতেন, এখন পরলোক সম্বন্ধে সব কথা একটু গুছিয়ে বলুন ত ?"

উত্তর—"এখানে চৈতন্য সাগরে ডুবে আছি, আকাশ, বাতাস সবই চৈতন্যময়। জড় বলে কোথাও কিছু নাই। একই চৈতন্যশক্তি জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ রূপে বিদ্যমান।"

রায় সাহেব—"আপনি ত এখানে নাস্তিক ছিলেন, এখন কি মনে হয় ?"

উত্তর—"এখন মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে ! একটা জন্ম বৃথা কাটিয়েছি, আপশোষ হয়। এখন বুঝেছি জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ করা।"

রায় সাহেব—"ভগবান আছেন তার কোন প্রমাণ পেলেন ?"

উত্তর—"তাঁর সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট কোন রূপ নাই। এ জগতের সকল রূপই তাঁর রূপ। সবাই তাঁকে অহর্নিশ দেখছে, কিন্তু সকলে তাঁকে চিনতে পারে না।"

রায়সাহেব—"আপনার কি এখন সাহিত্য চর্চ্চার ইচ্ছা হয় ?"

উত্তর—"ইচ্ছা হ'লেও এখানে সুযোগ সুবিধা নাই।"

রায় সাহেব—"কি করে সময় কাটান ?"

উত্তর—"ভগবানের উপাসনা করে। দিবারাত্র মুক্তি প্রার্থনা করি।"

রায় সাহেব—"মুক্তি কিসে হবে বুঝতে পেরেছেন কি ?"

উত্তর—"সকল বাসনা কামনার নিবৃত্তি হলেই।"

রায় সাহেব—"আপনি এখন কোন্ স্তরে আছেন ?"

উত্তর—"সপ্তম স্তরে। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম ফল অনুসারে এখানে এসে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বাস করে, ক্রমে সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ ক'রে উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়।"

রায় সাহেব—"ওখানে সর্ব্বশুদ্ধ কয়টি স্তর আছে ?"

উত্তর—"দশটি।"

রায় সাহেব—"দশম স্তরে কাহারা থাকেন ?"

উত্তর—“অবতার পুরুষরা।”

রায় সাহেব—“অবতার পুরুষরা জগতে কেন আসেন কিছু বুঝতে পেরেছেন?”

উত্তর—“মুক্তির ‘লুঠ’ দিতে।”

রায় সাহেব—“পরমহংসদেব সম্বন্ধে এখন আপনার কি ধারণা?”

উত্তর—“এখন জেনেছি **রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং ভগবান।**”

সমাপ্ত

কয়েকটি অভিমত

বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী রায় সাহেব এস, বি, ঘোষ লিখিয়াছেন ঃ—

In "Brahma-deshe-Saratchandra" my friend Mr. G. N. Sircar has set forth admirably some of the episodes in the life of Sarat Chandra Chatterjee while resident in Rangoon. Mr. Sircar has dealt sympathetically with some of the whims of the great novelist which came to his knowledge.

Mr. Sircar was a distinguished Bengali citizen of Rangoon and his activities in the direction of encouraging and ameliorating the condition of his countrymen in Burma were manifold and extensive. Inspite of the fact that Saratchandra lived the life of a recluse and shunned publicity, Mr. Sircar had many opportunities of coming into intimate contact with Saratchandra and of helping him at a time when no one dreamt of the greatness which lay in him and which has now made his name a household word in Bengal.

We in Burma are immensely proud of the fact

that, unknown to us, some of the earlier novels of Saratchandra were conceived and written while he was in Rangoon.

বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অনা-রেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন ঃ—

বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনী ও সাহিত্য লইয়া বিভিন্নভাবে নানা আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু এ যাবৎ তিনি যেখানে বসিয়া তাঁহার অমর উপন্যাসগুলির প্রধান উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কেহই সেই ব্রহ্মপ্রবাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আলোকপাত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার ভূ-পর্য্যটক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" লিখিয়া দেশবাসীর সে কৌতূহল দূর করিয়াছেন। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি অভিনব ও চমকপ্রদ ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা সকল শ্রেণীর পাঠকেরই চিন্তার খোরাক যোগাইবে। আশা করি, পুস্তকখানি বাঙ্গালীর নিকট আদৃত হইবে।

পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ রায় বাহাদুর অমর-নাথ চাটার্জ্জি বলেন ঃ—

আপনি "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ করিয়া আমার 'অমর' নামটি অমর করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ।

শরৎবাবু একাধারে কথাশিল্পী ও সুরশিল্পী ছিলেন এবং তাঁহার গানের মধ্যেও অসাধারণ মাধুর্য্য ছিল তাহা আপনার নিকট প্রথম শুনিলাম। এই গ্রন্থে তাঁহার প্রবাস জীবনের যে কয়টি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

জড়দেহমুক্ত অশরীরী শরৎবাবুর নিকট হইতে সুকৌশলে যে পরলোকের কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বঙ্গ সাহিত্যে নূতন সম্পদ। এই পারলৌকিক বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেই আমাদের মৃত্যুভয় তিরোহিত হইবে। এই পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ 'শরৎ-স্মৃতি ভাণ্ডারে' দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আপনি বন্ধু-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।
